PART- 10

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

আল ফুরকান

২৫

নামকরণ

প্রথম আয়াত تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। কুরআনের অধিকাংশ সূরার মতো এ নামটিও বিষয়বস্তু ভিত্তিক শিরোনাম নয় বরং আলামত হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে। তবুও সূরার বিষয়বস্তুর সাথে নামটির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সামনের দিকের আলোচনা থেকে একথা জানা যাবে।

নাযিলের সময়-কাল

বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার মনে হয়, এ সূরাটিও সূরা মু'মিনূন ইত্যাদি সূরাগুলোর সমসময়ে নাযিল হয়। অর্থাৎ সময়টি হচ্ছে, রসূলের (সা) মক্কায় অবস্থানকালের মাঝামাঝি সময়। ইবনে জারীর ও ইমাম রাযী যাহ্‌হাক ইবনে মুযাহিম ও মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, এ সূরাটি সূরা নিসার ৮ বছর আগে নাযিল হয়। এ হিসেবেও এর নাযিল হবার সময়টি হয় মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়। (ইবনে জারীর, ১৯ খণ্ড, ২৮–৩০ পৃষ্ঠা ও তাফসীরে কবীর, ৬ খণ্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

কুরআন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত এবং তাঁর পেশকৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করা হতো সেগুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি যথাযথ জবাব দেয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে সত্যের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার খারাপ পরিণামও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শেষে সূরা মু'মিনূনের মতো মু'মিনদের নৈতিক গুণাবলীর একটি নকশা তৈরি করে সেই মানদণ্ডে যাচাই করে খাঁটি ও ভেজাল নির্ণয় করার জন্য সাধারণ মানুষের সামনে রেখে দেয়া হয়েছে। একদিকে রয়েছে এমন চরিত্র সম্পন্ন লোকেরা যারা এ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এবং আগামীতে যাদেরকে তৈরি করার প্রচেষ্টা চলছে। অন্যদিকে রয়েছে এমন নৈতিক আদর্শ যা সাধারণ আরববাসীদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং যাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য জাহেলিয়াতের পতাকাবাহীরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন আরববাসীরা এ দু'টি আদর্শের মধ্যে কোন্‌টি পছন্দ করবে তার ফায়সালা তাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। এটি ছিল একটি নিরব প্রশ্ন। আরবের প্রত্যেকটি অধিবাসীর সামনে এ প্রশ্ন রেখে দেয়া হয়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ছাড়া বাকি সমগ্র জাতি এর যে জবাব দেয় ইতিহাসের পাতায় তা অম্লান হয়ে আছে।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ﴿۱﴾ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿۲﴾

বড়ই বরকত সম্পন্ন[১] তিনি যিনি এ ফুরকান[২] তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন[৩], যাতে সে সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়।[৪] যিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক,[৫] যিনি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি,[৬] যাঁর সাথে রাজত্বে কেউ শরীক নেই,[৭] যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন তারপর তার একটি তাক্‌দীর নির্ধারিত করে দিয়েছেন।[৮]

১. মূলে تَبَارَكَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর পূর্ণ অর্থ এক শব্দে তো দূরের কথা এক বাক্যে বর্ণনা করাও কঠিন। এর শব্দমূলে রয়েছে ب - ر - ك অক্ষরত্রয়। এ থেকে بَرَكَة ও بُرُوك দু'টি ধাতু নিষ্পন্ন হয়। بَرَكَة এর মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বিপুলতা, প্রাচুর্যের ধারণা। আর بُرُوك এর মধ্যে স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা, অটলতা ও অনিবার্যতার ধারণা রয়েছে। তারপর এ ধাতু থেকে যখন تَبَارَكَ এর ক্রিয়াপদ তৈরি করা হয় তখন تفاعل এর বৈশিষ্ট হিসেবে এর মধ্যে বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন ও পূর্ণতার প্রকাশের অর্থ শামিল হয়ে যায়। এ অবস্থায় এর অর্থ দাঁড়ায় চরম প্রাচুর্য, বর্ধমান প্রাচুর্য ও চূড়ান্ত পর্যায়ের স্থায়ীত্ব। এ শব্দটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে কোন জিনিসের প্রাচুর্য বা তার দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য বলা হয়ে থাকে। যেমন কখনো এর অর্থ হয় উচ্চতায় অনেক বেশী এগিয়ে যাওয়া। বলা হয়, تبارکت النخلة অর্থাৎ ওমুক খেজুর গাছটি অনেক উঁচু হয়ে গেছে। আস্‌মায়ী বলেন, এক বন্ধু একটি উঁচু টিলায় উঠে পড়ে এবং নিজের সাথীদেরকে বলতে থাকে تَبَارَكْتُ عَلَيْكُمْ "আমি তোমাদের চাইতে উঁচু হয়ে গেছি।" কখনো মর্যাদায় ও শ্রেষ্ঠত্বে বেশী অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে এ শব্দটি বলা হয়। কখনো একে ব্যবহার করা হয় দয়া ও সমৃদ্ধি পৌঁছানো এবং শুভ ও কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রসরতার জন্য। কখনো এ থেকে পবিত্রতার পূর্ণতা ও চূড়ান্ত বিশুদ্ধতার অর্থ গ্রহণ করা হয়। এর স্থায়িত্ব ও অনিবার্যতার অর্থের অবস্থাও একই। পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং পূর্বাপর বক্তব্যই

বলে দেয় কোথায় একে কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে সামনের দিকে যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে তাকে দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে বুঝা যায়, এ ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য تَبَارَكَ শব্দটি এক অর্থে নয় বরং বহু অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ঃ

এক ঃ মহা অনুগ্রহকারী ও সর্বজ্ঞ। কারণ, তিনি নিজের বান্দাকে ফুরকানের মহান নিয়ামত দান করে সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

দুই ঃ বড়ই মর্যাদাশালী ও সম্মানীয়। কারণ, পৃথিবী ও আকাশে তাঁরই রাজত্ব চলছে।

তিন ঃ বড়ই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। কারণ, তাঁর সত্তা সকল প্রকার শির্কের গন্ধমুক্ত। তাঁর সমজাতীয় কেউ নেই। ফলে আল্লাহর সত্তার সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন নজির ও সমকক্ষ নেই। তাঁর কোন ধ্বংস ও পরিবর্তন নেই। কাজেই তাঁর স্থলাভিষিক্তের জন্য কোন পুত্রের প্রয়োজন নেই।

চার ঃ বড়ই উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। কারণ, সমগ্র রাজত্ব তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তাঁর ক্ষমতায় অংশীদার হবার যোগ্যতা ও মর্যাদা কারো নেই।

পাঁচ ঃ শক্তির পূর্ণতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি বিশ্ব–জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টিকারী ও তার ক্ষমতা নির্ধারণকারী। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল মু'মিনূন ১৪ ও আল ফুরকান ১৯ টীকা)

২. অর্থাৎ কুরআন মজীদ। فُرْقَان শব্দটি ধাতুগত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর শব্দমূল হচ্ছে ف–ر–ق অক্ষরত্রয়। এর অর্থ হচ্ছে দু'টি জিনিসকে আলাদা করা। অথবা একই জিনিসের অংশ আলাদা আলাদা হওয়া। কুরআন মজীদের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে পার্থক্যকারী হিসেবে অথবা যার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে অর্থে। অথবা এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অতিরঞ্জন। অর্থাৎ পৃথক করার ব্যাপারে এর পারদর্শিতা এতই বেশী যেন সে নিজেই পৃথক। যদি একে প্রথম ও তৃতীয় অর্থে নেয়া হয় তাহলে এর সঠিক অনুবাদ হবে মানদণ্ড, সিদ্ধান্তকর জিনিস ও নির্ণায়ক (CRITERION)। আর যদি দ্বিতীয় অর্থে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে পৃথক পৃথক অংশ সম্বলিত এবং পৃথক পৃথক সময়ে আগমনকারী অংশ সম্বলিত জিনিস। কুরআন মজীদকে এ দু'টি দিক দিয়েই আল ফুরকান বলা হয়েছে।

৩. মূলে نَزَّلَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হয় ক্রমান্বয়ে ও সামান্য সামান্য করে নাযিল করা। এ মুখবন্ধসূচক বিষয়বস্তুর সম্পর্ক সামনের দিকে ৩২ আয়াত (৩ রুকূ') অধ্যয়নকালে জানা যাবে। সেখানে "এ কুরআন সম্পূর্ণটা একই সময় নাযিল করা হয়নি কেন" মক্কার কাফেরদের এ আপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ সাবধান বাণী উচ্চারণকারী এবং গাফিলতি ও ভ্রষ্টতার অশুভ ফলাফলের ভীতি প্রদর্শনকারী। এ ভীতি প্রদর্শনকারী ফুরকানও হতে পারে আবার যে বান্দার ওপর ফুরকান নাযিল করা হয়েছে তিনিও হতে পারেন। শব্দটি এমন ব্যাপক অর্থবোধক যে, উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য হতে পারে। আর প্রকৃত অর্থে যেহেতু উভয়ই এক এবং উভয়কে একই কাজে পাঠানো হয়েছে তাই বলা যায়, উভয় অর্থই এখানে লক্ষ। তারপর সারা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হবার যে কথা এখানে বলা হয়েছে এ থেকে জানা যায় যে, কুরআনের দাওয়াত ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত কোন

একটি দেশের জন্য নয় বরং সারা দুনিয়ার জন্য এবং কেবলমাত্র নিজেরই যুগের জন্য নয় বরং ভবিষ্যতের সকল যুগের জন্য। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিবৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا -

"হে মানুষেরা! আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত।"

–সূরা আল আ'রাফ, ১৫৮ আয়াত

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ -

"আমার কাছে এ কুরআন পাঠানো হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে আমি তোমাদের এবং যাদের কাছে এটা পৌঁছে যায় তাদের সতর্ক করে দেই।"

–সূরা আল আন'আম, ৯ আয়াত

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا -

"আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি।"–সূরা সাবা, ২৮ আয়াত

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

"আর আমি তোমাকে সারা দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছি।"

–সূরা আল আম্বিয়া, ১০৭ আয়াত

এ বিষয়বস্তুটিকে আরো সুস্পষ্টভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বার বার বর্ণনা করেছেন ঃ بعثت الى الاحمر والاسود "আমাকে সাদা-কালো সবার কাছে পাঠানো হয়েছে।"

كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة

"প্রথমে একজন নবীকে বিশেষ করে তাঁর নিজেরই জাতির কাছে পাঠানো হতো এবং আমাকে সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে।"

–বুখারী ও মুসলিম

وارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون -

"আমাকে সমস্ত সৃষ্টির কাছে পাঠানো হয়েছে এবং আমার আগমনে নবীদের ধারাবাহিক আগমন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।"–মুসলিম

৫. অন্য অনুবাদ এও হতে পারে, "আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই জন্য।" অর্থাৎ এটা তাঁরই অধিকার এবং তাঁর জন্যই এটা নির্দিষ্ট। অন্য কারো এ অধিকার নেই এবং এর মধ্যে কারো কোন অংশও নেই।

৬. অর্থাৎ কারো সাথে তার কোন বংশীয় সম্পর্ক নেই এবং কাউকে তিনি দত্তকও নেননি। বিশ্ব-জাহানে এমন কোন সত্তা নেই, আল্লাহর সাথে যার বংশগত সম্পর্ক বা

দত্তক সম্পর্কের কারণে সে মাবুদ হবার অধিকার লাভ করতে পারে। তাঁর সত্তা একান্ত একক। কেউ নেই তাঁর সমজাতীয়। আল্লাহর কোন বংশধর নেই যে, নাউযুবিল্লাহ এক আল্লাহর ঔরস থেকে কোন প্রজন্ম চালু হবে এবং একের পর এক বহু আল্লাহর জন্ম নিতে থাকবে। কাজেই যে মুশরিক সমাজ ফেরেশতা, জিন বা কোন কোন মানুষকে আল্লাহর সন্তান মনে করে তাদেরকে দেবতা ও উপাস্য গণ্য করেছে তারা পুরোপুরি মূর্খ, অজ্ঞ ও পথভ্রষ্ট। এভাবে যারা বংশীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে না হলেও কোন বৈশিষ্টের ভিত্তিতে একথা মনে করে নিয়েছে যে, বিশ্ব–জাহানের প্রভু আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে নিজের পুত্র বানিয়ে নিয়েছেন তারাও নিরেট মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করছে। "পুত্র করে নেবার" এ ধারণাটিকে যেদিক থেকেই বিশ্লেষণ করা যাবে অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে হবে। এর কোন বাস্তব ও ন্যায়সংগত বিষয় হবার প্রশ্নই ওঠে না। যারা এ ধারণাটি উদ্ভাবন বা অবলম্বন করে তাদের নিকৃষ্ট মানসিকতা ইলাহী সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনায় অক্ষম ছিল। তারা এ অমুখাপেক্ষী ও অসমকক্ষ সত্তাকে মানুষের মতো মনে করে, যে একাকীত্ব ও নির্জনতার ভয়ে ভীত হয়ে অন্য কারো শিশুকে কোলে নিয়ে নেয় অথবা স্নেহ–ভালোবাসার আবেগে উদ্বেল হয়ে কাউকে নিজের ছেলে করে নেয় কিংবা সবার পরে কেউ তার উত্তরাধিকারী হবে এবং তার নাম ও কাজকে জীবিত রাখবে তাই দত্তক নেবার প্রয়োজন অনুভব করে। এ তিনটি কারণেই মানুষের মনে দত্তক নেবার চিন্তা জাগে। এর মধ্য থেকে যে কারণটিকেই আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে তা অবশ্যই মহামূর্খতা, বেআদবী ও স্বল্পবুদ্ধিতাই প্রমাণ করবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, ৬৬–৬৮ টীকা)

৭. মূলে ملك শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি বাদশাহী, রাজত্ব, সর্বময় কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) অর্থে বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহই এ বিশ্ব–জাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক এবং তাঁর শাসন ক্ষমতায় কারো সামান্যতমও অংশ নেই। একথার স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য ফল এই যে, তাহলে তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। কারণ, মানুষ যাকেই মাবুদে পরিণত করে একথা মনে করেই করে যে, তার কাছে কোন শক্তি আছে যে কারণে সে আমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে এবং আমাদের ভাগ্যের ওপর ভালো–মন্দ প্রভাব ফেলতে পারে। শক্তিহীন ও প্রভাবহীন সত্তাদেরকে আশ্রয়স্থল করতে কোন একান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও রাজি হতে পারে না। এখন যদি একথা জানা যায় যে, মহান আল্লাহ ছাড়া এ বিশ্ব–জাহানে আর কারো কোন শক্তি নেই তাহলে বিনয়–নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য কোন মাথা তাঁর ছাড়া আর কারো সামনে ঝুঁকবে না, কোন হাতও তাঁর ছাড়া আর কারো সামনে নজরানা পেশ করার জন্য এগিয়ে যাবে না, কোন কণ্ঠও তাঁর ছাড়া আর কারো প্রশংসা গীতি গাইবে না বা কারো কাছে প্রার্থনা করবে না ও ভিক্ষা চাইবে না এবং দুনিয়ার কোন নিরেট মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তিও কখনো নিজের প্রকৃত ইলাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য ও বন্দেগী করার মতো বোকামী করবে না অথবা কারো স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনাধিকার মেনে নেবে না। "আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য" ওপরের এ বাক্যাংশটি থেকে এ বিষয়বস্তুটি আরো বেশী শক্তি অর্জন করে।

৮. অন্য অনুবাদ এও হতে পারে যে, "প্রত্যেকটি জিনিসকে একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী রেখেছেন।" অথবা প্রত্যেক জিনিসের জন্য যথাযথ পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন।

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً
وَلَا نُشُورًا ○

লোকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব উপাস্য তৈরি করে নিয়েছে যারা কোন জিনিস সৃষ্টি করে না বরং নিজেরাই সৃষ্ট,[৯] যারা নিজেদের জন্যও কোন উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না, যারা না জীবন-মৃত্যু দান করতে পারে আর না মৃতদেরকে আবার জীবিত করতে পারে।[১০]

কিন্তু যে কোন অনুবাদই করা হোক না কেন তা থেকে পূর্ণ অর্থ প্রকাশ হয় না। এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিসের কেবল অস্তিত্বই দান করেননি বরং তিনিই প্রত্যেকটি জিনিসকে তার সত্তার সাথে সম্পর্কিত আকার-আকৃতি, দেহ সৌষ্ঠব, শক্তি, যোগ্যতা, গুণাগুণ, বৈশিষ্ট, কাজ ও কাজের পদ্ধতি, স্থায়িত্বের সময়-কাল, উত্থান ও ক্রমবিকাশের সীমা এবং অন্যান্য যাবতীয় বিস্তারিত বিষয় নির্ধারণ করেছেন। তারপর যেসব কার্য-কারণ, উপায়-উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধার বদৌলতে প্রত্যেকটি জিনিস এখানে নিজ পরিসরে নিজের ওপর আরোপিত কাজ করে যাচ্ছে তা বিশ্ব-জগতে তিনিই সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

তাওহীদের সমগ্র শিক্ষা এ একটি আয়াতের মধ্যেই ভরে দেয়া হয়েছে। এটি কুরআন মজীদের সর্বাত্মক তাৎপর্যবহ আয়াতগুলোর মধ্যে একটি মহান মর্যাদাপূর্ণ আয়াত। এর মাত্র কয়েকটি শব্দের মধ্যে এত বিশাল বিষয়বস্তু ভরে দেয়া হয়েছে যে, এর ব্যাপ্তি পরিবেষ্টন করার জন্য পুরোপুরি একটি কিতাব যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে না। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا افصح الغلام من بنى عبد المطلب علمه هذه الاية –

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, তাঁর বংশের কোন শিশু যখন কথা বলা শুরু করতো তখন তিনি তাকে এ আয়াতটি শিখিয়ে দিতেন।" (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ও মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ। আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

এ থেকে জানা যায়, মানুষের মনে তাওহীদের পুরোপুরি ধারণা বসিয়ে দেবার জন্য এ আয়াতটি একটি উত্তম মাধ্যম। প্রত্যেক মুসলমানের সন্তানের শৈশবে যখন বুদ্ধির প্রাথমিক উন্মেষ ঘটে তখনই তার মন-মগজে শুরুতেই এ নকশাটি বসিয়ে দেয়া উচিত।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ④ وَقَالُوٓا أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ⑤ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ⑥

যারা নবীর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলে, এ ফুরকান একটি মনগড়া জিনিস, যাকে এ ব্যক্তি নিজেই তৈরি করেছে এবং অপর কিছু লোক তার এ কাজে তাকে সাহায্য করেছে। বড়ই জুলুম[১১] ও ডাহা মিথ্যায় তারা এসে পৌঁছেছে। বলে, এসব পুরাতন লোকদের লেখা জিনিস—যেগুলো এ ব্যক্তি লিখিয়ে নিয়েছে এবং তা তাকে সকাল-সাঁঝে শুনানো হয়। হে মুহাম্মাদ! বলো, "একে নাযিল করেছেন তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর রহস্য জানেন।"[১২] আসলে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ার্দ্র।[১৩]

৯. এ শব্দগুলো ব্যাপক ও পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে এবং এ থেকে সব ধরনের মনগড়া মাবুদ ও উপাস্য বুঝায়। আল্লাহর অনেক সৃষ্টিকে মানুষ মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, যেমন ফেরেশতা, জিন, নবী, আউলিয়া, সূর্য, চাঁদ, গ্রহ-নক্ষত্র, নদ-নদী, গাছ-পালা, পশু ইত্যাদি। আবার মানুষ নিজেই কিছু জিনিস থেকে তৈরি করে তাদেরকে মাবুদ ও উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, যেমন পাথর, কাঠ ও মাটির তৈরি মূর্তি।

১০. বক্তব্যের সার নির্যাস হচ্ছে মহান আল্লাহ তাঁর এক বান্দার কাছে প্রকৃত সত্য কি তা দেখিয়ে দেবার জন্য এ ফুরকান নাযিল করেন কিন্তু লোকেরা তা থেকে গাফেল হয়ে এ গোমরাহিতে লিপ্ত হয়েছে। কাজেই সতর্ককারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে এক বান্দাকে পাঠানো হয়েছে। তিনি লোকদেরকে এ বোকামির অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করবেন। তাঁর প্রতি পর্যায়ক্রমে এ ফুরকান নাযিল করা শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি হককে বাতিল থেকে এবং আসলকে নকল থেকে আলাদা করে দেখিয়ে দেবেন।

১১. অন্য অনুবাদ "বড়ই অন্যায় ও বেইনসাফির কথা"ও হতে পারে।

১২. বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে এ আপত্তিটিই উত্থাপন করে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন বৈরী সমাজের একজনও একথা বলেনি যে, শিশুকালে খৃষ্টীয় যাজক বুহাইরার সাথে যখন তোমার দেখা হয়েছিল তখন তার কাছ থেকে এ সমস্ত বিষয় তুমি শিখে নিয়েছিলে। তাদের কেউ একথাও বলেনি যে, যৌবনকালে বাণিজ্যিক সফরে তুমি যখন বাইরে যেতে সে সময় খৃষ্টীয় পাদ্রী ও ইহুদি রাব্বীদের কাছ তেকে তুমি এসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলে। কারণ এসব সফরের অবস্থা তাদের জানা ছিল। তিনি একাকী এসব

সফর করেননি। বরং তাদের নিজস্ব কাফেলার সাথে সফর করেছিলেন। তারা জানতো, এগুলোর সাথে জড়িত করে বাইর থেকে কিছু শিখে আসার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপন করলে তাদের নিজেদের শহরের হাজার হাজার লোক তাদের মিথ্যুক বলবে। তাছাড়া মক্কার প্রত্যেক সাধারণ লোক জিজ্ঞেস করবে, যদি এসব তথ্য এ ব্যক্তি বারো তেরো বছর বয়সেই বুহাইরা থেকে লাভ করে থাকে অথবা ২৫ বছর বয়সে যখন থেকে তার বাণিজ্যিক সফর শুরু হয় তখন থেকেই লাভ করতে থাকে, তাহলে এ ব্যক্তি তো বাইরে কোথাও থাকতো না, আমাদের এ শহরে আমাদের মধ্যেই বাস করতো, এ অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত তার এসব জ্ঞান অপ্রকাশ থাকলো কেমন করে? কখনো তার মুখ থেকে এমন একটি শব্দও বের হলো না কেমন করে যার মাধ্যমে তার এ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটতো? এ কারণেই মক্কার কাফেররা এ ধরনের ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি। এটা তারা ছেড়ে দিয়েছিল পরবর্তীকালের আরো বেশী নির্লজ্জ লোকদের জন্য। নবুওয়াত পূর্বকাল সম্পর্কে কোন কথা তারা বলতো না। তাদের কথা ছিল নবুওয়াত দাবীর সময়ের সাথে সম্পর্কিত। তারা বলতো, এ ব্যক্তি তো নিরক্ষর, নিজে পড়াশুনা করে নতুন জ্ঞান আহরণ করতে পারে না। ইতিপূর্বে কিছু শেখেনি। আজ এর মুখ থেকে যেসব কথা বের হচ্ছে চল্লিশ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত এগুলোর কোন কথাই সে জানতো না। তাহলে এখন হঠাৎ এসব জ্ঞান আসছে কোথা থেকে? এগুলোর উৎস নিশ্চয়ই আগের যুগের লোকদের কিছু কিতাব। রাতের বেলা চুপিসারে সেগুলো থেকে কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করিয়ে লেখানো হয়। কাউকে দিয়ে তার অংশবিশেষ পড়িয়ে এ ব্যক্তি শুনতে থাকে তারপর সেগুলো মুখস্থ করে নিয়ে দিনের বেলা আমাদের শুনিয়ে দেয়। হাদীস থেকে জানা যায়, এ প্রসংগে তারা বেশ কিছু লোকের নামও নিতো। তারা ছিল আহলি কিতাব। তারা লেখাপড়া জানতো এবং মক্কায় বাস করতো। অর্থাৎ আদ্দাস (হুওয়াইতিব ইবনে আবদুল উয্‌যার আজাদকৃত গোলাম), ইয়াসার (আলা আল–হাদরামির আজাদ করা গোলাম) এবং জাবর (আমের ইবনে রাবী'আর আজাদকৃত গোলাম)।

আপাতদৃষ্টিতে এটা বড়ই শক্তিশালী অভিযোগ মনে হয়। অহীর দাবী নাকচ করার জন্য নবী কোথা থেকে জ্ঞান অর্জন করেন তা চিহ্নিত করার চাইতে বড় ওজনদার আপত্তি আর কি হতে পারে। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে মানুষ এ ব্যাপারটি দেখে অবাক হয়ে যায় যে, এর জবাবে আদৌ কোন যুক্তিই পেশ করা হয়নি বরং কেবলমাত্র একথা বলেই শেষ করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সত্যের প্রতি জুলুম করছো, পরিষ্কার বেইনসাফির কথা বলছো, ডাহা মিথ্যার বেসাতি করছো। এতো এমন আল্লাহর কালাম যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন রহস্য জানেন। এ ধরনের কঠোর বিরোধিতার পরিবেশে এমনিতর কঠিন অভিযোগ পেশ করা হয় এবং তাকে এভাবে তাচ্ছিল্যভরে রদ করে দেয়া হয়, এটা কি বিস্ময়কর নয়? সত্যিই কি এটা এমনি ধরনের তুচ্ছ ও নগণ্য অভিযোগ ছিল? এর জবাবে কি শুধুমাত্র "মিথ্যা ও জুলুম" বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল? এ সংক্ষিপ্ত জবাবের পর সাধারণ মানুষ আর কোন বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট জবাবের দাবী করেনি, নতুন মু'মিনদের মনেও কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি এবং বিরোধীদের কেউও একথা বলার হিম্মত করেনি যে, দেখো, আমাদের এ শক্তিশালী অভিযোগের জবাব দিতে পারছে না, নিছক "মিথ্যা ও জুলুম" বলে একে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, এর কারণ কি?

ইসলাম বিরোধীরা যে পরিবেশে এ অভিযোগ করেছিল সেখানেই আমরা এ সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবো ঃ

প্রথম কথা ছিল, মক্কার যেসব জালেম সরদার মুসলমানদের মারপিট করছিল ও কষ্ট দিচ্ছিল তারা যেসব লোক সম্পর্কে বলতো যে, তারা পুরাতন কিতাব থেকে অনুবাদ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুখস্থ করাচ্ছে তাদের গৃহ এবং নবীর (সা) গৃহ অবরোধ করে তাদের নিজেদের কথামত এ কাজের জন্য যেসব বই ও কাগজপত্র জমা করা হয়েছিল সেসব আটক করা তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন ব্যাপার ছিল না। ঠিক যে সময় এ কাজ করা হচ্ছিল তখনই তারা সেখানে অতর্কিত হামলা চালিয়ে মূল প্রমাণপত্র লোকদের দেখাতে পারতো এবং বলতে পারতো, দেখো, এ তোমাদের নবুওয়াতের প্রস্তুতি চলছে। বেলালকে যারা মরুভূমির তপ্ত বালুর বুকে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে ফিরছিল তাদের পক্ষে এ কাজ করার পথে কোন নিয়ম ও আইন–কানুন বাধ্য ছিল না। এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারা চিরকালের জন্য মুহাম্মাদী নবুওয়াতের বিপদ দূর করতে পারতো। কিন্তু তারা কেবল মুখেই অভিযোগ করতে থাকে। কোনদিনও এ ধরনের চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসেনি।

দ্বিতীয় কথা ছিল, এ প্রসংগে তারা যেসব লোকের নাম নিতো তারা কেউ বাইরের লোক ছিল না। সবাই ছিল এ মক্কা শহরেরই বাসিন্দা। তাদের যোগ্যতা গোপন ছিল না। সামান্য বুদ্ধি–বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও দেখতে পারতো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা পেশ করছেন তা কোন্ পর্যায়ের, তার ভাষা কত উচ্চ পর্যায়ের, সাহিত্য মর্যাদা কত উন্নত, শব্দ ও বাক্য কেমন শিল্পসমৃদ্ধ এবং সেখানে কত উন্নত পর্যায়ের চিন্তা ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। অন্যদিকে মুহাম্মাদ (সা) যাদের থেকে এসব কিছু হাসিল করছেন বলে তারা দাবী করছে তারা কোন্ পর্যায়ের লোক। এ কারণে এ অভিযোগকে কেউই এক কানাকড়ি গুরুত্ব দেয়নি। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করতো, এসব কথায় মনের জ্বালা মেটানো হচ্ছে, নয়তো এ কথার মধ্যে সন্দেহ করার মতো একটুও প্রাণশক্তি নেই। যারা এসব লোককে জানতো না তারাও শেষমেষ এতটুকুন কথাও চিন্তা করতে পারতো যে, যদি তারা এতই যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে থাকতো, তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদের পাণ্ডিত্যের প্রদীপ জ্বালালো না কেন? অন্য একজনের প্রদীপে তেল যোগান দেবার কি প্রয়োজন তাদের পড়েছিল? তাও আবার চুপিসারে, যাতে এ কাজের খ্যাতির সামান্যতম অংশও তাদের ভাগে না পড়ে?

তৃতীয় কথা ছিল, এ প্রসংগে যেসব লোকের নাম নেয়া হচ্ছিল তারা সবাই ছিল বিদেশাগত গোলাম। তাদের মালিকরা তাদেরকে স্বাধীন করে দিয়েছিল। সেকালের আরবের গোত্রীয় জীবনে কোন ব্যক্তিও কোন শক্তিশালী গোত্রের সাহায্য–সমর্থন ছাড়া বাঁচতে পারতো না। গোলাম স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পরও তার সাবেক মালিকের পৃষ্ঠপোষকতায় বসবাস করতো। তার সাহায্য–সমর্থনই হতো স্বাধীনতাপ্রাপ্ত গোলামের জীবনের সহায়ক। তখন একথা সুস্পষ্ট ছিল, যদি বলা হয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বদৌলতে নাউযুবিল্লাহ একটি মিথ্যা নবুওয়াতের দোকান চালাচ্ছিলেন, তাহলে এ লোকগুলো তো কোন প্রকার আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্যে এ ষড়যন্ত্রে তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতো না। এমন এক ব্যক্তি যে রাতের বেলা তাদের কাছ থেকে কিছু

কথা শিখে নিতো এবং দিনের বেলা সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর সেগুলো অহী হিসেবে নাযিল হয়েছে বলে পেশ করতো, তার আন্তরিক সহযোগী ও অন্ধ ভক্ত তারা কেমন করে হতে পারতো? তাই তাদের অংশগ্রহণ হতে পারতো কোন লোভ ও স্বার্থের ভিত্তিতে। কিন্তু কোন সচেতন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি একথা চিন্তা করতে পারতো যে, এরা নিজেদের পৃষ্ঠপোষকদেরকে নারাজ করে দিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ ষড়যন্ত্রে শরীক হয়ে গিয়ে থাকবে? কি এমন লোভ হতে পারতো যেজন্য তারা সমগ্র জাতির ক্রোধ ও তিরস্কারের লক্ষবস্তু এবং সমগ্র জাতি যাকে শত্রু বলে চিহ্নিত করেছে তার সাথে সহযোগিতা করতো এবং এ ধরনের বিপদগ্রস্ত লোকের কাছ থেকে কোন লাভের আশায় নিজের পৃষ্ঠপোষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ক্ষতি বরদাশ্‌ত করতো? তারপর তাদের মারধর করে ঐ ব্যক্তির সাথে তাদের ষড়যন্ত্রের স্বীকারোক্তি আদায় করার সুযোগ তাদের পৃষ্ঠপোষকদের তো ছিলই, এটাও চিন্তা করার ব্যাপার ছিল। তারা এ সুযোগ ব্যবহার করেনি কেন? কেনই বা তারা সমগ্র জাতির সামনে তাদের নিজেদের মুখে এ স্বীকৃতি প্রকাশ করেনি যে, তাদের কাছ থেকে শিখে ও জ্ঞান নিয়ে নবুওয়াতের এ দোকান জমজমাট করা হচ্ছে?

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল এই যে, তারা সবাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনে এবং সাহাবায়ে কেরাম রসূলের পবিত্র সত্তার প্রতি যে নজিরবিহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তারাও তার অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক নবুওয়াত তৈরির পেছনে যারা নিজেরাই মাল-মশলা যুগিয়েছে তারাই আবার তার প্রতি ঈমান আনবে এবং প্রাণঢালা শ্রদ্ধা সহকারে ঈমান আনবে এটা কি সম্ভব? আর ধরে নেয়া যাক যদি এটা সম্ভব হয়ে থেকেও থাকে, তাহলে মু'মিনদের জামায়াতে তাদের তো কোন উল্লেখযোগ্য মর্যদা লাভ করা উচিত ছিল। আদ্দাস, ইয়াসার ও জাব্‌রের শক্তির ওপর নির্ভর করে নবুওয়াতের কাজ-কারবার চলবে আর নবীর দক্ষিণ হস্ত হবেন আবু বকর, উমর ও আবু উবাইদাহ, এটা কেমন করে সম্ভব হলো?

অনুরূপভাবে এ ব্যাপারটিও ছিল বড়ই অবাক করার মতো, যদি কয়েকজন লোকের সহায়তায় রাতের বেলা বসে নবুওয়াতের এ ব্যবসায়ের কাগজ-পত্র তৈরি করা সম্ভব হয়ে থেকে থাকে তাহলে যায়েদ ইবনে হারেসা, আলী ইবনে আবু তালেব, আবু বকর সিদ্দীক ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিবারাত্রের সহযোগী অন্যান্য লোকদের থেকে তা কিভাবে গোপন থাকতে পারতো? এ অভিযোগের মধ্যে যদি সত্যের সামান্যতম গন্ধও থাকতো, তাহলে এ লোকগুলো কেমন করে এ ধরনের আন্তরিকতা সহকারে নবীর প্রতি ঈমান আনলো এবং তাঁর সমর্থনে সব ধরনের বিপদ-আপদ ও ক্ষতি কিভাবে বরদাশ্‌ত করলো? এটা কি কোনক্রমেই সম্ভব ছিল? এসব কারণে প্রত্যেক শ্রোতার কাছে এ অভিযোগ এমনিতেই ছিল অর্থহীন ও অযৌক্তিক। তাই কোন গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের জবাব দেবার জন্য কুরআনে একে উদ্ধৃত করা হয়নি বরং একথা বলার জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, দেখো, সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষেত্রে এরা কেমন অন্ধ হয়ে গেছে এবং কেমন ডাহা মিথ্যা, অন্যায় ও বেইনসাফির আশ্রয় নিয়েছে।

১৩. এখানে এ বাক্যাংশটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ কি অপরূপ দয়া ও ক্ষমার আধার! যারা সত্যকে অপদস্ত করার জন্য এমন সব মিথ্যার পাহাড় সৃষ্টি করে

وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۙ﴿۷﴾ اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿۸﴾

তারা বলে, "এ কেমন রসূল, যে খাবার খায় এবং হাটে বাজারে ঘুরে বেড়ায়?[১৪] কেন তার কাছে কোন ফেরেশতা পাঠানো হয়নি, যে তার সাথে থাকতো এবং (অস্বীকারকারীদেরকে)[১৫] ধমক দিতো? অথবা আর কিছু না হলেও তার জন্য অন্তত কিছু ধন–সম্পদ অবতীর্ণ করা হতো অথবা তার কাছে থাকতো অন্তত কোন বাগান, যা থেকে সে (নিশ্চিন্তে) রুজি সংগ্রহ করতো?"[১৬] আর জালেমরা বলে, " তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত[১৭] ব্যক্তির অনুসরণ করছো।"

তাদেরকেও তিনি অবকাশ দেন এবং তাদের অপরাধের কথা শুনার সাথে সাথেই তাদের ওপর আযাব নাযিল করা আরম্ভ করেন না। এ সাবধান বাণীর সাথে সাথে এর মধ্যে উপদেশেরও একটি দিক আছে। সেটি যেন ঠিক এমনি ধরনের যেমন, "হে জালেমরা! এখনো যদি নিজেদের হিংসা–দ্বেষ থেকে বিরত হও এবং সত্য কথাকে সোজাভাবে মেনে নাও তাহলে আজ পর্যন্ত যা কিছু করতে থেকেছো সবই ক্ষমা করা যেতে পারে।"

১৪. অর্থাৎ প্রথমত মানুষের রসূল হওয়াটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার। আল্লাহর পয়গাম নিয়ে যদি কোন ফেরেশতা আসতো তাহলে না হয় বুঝতাম। কিন্তু একজন রক্ত–মাংসের মানুষ জীবিত থাকার জন্য যে খাদ্যের মুখাপেক্ষী সে কেমন করে আল্লাহর পয়গাম নিয়ে আসে! যাহোক তবুও যদি মানুষকেই রসূল করা হয়ে থাকে তবে তাকে তো অন্তত বাদশাহ ও দুনিয়ার বড় লোকদের মতো উন্নত পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব হওয়া উচিত ছিল। তাকে দেখার জন্য চোখ উন্মুখ হয়ে থাকতো এবং তার দরবারে হাজির হবার সৌভাগ্য হতো অনেক দেন–দরবার ও সাধ্য–সাধনার পর। কিন্তু তা না হয়ে এমন এক জন সাধারণ লোককে কিভাবে পয়গম্বর করে দেয়া হয় যে, বাজারের মধ্যে ঘুরে ঘুরে জুতোর তলা ক্ষয় করতে থাকে? পথ চলতি মানুষ যাকে প্রতিদিন দেখে এবং কোন দিক দিয়েই যার মধ্যে কোন অসাধারণত্বের সন্ধান পায় না, কে তাকে গ্রাহ্য করবে? অন্য কথায় রসূলের প্রয়োজন থাকলে তা সাধারণ মানুষকে পথনির্দেশনা দেবার জন্য ছিল না বরং ছিল বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটাবার এবং ঠাটবাট দেখাবার ও ভীতি প্রদর্শন করার জন্য। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল মু'মিনূন, ২৬ টীকা)

১৫. অর্থাৎ যদি মানুষকেই নবী করা হয়ে থাকে তাহলে একজন ফেরেশতাকে তার সংগে দেয়া হতো। তিনি সব সময় একটি চাবুক হাতে নিয়ে ঘুরতেন এবং লোকদের

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾

দেখো, কেমন সব উদ্ভট ধরনের যুক্তি তারা তোমার সামনে খাড়া করেছে, তারা এমন বিভ্রান্ত হয়েছে যে, কোন কাজের কথাই তাদের মাথায় আসছে না।[১৮]

বলতেন, "এ ব্যক্তির কথা মেনে নাও, নয়তো এখনই আল্লাহর আযাব বর্ষণ করার ব্যবস্থা করছি।" বিশ্বজাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক এক ব্যক্তিকে নবুওয়াতের মহান মর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্ব প্রদান করে এমনি একাকী ছেড়ে দেবেন লোকদের গালিগালাজ ও দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খাবার জন্য এটা তো বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার।

১৬. এটা যেন ছিল তাদের শেষ দাবী। অর্থাৎ আল্লাহ অন্তত এতটুকুই করতেন যে, নিজের রসূলের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ভালো ব্যবস্থা করে দিতেন। এ কেমন ব্যাপার, আল্লাহর রসূল আমাদের একজন সাধারণ পর্যায়ের ধনী লোকের চেয়েও খারাপ অবস্থায় থাকেন! নিজের খরচ চালাবার মতো ধন-সম্পদ নেই, ফল ফলারি খাবার মতো বাগান নেই একটিও, আবার দাবী করেন তিনি রব্বুল আলামীন আল্লাহর নবী।

১৭. অর্থাৎ পাগল। আরবদের দৃষ্টিতে পাগলামির কারণ ছিল দু'টো। কারো ওপর জিনের ছায়া পড়লে সে পাগল হয়ে যেতো অথবা যাদু করে কাউকে পাগল করা হতো। তাদের দৃষ্টিতে তৃতীয় আরো একটি কারণও ছিল। সেটি ছিল এই যে, কোন দেবদেবীর বিরুদ্ধে কেউ বেআদবী করলে তার অভিশাপ তার ওপর পড়তো এবং তার ফলে সে পাগল হয়ে যেতো। মক্কার কাফেররা প্রায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে এ কারণগুলো বর্ণনা করতো। কখনো বলতো, এ ব্যক্তির ওপর কোন জিন চেপে বসেছে। কখনো বলতো, বেচারার ওপর কোন দুশমন যাদু করে দিয়েছে। আবার কখনো বলতো, আমাদের কোন দেবতার সাথে বেআদবী করার খেসারত এ বেচারা ভুগছে। কিন্তু এই সংগে তাঁকে আবার এতটা বুদ্ধিমান ও ধীশক্তি সম্পন্নও মনে করতো যে, এ ব্যক্তি একটি অনুবাদ ভবন কায়েম করেছে এবং সেখানে পুরাতন সব গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে তার অংশবিশেষ বাছাই করে করে মুখস্থ করছে। এছাড়াও তারা তাঁকে যাদুকরও বলতো। অর্থাৎ তিনি নিজে যাদুকরও ছিলেন আবার অন্যের যাদুতে প্রভাবিতও ছিলেন। এর পর আর একটি বাড়তি দোষারোপ এও ছিল যে, তিনি কবিও ছিলেন।

১৮. এ আপত্তি ও অভিযোগগুলোও এখানে মূলত জবাব দেবার জন্য নয় বরং অভিযোগকারীরা হিংসা ও বিদ্বেষে কি পরিমাণ অন্ধ হয়ে গেছে তা বুঝবার জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। উপরে তাদের যেসব কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে তার মধ্যে কোন একটিও গুরুত্বসহকারে আলোচনা করার মতো নয়। তাদের শুধুমাত্র উল্লেখ করাই একথা বলার জন্য যথেষ্ট যে, বিরোধীদের কাছে ন্যায়সংগত যুক্তির অভাব অত্যন্ত প্রকট এবং নেহাতই বাজে ও বস্তাপচা কথার সাহায্যে তার একটি যুক্তি সিদ্ধ ও নীতিগত দাওয়াতের মোকাবিলা করছে। এক ব্যক্তি বলছেন, হে লোকেরা! এই যে শিরকের ওপর তোমরা নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি-সভ্যতার বুনিয়াদ কায়েম করে রেখেছো এ তো একটি মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং এর মিথ্যা ও ভ্রান্ত হবার পেছনে এ যুক্তি কাজ করছে। জবাবে শিরকের সত্যতার সপক্ষে কোন যুক্তি পেশ করা হয় না বরং শুধুমাত্র এভাবে একটি

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١٠﴾ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۟ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾

২য় রুকূ'

বড়ই বরকত সম্পন্ন তিনি[১৯] যিনি চাইলে তাঁর নির্ধারিত জিনিস থেকে অনেক বেশী ও উৎকৃষ্টতর জিনিস তোমাকে দিতে পারেন, (একটি নয়) অনেকগুলো বাগান যেগুলোর পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বড় বড় প্রাসাদ।

আসল কথা হচ্ছে, এরা " সে সময়টিকে"[২০] মিথ্যা বলেছে[২১] এবং যে সে সময়কে মিথ্যা বলে তার জন্য আমি জ্বলন্ত আগুন তৈরি করে রেখেছি।

বিদ্রূপ ধ্বনি উঠানো হয় যে, আরে এ লোকের ওপর তো যাদু করা হয়েছে। তিনি বলছেন, বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থা চলছে তাওহীদের ভিত্তিতে এবং এইসব বিভিন্ন সত্য এর সাক্ষ দিচ্ছে। জবাবে বড় গলায় ধ্বনিত হচ্ছে—এ ব্যক্তি যাদুকর। তিনি বলছেন, দুনিয়ায় তোমাদের লাগামহীন উটের মতো ছেড়ে দেয়া হয়নি বরং তোমাদের রবের কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে, পরবর্তী জীবনে তোমাদের এ জীবনের সমস্ত কাজকর্মের হিসেব দিতে হবে এবং এসব বিবিধ নৈতিক, ঐতিহাসিক এবং যুক্তি ও তথ্যগত বিষয় এ সত্যটি প্রমাণ করছে। জবাবে বলা হচ্ছে, আরে এতো একজন কবি। তিনি বলছেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি সত্যের শিক্ষা নিয়ে এবং সে শিক্ষাটি হচ্ছে এই। জবাবে এ শিক্ষার ওপর কোন আলোচনা সমালোচনা করা হয় না বরং প্রমাণ ছাড়াই একটি দোষারোপ করা হয় এই মর্মে যে, এসব কিছুই কোথাও থেকে নকল করা হয়েছে। নিজের রিসালাতের প্রমাণ স্বরূপ তিনি আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বাণী পেশ করছেন। নিজের জীবন ও নিজের চরিত্র ও কার্যাবলী পেশ করছেন এবং তার প্রভাবে তার অনুসারীদের জীবনে যে নৈতিক বিপ্লবের সূচনা হচ্ছিল তাও পেশ করছেন। কিন্তু বিরোধিতাকারীরা এর কোনটিও দেখে না। তারা কেবল জিজ্ঞেস করছে, তুমি খাও কেন? বাজারে চলাফেরা করো কেন? কোন ফেরেশতাকে তোমার আরদালী হিসেবে দেয়া হয়নি কেন? তোমার কাছে কোন অর্থভাণ্ডার বা বাগান নেই কেন? এ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কে এর মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে আজেবাজে ও উদ্ভট কথা বলে চলছে এসব কথা আপনাআপনিই তা প্রমাণ করে দিচ্ছিল।

১৯. এখানে আবার সেই একই تبارك শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরবর্তী বিষয়বস্তু থেকে একথা জানা যাচ্ছে যে, এখানে এর মানে হচ্ছে "বিপুল সম্পদ ও উপকরণাদির অধিকারী," "সীমাহীন শক্তিধর" এবং "কারো কোন কল্যাণ করতে চাইলে করতে পারেন না, এর অনেক উর্ধে।"

২০. মূলে السَّاعَة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। سَاعَة মানে মুহূর্ত ও সময় এবং তার সাথে ال সংযোগ করার ফলে এর অর্থ হয়, সেই নির্দিষ্ট সময় যা আসবে এবং যে সম্পর্কে আমি পূর্বাহ্নেই তোমাকে খবর দিয়েছি। কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এ শব্দটি একটি পারিভাষিক অর্থে এমন একটি বিশেষ সময়ের জন্য বলা হয়েছে যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, পূর্বের ও পরের সবাইকে নতুন করে জীবিত করে উঠানো হবে, সবাইকে একত্র করে আল্লাহ হিসেব নেবেন এবং সবাইকে তার বিশ্বাস ও কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি দেবেন।

২১. অর্থাৎ তারা যেসব কথা বলছে তার কারণ এ নয় যে, সত্যিসত্যিই কোন সংগত ভিত্তিতে তাদের মনে এ সন্দেহ জেগেছে যে, কুরআন অন্য কোথাও থেকে নকল করা বাণীর সমষ্টি অথবা তারা যথার্থই ধারণা করে যেসব আজাদ করা গোলামের নাম তারা রটিয়ে থাকে তারাই তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেয় কিংবা তুমি আহার করো ও বাজারে চলাফেরা করো কেবলমাত্র এ জিনিসটিই তোমার রিসালাত মেনে নেবার ব্যাপারে তাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করছে অথবা তোমার সত্যের শিক্ষা মেনে নিতে তারা তৈরিই ছিল কিন্তু তোমার সাথে আরদালী হিসেবে কোন ফেরেশতা ছিল না এবং তোমার জন্য কোন অর্থভাণ্ডারও অবতীর্ণ করা হয়নি শুধুমাত্র এ জন্যই তারা পিছিয়ে গিয়েছে। এগুলোর কোনটিই আসল কারণ নয়। বরং আখেরাত অস্বীকারই হচ্ছে এর আসল কারণ, যা হক ও বাতিলের ব্যাপারে তাদেরকে একেবারেই দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে। এরি ফলশ্রুতিতে তারা আদতে কোন গভীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা অনুসন্ধানের প্রয়োজনই অনুভব করে না এবং তোমার যুক্তিসংগত দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার জন্য এমনই সব হাস্যকর যুক্তি পেশ করতে উদ্যত হয়েছে। এ জীবনের পরে আর একটি জীবনও আছে যেখানে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে তাদের সমস্ত কার্যকলাপের জবাবদিহি করতে হবে, এ চিন্তা তাদের মাথায় আসেই না। তারা মনে করে, এ দু'দিনের জীবনের পরে সবাইকে মরে গিয়ে মাটিতে মিশে যেতে হবে। মূর্তিপূজারীও যেমন মাটিতে মিশে যাবে, তেমনি আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং আল্লাহতে অবিশ্বাসীও। কোন জিনিসেরও কোন পরিণাম ফল নেই। তাহলে মুশরিক হিসেবে মরা এবং তাওহীদবাদী বা নাস্তিক হিসেবে মরার মধ্যে ফারাক কোথায়? তাদের দৃষ্টিতে সত্য ও অসত্যের মধ্যকার ফারাকের যদি কোন প্রয়োজন থেকে থাকে তাহলে তা থাকে এ দুনিয়ার সাফল্য ও ব্যর্থতার দিক দিয়ে, অন্য কোন দিক দিয়ে নয়। এখানে তারা দেখে, কোন বিশ্বাস বা নৈতিক মূলনীতিরও কোন নির্ধারিত ফলাফল নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রতিটি মনোভাব ও কর্মনীতির ব্যাপারে পূর্ণ সমতা সহকারে এ ফলাফল প্রকাশিত হয় না। নাস্তিক, অগ্নিউপাসক, খৃষ্টান, ইহুদী ও নক্ষত্রপূজারী সবাই ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয়। এমন কোন একটি বিশ্বাস নেই যে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা একথা বলে যে, এ বিশ্বাস অবলম্বনকারী অথবা তা প্রত্যাখ্যানকারী এ জগতে চিরকাল নিশ্চিত সচ্ছল বা নিশ্চিত অসচ্ছল অবস্থায় থাকে। অসৎকর্মশীল এবং সৎকর্মশীলও এখানে চিরকাল নিজের কর্মকাণ্ডের একই নির্ধারিত ফল ভোগ করে না। একজন অসৎকর্মশীল আরাম আয়েশ করে যাচ্ছে এবং অন্যজন শাস্তি পাচ্ছে। একজন সৎকর্মশীল বিপদসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং অন্যজন সম্মানীয় ও মর্যাদাশালী হয়ে বসে আছে। কাজেই পার্থিব ফলাফলের দিক দিয়ে কোন বিশেষ নৈতিক মনোভাব ও কর্মনীতি সম্পর্কেও আখেরাত অস্বীকারকারীরা তার কল্যাণ বা অকল্যাণ হবার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَّا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ﴿١٦﴾

আগুন যখন দূর থেকে এদের দেখবে[২২] তখন এরা তার ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত চিৎকার শুনতে পাবে। আর যখন এরা শৃংখলিত অবস্থায় তার মধ্যে একটি সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে তখন নিজেদের মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। (তখন তাদের বলা হবে) আজ একটি মৃত্যুকে নয় বরং বহু মৃত্যুকে ডাকো।

এদের বলো, এ পরিণাম ভালো অথবা সেই চিরন্তন জান্নাত যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে? সেটি হবে তাদের কর্মফল এবং তাদের সফরের শেষ মনযিল। সেখানে তাদের প্রত্যেকটি ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তার মধ্যে তারা থাকবে চিরকাল। তা প্রদান করা হবে তোমার রবের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত একটি অবশ্য পালনীয় প্রতিশ্রুতি।[২৩]

হতে পারে না। এহেন পরিস্থিতিতে যখন কোন ব্যক্তি তাদেরকে একটি বিশ্বাস ও একটি নৈতিক নিয়ম শৃংখলার দিকে আহবান জানায় তখন সে যতই গুরুগম্ভীর ও ন্যায়সংগত যুক্তির সাহায্যে নিজের দাওয়াত পেশ করুক না কেন একজন আখেরাত অস্বীকারকারী কখনো গুরুত্ব সহকারে তা বিবেচনা করবে না বরং বালসুলভ ওজর–আপত্তি জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করবে।

২২. আগুন কাউকে দেখবে–একথাটা সম্ভবত রূপক অর্থে বলা হয়েছে। যেমন আমরা বলি, ঐ জামে মসজিদের মিনার তোমাকে দেখছে। আবার এটা প্রকৃত অর্থেও হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো চেতনাহীন হবে না বরং ভালোভাবে দেখে শুনে জ্বালাবে।

২৩. মূল শব্দ হচ্ছে وعدا مسئولا অর্থাৎ এমন প্রতিশ্রুতি যা পূর্ণ করার দাবী করা যেতে পারে। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, জান্নাতের এ প্রতিশ্রুতি ও জাহান্নামের এ ভীতি প্রদর্শন এমন এক ব্যক্তির ওপর কি প্রভাব ফেলতে পারে যে পূর্ব থেকেই কিয়ামত, শেষ বিচারের দিন এবং জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস করে না? এদিক দিয়ে বিচার করলে বাহ্যত এটি পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে অসংগতিশীল একটি বাণী বলে মনে হবে। কিন্তু একটু

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾

আর সেদিনই (তোমার রব) তাদেরও ঘিরে আনবেন এবং তাদের উপাস্যদেরও[২৪] আল্লাহকে বাদ দিয়ে আজ তারা যাদের পূজা করছে। তারপর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন, " তোমরা কি আমার এ বান্দাদের গোমরাহ করেছিলে? অথবা এরা নিজেরাই সহজ সরল সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল?"[২৫]

গভীরভাবে চিন্তা করলে একথাটা সহজেই বোধগম্য হবে। ব্যাপার যদি এমন হয় যে, আমি একটি কথা স্বীকার করাতে চাই এবং অন্যজন তা স্বীকার করতে চায় না, তাহলে এক্ষেত্রে আলোচনা ও বিতর্কের ধরন হবে এক রকম। কিন্তু যদি আমি নিজের শ্রোতার সাথে এমনভাবে আলাপ করতে থাকি যে, আমার কথা মানা না মানার ব্যাপারটা আলোচ্য নয় বরং শ্রোতার স্বার্থ ও লাভক্ষতিই হচ্ছে আলোচ্য বিষয়, তাহলে এক্ষেত্রে শ্রোতা যতই হঠকারী হোক না কেন একবার অবশ্যই চিন্তা করতে বাধ্য হবে। এখানে কথা বলার ও বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য এ দ্বিতীয় ভংগীটিই অবলম্বিত হয়েছে। এ অবস্থায় শ্রোতাকে তার নিজের কল্যাণের জন্য একথা ভাবতে হয় যে, পরকালীন জীবন অনুষ্ঠিত হবার প্রমাণ যদি নাই বা থাকে তাহলে তার অনুষ্ঠিত না হবারও তো কোন প্রমাণ নেই। আর সম্ভাবনা উভয়টিরই আছে। এখন যদি পরকালীন জীবন না থেকে থাকে, যেমনটি আমরা মনে করছি, তাহলে আমাদেরও মরে মাটির সাথে মিশে যেতে হবে এবং পরকালীন জীবন স্বীকারকারীদেরও। এ অবস্থায় উভয়ে সমান পর্যায়ে অবস্থান করবে। কিন্তু যদি এ ব্যক্তি যে কথা বলছে তা–ই সত্য হয়ে যায় তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমাদের বাঁচোয়া নেই। এভাবে এ বাচনভংগী শ্রোতার হঠকারিতার দেয়ালে ফাটল ধরিয়ে দেয়। এ ফাটল আরো বেশী বেড়ে যায় যখন কিয়ামত, শেষ বিচার, হিসেব-নিকেশ, দোজখ ও বেহেশতের এমন বিস্তারিত নক্‌শা পেশ করা হয় যেমন কেউ সেখানকার স্বচক্ষে দেখা ঘটনাবলী বর্ণনা করছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, হা–মীম আস্ সাজদাহ, ৫২ আয়াত, ৬৯ টীকা এবং আল আহকাফ, ১০ আয়াত।)

২৪. সামনের দিকের আলোচনা স্বতই প্রকাশ করছে যে, এখানে উপাস্য বলতে মূর্তি নয় বরং ফেরেশতা, নবী, রসূল, শহীদ ও সৎলোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। বিভিন্ন জাতির মুশরিক সম্প্রদায় তাদেরকে উপাস্যে পরিণত করে রেখেছে। আপাতদৃষ্টিতে এক ব্যক্তি وما يعبدون শব্দাবলী পড়ে এর অর্থ মূর্তি বলে মনে করে। কেননা, আরবী ভাষায় সাধারণত ما শব্দটি নিষ্প্রাণ ও নির্বোধ জীবের জন্য এবং مَن শব্দটি বুদ্ধিমান জীবের জন্য বলা হয়ে থাকে। আমরা যেমন অনেক সময় কোন মানুষ সম্পর্কে তাচ্ছিল্যভরে বলি "সে কি" এবং এ থেকে এ অর্থ গ্রহণ করি যে, তার কোন সামান্যতমও মর্যাদা নেই, সে কোন বিরাট বড় ব্যক্তিত্ব নয়। ঠিক আরবী ভাষাতেও তেমনি বলা হয়ে থাকে। যেহেতু আল্লাহর মোকাবিলায় তাঁর সৃষ্টিকে উপাস্যে পরিণত করার ব্যাপার এখানে বক্তব্য আসছে, তাই ফেরেশতাদের ও বড় বড় মনীষীদের মর্যাদা যতই উচ্চতর হোক না কেন আল্লাহর

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًۢا بُوْرًا ⑱ فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ⑲

তারা বলবে, "পাক–পবিত্র আপনার সত্তা! আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করার ক্ষমতাও তো আমাদের ছিল না কিন্তু আপনি এদের এবং এদের বাপ–দাদাদের খুব বেশী জীবনোপকরণ দিয়েছেন, এমনকি এরা শিক্ষা ভুলে গিয়েছে এবং দুর্ভাগ্যপীড়িত হয়েছে।[২৬] এভাবে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে তারা (তোমাদের উপাস্যরা) তোমাদের কথাগুলোকে যা আজ তোমরা বলছো,[২৭] তারপর না তোমরা নিজেদের দুর্ভাগ্যকে ঠেকাতে পারবে, না পারবে কোথাও থেকে সাহায্য লাভ করতে এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে–ই জুলুম করবে[২৮] তাকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো।

মোকাবিলায় তা যেন কিছুই নয়। এজন্যই পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এখানে مَنْ এর পরিবর্তে مَا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২৫. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়বস্তুটি এসেছে। যেমন সূরা সাবার ৪০–৪১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ○ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ○

"যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করবেন, এরা কি তোমাদেরই বন্দেগী করতো? তারা বলবে ঃ পাক–পবিত্র আপনার সত্তা, আমাদের সম্পর্ক তো আপনার সাথে, এদের সাথে নয়। এরা তো জিনদের (অর্থাৎ শয়তান) ইবাদাত করতো। এদের অধিকাংশই তাদের প্রতিই ঈমান এনেছিল।"

অনুরূপভাবে সূরা মায়েদার শেষ রুকূ'তে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ؕ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿٢٠﴾

হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে যে রসূলই আমি পাঠিয়েছি তারা সবাই আহার করতো ও বাজারে চলাফেরা করতো।[২৯] *আসলে আমি তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্য পরীক্ষার মাধ্যমে পরিণত করেছি।*[৩০] *তোমরা কি সবর করবে?*[৩১] *তোমাদের রব সবকিছু দেখেন।*[৩২]

بِحَقٍّ .... مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ

"আর যখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, হে মারয়ামের ছেলে ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে উপাস্যে পরিণত করো? সে বলবে, পাক–পবিত্র আপনার সত্তা, যে কথা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য কবে শোভন ছিল?...............আমি তো এদেরকে এমন সব কথা বলেছিলাম যা বলার হুকুম আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বন্দেগী করো, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব।"

২৬. অর্থাৎ তারা ছিল সংকীর্ণমনা ও নীচ প্রকৃতির লোক। তিনি রিযিক দিয়েছিলেন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কিন্তু তারা সবকিছু খেয়েদেয়ে নিমকহারাম হয়ে গেছে এবং তাঁর প্রেরিত নবীগণ তাদেরকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তা ভুলে গেছে।

২৭. অর্থাৎ তোমাদের এ ধর্ম যাকে তোমরা সত্য মনে করে বসেছো তা একেবারেই ভিত্তিহীন প্রমাণিত হবে এবং তোমাদের যে উপাস্যদের ওপর তোমাদের বিপুল আস্থা, তোমরা মনে করো তারা হবে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী তারাই উল্টো তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তোমরা নিজেদের উপাস্যদের যাইকিছু গণ্য করেছো তা সব তোমাদের নিজেদেরই কার্যক্রম, তাদের কেউ তোমাদের একথা বলেনি যে, তাদের এভাবে মেনে চলতে হবে এবং তাদের জন্য এভাবে নযরানা দিতে হবে আর তাহলে তারা আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য সুপারিশ করার দায়িত্ব নিয়ে নেবে। কোন ফেরেশতা বা কোন মনীষীর পক্ষ থেকে এমনি ধরনের কোন উক্তি এখানে তোমাদের কাছে নেই। এ কথা তোমরা কিয়ামতের দিন প্রমাণও করতে পারবে না। বরং তারা সবাই তোমাদের চোখের সামনে এসব কথার প্রতিবাদ করবে এবং তোমরা নিজেদের কানে সেসব প্রতিবাদ শুনবে।

২৮. এখানে জুলুম বলতে সত্য ও ন্যায়ের ওপর জুলুম বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কুফরী ও শিরক। পূর্বাপর আলোচ্য বিষয় নিজেই একথা প্রকাশ করছে যে, নবীকে অস্বীকারকারী, আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের উপাসনাকারী এবং আখেরাত অস্বীকারকারীদের "জুলুম"কারী গণ্য করা হচ্ছে।

২৯. মক্কার কাফেরদের এ বক্তব্য যে, এ কেমন রসূল যে আহার করে এবং বাজারে চলাফেরা করে, এর জবাবে একথা বলা হয়েছে। এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে, মক্কার কাফেররা হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাইল (আ), হযরত মূসা (আ) এবং অন্যান্য বহু নবী সম্পর্কে কেবল যে জানতো তা নয় বরং তাদের রিসালাতও স্বীকার করতো। তাই বলা হয়েছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে এ অভিনব আপত্তি জানানো হচ্ছে কেন? ইতিপূর্বে এমন কোন্ নবী এসেছেন যিনি আহার করতেন না ও বাজারে চলাফেরা করতেন না? অন্যদের কথা দূরে থাক, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, যাকে খৃস্টানরা আল্লাহর পুত্রে পরিণত করেছে (এবং যার মূর্তি মক্কার কাফেররাও কাবাগৃহের মধ্যে স্থাপন করেছিল) তিনিও ইনজীলের বর্ণনা অনুযায়ী আহারও করতেন এবং বাজারে চলাফেরাও করতেন।

৩০. অর্থাৎ অস্বীকারকারীরা রসূল ও মু'মিনদের জন্য পরীক্ষা এবং রসূল ও মু'মিনরা অস্বীকারকারীদের জন্য। অস্বীকারকারীরা জুলুম, নিপীড়ন ও জাহেলী শত্রুতার যে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে রেখেছে সেটিই এমন একটি মাধ্যম যা থেকে প্রমাণ হবে রসূল ও তাঁর সাচ্চা ঈমানদার অনুসারীরা খাঁটি সোনা। যার মধ্যে ভেজাল থাকবে সে সেই আগুনের কুণ্ড নিরাপদে অতিক্রম করতে পারবে না। এভাবে নির্ভেজাল ঈমানদারদের একটি ছাঁটাই বাছাই করা গ্রুপ বের হয়ে আসবে। তাদের মোকাবিলায় এরপর দুনিয়ার আর কোন শক্তিই দাঁড়াতে পারবে না। এ আগুনের কুণ্ড জ্বলতে না থাকলে সবরকমের খাঁটি ও ভেজাল লোক নবীর চারদিকে জমা হতে থাকবে এবং দীনের সূচনাই হবে একটি অপরিপক্ক দল থেকে। অন্যদিকে অস্বীকারকারীদের জন্যও রসূল ও রসূলের সাহাবীগণ হবেন একটি পরীক্ষা। নিজেদেরই বংশ-গোত্রের মধ্য থেকে একজন সাধারণ লোককে হঠাৎ নবী বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া, তাঁর অধীনে কোন বিরাট সেনাদল ও ধন-সম্পদ না থাকা, আল্লাহর বাণী ও নির্মল চরিত্র ছাড়া তাঁর কাছে বিস্ময়কর কিছু না থাকা, বেশীরভাগ গরীব-মিসকীন, গোলাম ও নব্য কিশোর যুবাদের তাঁর প্রাথমিক অনুসারী দলের অন্তরভুক্ত হওয়া এবং আল্লাহর এ মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোককে যেন নেকড়ে ও হায়েনাদের মধ্যে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেয়া— এ সবই হচ্ছে এমন একটি ছাঁকনি যা অসৎ ও অনভিপ্রেত লোকদের দীনের দিকে আসতে বাধা দেয় এবং কেবলমাত্র এমন সব লোককে ছাঁটাই বাছাই করে সামনের দিকে নিয়ে চলে যারা সত্যকে জানে, চেনে ও মেনে চলে। এ ছাঁকনি যদি না বসানো হতো এবং রসূল বিরাট শান-শওকতের সাথে এসে সিংহাসনে বসে যেতেন, অর্থভাণ্ডারের মুখ তাঁর অনুসারীদের জন্য খুলে দেয়া হতো এবং সবার আগে বড় বড় সরদার ও সমাজপতির অগ্রসর হয়ে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করতো, তাহলে দুনিয়া পূজারী ও স্বার্থবাদী মানুষদের মধ্যে তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাঁর অনুগত ভক্তের দলে শামিল হতো না এমন নির্বোধ কোন লোক পাওয়া সম্ভব ছিল কি? এ অবস্থায় তো সত্যপ্রিয় লোকেরা সবার পেছনে থেকে যেতো এবং বৈষয়িক স্বার্থ পূজারীরা এগিয়ে যেতো।

৩ রুকূ'

যারা আমার সামনে হাজির হবার আশা করে না তারা বলে, " কেন আমাদের কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয় না?[৩৩] অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখি না কেন?[৩৪] বড়ই অহংকার করে তারা নিজেদের মনে মনে[৩৫] এবং সীমা অতিক্রম করে গেছে তারা অবাধ্যতায়। যেদিন তারা ফেরেশতাদের দেখবে সেটা অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদের দিন হবে না।[৩৬] চিৎকার করে উঠবে তারা, " হে আল্লাহ! বাঁচাও, বাঁচাও" এবং তাদের সমস্ত কৃতকর্ম নিয়ে আমি ধূলোর মতো উড়িয়ে দেবো।[৩৭]

৩১. অর্থাৎ এ কল্যাণকর উপযোগিতাটি উপলব্ধি করার পর এখন কি তোমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারছো? যে কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করছো তার জন্য পরীক্ষার এ অবস্থার অতীব প্রয়োজন বলে কি তোমরা মনে করছো? এ পরীক্ষার সময় যেসব অবধারিত আঘাত লাগবে সেগুলোর মুখোমুখি হতে কি এখন তোমরা প্রস্তুত?

৩২. এর দু'টি অর্থ এবং সম্ভবত এখানে দু'টিই প্রযোজ্য। এক, তোমাদের রব যা কিছু করছেন দেখে–শুনেই করছেন। তাঁর দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে কোন অন্যায়, বেইনসাফী ও গাফলতি নেই। দুই, যে ধরনের আন্তরিকতা ও সত্যনিষ্ঠা নিয়ে তোমরা এ কঠিন কাজটি করছো তাও তোমাদের রবের চোখের সামনে আছে এবং যে ধরনের জুলুম, নির্যাতন ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তোমাদের কল্যাণ প্রচেষ্টার মোকাবিলা করা হচ্ছে তাও তাঁর অগোচরে নেই। কাজেই তোমাদের নিজেদের কাজের মর্যাদালাভ থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে না এবং নিজেদের জুলুম ও বাড়াবাড়ির বিপদ থেকেও নিষ্কৃতি পাবে না, এ ব্যাপারে তোমরা পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকো।

৩৩. অর্থাৎ যদি সত্যিই আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে থাকে আমাদের কাছে তাঁর পয়গাম পৌছাবেন, তাহলে একজন নবীকে মাধ্যমে পরিণত করে তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো যথেষ্ট নয় বরং প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে একজন করে ফেরেশতা পাঠানো উচিত। ফেরেশতা এসে তাকে বলবে, তোমার রব তোমার কাছে এ পয়গাম পাঠাচ্ছেন। অথবা ফেরেশতাদের একটি প্রতিনিধিদল প্রকাশ্য জনসমাবেশে সবার সামনে এসে যাবে এবং সবাইকে আল্লাহর পয়গাম শুনিয়ে দেবে। সূরা আন'আমেও তাদের এ আপত্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে এভাবে ঃ

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا ﴿٢٥﴾ ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾

সেদিন যারা জান্নাতের অধিকারী হবে তারাই উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থান করবে এবং দুপুর কাটাবার জন্য চমৎকার জায়গা পাবে।[৩৮] আকাশ ফুঁড়ে একটি মেঘমালার সেদিন উদয় হবে এবং ফেরেশতাদের দলে দলে নামিয়ে দেয়া হবে। সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে শুধুমাত্র দয়াময়ের[৩৯] এবং সেটি হবে অস্বীকারকারীদের জন্য বড়ই কঠিন দিন।

وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ -

"যখন কোন আয়াত তাদের সামনে পেশ হতো, তারা বলতো আমরা কখ্খনো মেনে নেবো না যতক্ষণ না আমাদের সেসব কিছু দেয়া হবে যা আল্লাহর রসূলদের দেয়া হয়েছে। অথচ আল্লাহই ভালো জানেন কিভাবে তাঁর পয়গাম পৌঁছাবার ব্যবস্থা করবেন।" (১২৪ আয়াত)

৩৪. অর্থাৎ আল্লাহ নিজে আসবেন এবং বলবেন, হে আমার বান্দারা! তোমাদের কাছে এ হচ্ছে আমার অনুরোধ।

৩৫. অন্য অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "নিজেদের জ্ঞানে তারা নিজেদেরকে অনেক বড় কিছু মনে করে নিয়েছে।"

৩৬. এ একই বিষয়বস্তু সূরা আন'আমের ৮ আয়াতে এবং সূরা হিজ্‌রের ৭–৮ এবং ৫১–৬৪ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও সূরা বনী ইসরাঈলের ৯০ থেকে ৯৫ পর্যন্ত আয়াতেও কাফেরদের অনেকগুলো অদ্ভূত ও অভিনব দাবীর সাথে এগুলোর উল্লেখ করে তার জবাব দেয়া হয়েছে।

৩৭. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম ৩৫ ও ৩৬ টীকা।

৩৮. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে জান্নাতের হকদার লোকদের সাথে অপরাধীদের থেকে ভিন্নতর ব্যবহার করা হবে। তাদের সম্মানের সাথে বসানো হবে। হাশরের দিনের কঠিন দুপুর কাটাবার জন্য তাদের আরাম করার জায়গা দেয়া হবে। সেদিনের সবরকমের কষ্ট ও কঠোরতা হবে অপরাধীদের জন্য। সৎকর্মশীলদের জন্য নয়। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾

জালেমরা সেদিন নিজেদের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, "হায়! যদি আমি রসূলের সহযোগী হতাম। হায়! আমার দুর্ভাগ্য, হায়! যদি আমি অমুক লোককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম। তার প্ররোচনার কারণে আমার কাছে আসা উপদেশ আমি মানিনি। মানুষের জন্য শয়তান বড়ই বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়েছে।[৪০] আর রসূল বলবে, " হে আমার রব! আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা এ কুরআনকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষবস্তুতে পরিণত করেছিল।[৪১]

والذى نفسى بيده انه ليخفف على المؤمن حتى يكون اخف عليه من صلوة مكتوبة يصليها فى الدنيا

"সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আবদ্ধ, কিয়ামতের মহা ও ভয়াবহ দিবস একজন মু'মিনের জন্য অনেক সহজ করে দেয়া হবে। এমনকি তা এতই সহজ করে দেয়া হবে, যেমন একটি ফরয নামায পড়ার সময়টি হয়।" (মুসনাদে আহমদ, আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত)

৩৯. অর্থাৎ যে সমস্ত নকল রাজত্ব ও রাজ্যশাসন দুনিয়ায় মানুষকে প্রতারিত করে তা সবই খতম হয়ে যাবে। সেখানে কেবলমাত্র একটি রাজত্বই বাকি থাকবে এবং তা হবে এ বিশ্ব-জাহানের যথার্থ শাসনকর্তা আল্লাহর রাজত্ব। সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ هُم بَٰرِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَٰحِدِ الْقَهَّارِ –

"সেদিন যখন এরা সবাই প্রকাশ হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে এদের কোন জিনিস গোপন থাকবে না, জিজ্ঞেস করা হবে—আজ রাজত্ব কার? সবদিক থেকে জবাব আসবে, একমাত্র আল্লাহর যিনি সবার ওপর বিজয়ী।" (১৬ আয়াত)

হাদীসে এ বিষয়বস্তুকে আরো বেশী স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ এক হাতে পৃথিবী ও অন্য হাতে আকাশ নিয়ে বলবেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۚ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣١﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾

হে মুহাম্মাদ! আমি তো এভাবে অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রুতে পরিণত করেছি[৪২] এবং তোমার জন্য তোমার রবই পথ দেখানোর ও সাহায্য দানের জন্য যথেষ্ট।[৪৩]

অস্বীকারকারীরা বলে, "এ ব্যক্তির কাছে সমগ্র কুরআন একই সাথে নাযিল করা হলো না কেন?"[৪৪] —হ্যাঁ, এমন করা হয়েছে এজন্য, যাতে আমি একে ভালোভাবে তোমার মনে গেঁথে দিতে থাকি[৪৫] এবং (এ উদ্দেশ্যে) একে একটি বিশেষ ক্রমধারা অনুযায়ী আলাদা আলাদা অংশে সাজিয়ে দিয়েছি।

انا الملك ، انا الديان ، اين ملوك الارض ؟ اين الجبارون ؟ اين المتكبرون ؟

"আমিই বাদশাহ, আমিই শাসনকর্তা। এখন সেই পৃথিবীর বাদশাহরা কোথায়? কোথায় স্বৈরাচারী একনায়কের দল? অহংকারী ক্ষমতাদর্পীরা কোথায়? (মুসনাদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদে সামান্য শাব্দিক হেরফের সহকারে এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে।

৪০. এটিও কাফেরদের উক্তির একটি অংশ হতে পারে। আবার এও হতে পারে যে, তাদের উক্তির উপর এটি আল্লাহর নিজের উক্তি। দ্বিতীয় অবস্থায় এর যথার্থ উপযোগী অনুবাদ হবে, "আর ঠিক সময়ে মানুষকে প্রতারণা করার জন্য শয়তান তো আছেই।"

৪১. মূল শব্দ مهجورا –এর কয়েকটি অর্থ হয়। যদি একে هجر থেকে গঠিত ধরা হয় তাহলে অর্থ হবে পরিত্যক্ত। অর্থাৎ তারা কুরআনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে বলে মনেই করেনি, তাকে গ্রহণ করেনি এবং তার থেকে কোনভাবে প্রভাবিতও হয়নি। আর যদি একে هجر থেকে গঠিত ধরা হয় তাহলে এর দু'টি অর্থ হতে পারে : এক, তারা একে প্রলাপ ও অর্থহীন বাক্য মনে করেছে। দুই, তারা একে নিজেদের প্রলাপ ও অর্থহীন বাক্য প্রয়োগের লক্ষস্থলে পরিণত করেছে এবং একে নানান ধরনের বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে থেকেছে।

৪২. অর্থাৎ আজ তোমার সাথে যে শত্রুতা করা হচ্ছে এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। আগেও এমনটি হয়ে এসেছে। যখনই কোন নবী সত্য ও সততার দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তখনই অপরাধজীবী লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে আদাপানি খেয়ে লেগেছে। এ বিষয়বস্তুটি সূরা আন'আমের ১১২–১১৩ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

আর "আমি তাদের শত্রুতে পরিণত করে দিয়েছি।" মর্মে যে কথাটি বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, আমার প্রাকৃতিক আইন এ রকমই। কাজেই আমার এ ইচ্ছার ওপর সবর করো এবং প্রাকৃতিক আইনের আওতায় যেসব অবস্থার সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য ঠাণ্ডা মাথায় দৃঢ় সংকল্প সহকারে সেগুলোর মোকাবিলা করতে থাকো। একদিকে তুমি সত্যের দাওয়াত দেবার সাথে সাথেই দুনিয়ার বিরাট অংশ তা গ্রহণ করার জন্য দৌড়ে আসবে এবং সকল দুষ্কৃতকারী নিজের যাবতীয় দুষ্কৃতি ত্যাগ করে সত্যের দাওয়াতকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরবে এমনটি আশা করো না।

৪৩. পথ দেখানো অর্থ কেবলমাত্র সত্যজ্ঞান দান করাই নয় বরং ইসলামী আন্দোলনকে সাফল্যের সাথে চালানো এবং শত্রুদের কৌশল ব্যর্থ করার জন্য যথাসময়ে সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার পথও দেখিয়ে দেয়া বুঝায়। আর সাহায্য মানে হচ্ছে সব ধরনের সাহায্য। যতগুলো ময়দানে হক ও বাতিলের সংঘাত হয় তার প্রত্যেকটিতে হকের সমর্থনে সাহায্য পৌঁছানো আল্লাহর কাজ। যুক্তির লড়াই হলে তিনিই সত্যপন্থীদেরকে সঠিক ও পূর্ণশক্তিশালী যুক্তি সরবরাহ করেন। নৈতিকতার লড়াই হলে তিনিই সবদিক থেকে সত্যপন্থীদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। সংগঠন-শৃংখলার মোকাবিলা হলে তিনিই বাতিলপন্থীদের হৃদয় ছিন্নভিন্ন এবং হকপন্থীদের হৃদয় সংযুক্ত করেন। মানবিক শক্তির মোকাবিলা হলে তিনিই প্রতিটি পর্যায়ে যোগ্য ও উপযোগী ব্যক্তিবর্গ ও গ্রুপসমূহ সরবরাহ করে হকপন্থীদের দলের শক্তি বৃদ্ধি করেন। বস্তুগত উপকরণের প্রয়োজন হলে তিনিই সত্যপন্থীদের সামান্য ধন ও উপায়-উপকরণে এমন বরকত দান করেন যার ফলে বাতিলপন্থীদের উপকরণের প্রাচুর্য তার মোকাবিলায় নিছক একটি প্রতারণাই প্রমাণিত হয়। মোটকথা সাহায্য দেয়া ও পথ দেখানোর এমন কোন দিক নেই যেখানে সত্যপন্থীদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট নন এবং তাদের অন্য কারো সাহায্য-সহায়তা নেবার প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, আল্লাহর তাদের জন্য যথেষ্ট হওয়ার ওপর তাদের বিশ্বাস ও আস্থা থাকতে হবে এবং তারা কোন প্রকার প্রচেষ্টা না চালিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকতে পারবে না। বরং তৎপরতা সহকারে বাতিলের মোকাবিলায় হকের মাথা উঁচু রাখার জন্য লড়ে যেতে হবে।

একথা মনে রাখতে হবে, আয়াতের এ দ্বিতীয় অংশটি না হলে প্রথম অংশ হতো বড়ই হতাশাব্যঞ্জক। এক ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে, আমি জেনে বুঝে তোমাকে এমন একটি কাজের দায়িত্ব দিয়েছি যা শুরু করার সাথে সাথেই দুনিয়ার যত কুকুর ও নেকড়ে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—এর চেয়ে বড় উৎসাহ ভংগকারী জিনিস তার জন্য আর কী হতে পারে! কিন্তু এ ঘোষণার সমস্ত ভীতি এ সান্ত্বনাবাণী শুনে দূর হয়ে যায় যে, এ প্রাণান্তকর সংঘাতের ময়দানে নামিয়ে দিয়ে তোমাকে আমি একাকী ছেড়ে দেইনি বরং তোমার সাহায্যার্থে আমি নিজেই রয়েছি। অন্তরে ঈমান থাকলে এর চেয়ে বেশী সাহস সঞ্চারী কথা আর কি হতে পারে যে, সারা বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহ নিজেই আমাদের সাহায্যদান ও পথ দেখাবার দায়িত্ব নিচ্ছেন। এরপর তো শুধুমাত্র একজন হতোদ্যম কাপুরুষই ময়দানে এগিয়ে যেতে ইতস্তত করতে পারে।

৪৪. এই আপত্তিটাই ছিল মক্কার কাফেরদের খুবই প্রিয় ও যুৎসই। তাদের মতে এ আপত্তিটি ছিল খুবই শক্তিশালী। এজন্যে বারবার তারা এর পুনরাবৃত্তি করতো। কুরআনেও

বিভিন্ন স্থানে এটি উদ্ধৃত করে এর জবাব দেয়া হয়েছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নমল ১০১–১০৬ ও বনী ইসরাঈল ১১৯ টীকা) তাদের প্রশ্নের অর্থ ছিল, যদি এ ব্যক্তি নিজে চিন্তা–ভাবনা করে অথবা কারো কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে এবং বিভিন্ন কিতাব থেকে নকল করে এসব বিষয়বস্তু না এনে থাকে বরং যদি সত্যিসত্যিই এটি আল্লাহর কিতাব হয়, তাহলে সমগ্র কিতাবটি একই সময় একই সংগে নাযিল হচ্ছে না কেন? আল্লাহ যা বলতে চান তা তো তিনি ভালো করেই জানেন। যদি তিনি এগুলোর নাযিলকারী হতেন তাহলে সব কথা এক সাথেই বলে দিতেন। এই যে চিন্তা–ভাবনা করে বিভিন্ন সময় কিছু কিছু বিষয় আনা হচ্ছে এগুলো একথার সুস্পষ্ট আলামত যে, অহী উপর থেকে নয় বরং এখানেই কোথাও থেকে আহরণ করা হচ্ছে অথবা নিজেই তৈরী করে সরবরাহ করার কাজ চলছে।

৪৫. অন্য অনুবাদ এও হতে পারে ঃ "এর মাধ্যমে আমি তোমার অন্তরকে শক্তিশালী করি" অথবা "তোমার বুকে হিম্মত সঞ্চার করি।" শব্দগুলোর মধ্যে উভয় অর্থই রয়েছে এবং উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এভাবে একই বাক্যে কুরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল করার বহুতর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

এক ঃ স্মৃতির ভাণ্ডারে একে হুবহু ও অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। লেখার আকারে নয় বরং একজন নিরক্ষর নবীর মাধ্যমে নিরক্ষর মানব গোষ্ঠীর মধ্যে মৌখিক ভাষণের আকারে এর প্রচার ও প্রসার হচ্ছে।

দুই ঃ এর শিক্ষাগুলো ভালোভাবে হৃদয়ংগম করা যেতে পারে। এজন্য থেমে থেমে সামান্য সামান্য কথা বলা এবং একই কথা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করাই বেশী উপযোগী হয়।

তিন ঃ এ কিতাব যে জীবন পদ্ধতির কথা বলেছে তার ওপর মন স্থির হয়ে যেতে থাকে। এজন্য নির্দেশ ও বিধানসমূহ পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়াটাই বেশী যুক্তিসংগত। অন্যথায় যদি সমস্ত আইন–কানুন এবং সমগ্র জীবন ব্যবস্থা একই সংগে বর্ণনা করে তা প্রতিষ্ঠিত করার হুকুম দেয়া হতো তা হলে চেতনা বিশৃংখল হয়ে যেতো। তাছাড়া এটাও বাস্তব সত্য যে, প্রত্যেকটি হুকুম যদি যথাযথ ও উপযুক্ত সময়ে দেয়া হয় তাহলে তার জ্ঞানবত্তা ও প্রাণসত্তা বেশী ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়। অন্যদিকে সমস্ত বিধান, ধারা ও উপধারা অনুসারে সাজিয়ে একই সংগে দিয়ে দিলে এ ফল পাওয়া যেতে পারে না।

চার ঃ ইসলামী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে যখন হক ও বাতিলের লাগাতার সংঘাত চলে সে সময় নবী ও তাঁর অনুসারীদের মনে সাহস সঞ্চার করে যেতে হবে। এ জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একবার একটি লম্বা–চওড়া নির্দেশনামা পাঠিয়ে দিয়ে সারা জীবন সমগ্র দুনিয়ার যাবতীয় বাধাবিপত্তির মোকাবিলা করার জন্য তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেবার তুলনায় বার বার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের কাছে পয়গাম আসা বেশী কার্যকর হয়ে থাকে। প্রথম অবস্থায় মানুষ মনে করে সে প্রবল বাত্যা বিক্ষুব্ধ তরংগের মুখে পড়ে গেছে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষ অনুভব করে, যে আল্লাহ তাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছেন তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। তার কাজে আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তার অবস্থা দেখছেন, তার সমস্যা ও সংকটে তাকে পথ দেখাচ্ছেন এবং প্রত্যেকটি

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَٰكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

আর (এর মধ্যে এ কল্যাণকর উদ্দেশ্যও রয়েছে যে) যখনই তারা তোমার সামনে কোন অভিনব কথা (অথবা অদ্ভুত ধরনের প্রশ্ন) নিয়ে এসেছে তার সঠিক জবাব যথাসময়ে আমি তোমাকে দিয়েছি এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছি।[৪৬]*—যাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়া হবে তাদের অবস্থান বড়ই খারাপ এবং তাদের পথ সীমাহীন ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।*[৪৭]

প্রয়োজনের সময় তাকে তাঁর সামনে হাজির হবার ও সম্বোধন করার সৌভাগ্য দান করে তার সাথে নিজের সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করতে থেকেছেন। এ জিনিসটি তার উৎসাহ বৃদ্ধি এবং সংকল্প সুদৃঢ় করে।

৪৬. এটি হচ্ছে পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিল করার পদ্ধতি অবলম্বনের আর একটি কারণ। কুরআন মজীদ নাযিল করার কারণ এ নয় যে, আল্লাহ "বিধানাবলী" সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করতে চান এবং এর প্রচারের জন্য নবীকে তাঁর এজেন্ট নিয়োগ করেছেন। আসল ব্যাপার যদি এটাই হতো, তাহলে পুরো বইটি লেখা শেষ করে একই সময় এজেন্টের হাতে সম্পূর্ণ বইটি তুলে দেয়ার দাবী যথার্থ হতো। কিন্তু আসলে এর নাযিলের কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ কুফরী, জাহিলীয়াত ও ফাসেকীর মোকাবিলায় ঈমান, ইসলাম, আনুগত্য ও আল্লাহভীতির একটি আন্দোলন পরিচালনা করতে চান এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি একজন নবীকে আহবায়ক ও নেতা হিসেবে সামনে এনেছেন। এ আন্দোলন চলাকালে একদিকে যদি তিনি আহবায়ক ও তার অনুসারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা ও নির্দেশনা দেয়া নিজের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত করে নিয়ে থাকেন তাহলে অন্যদিকে এটাও নিজ দায়িত্বের অন্তরভুক্ত করে নিয়েছেন যে, বিরোধীরা যখনই কোন আপত্তি বা সন্দেহ অথবা জটিলতা পেশ করবে তখনই তিনি তা পরিষ্কার করে দেবেন এবং যখনই তারা কোন কথার ভুল অর্থ করবে তখনই তিনি তার সঠিক ব্যাখ্যা করে দেবেন। এরূপ রকমারি প্রয়োজনের জন্য যেসব ভাষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হচ্ছে সেগুলোর সমষ্টির নাম কুরআন। এটি কোন আইন, নৈতিকতা বা দর্শনের কিতাব নয় বরং একটি আন্দোলনের কিতাব। আর এর প্রতিষ্ঠার সঠিক প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, আন্দোলনের সূচনা পর্ব থেকে তা শুরু হবে এবং শেষ পর্ব পর্যন্ত যেভাবে আন্দোলন চলতে থাকবে এও সাথে সাথে সুযোগ ও প্রয়োজন অনুযায়ী নাযিল হতে থাকবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, ৯–২০ পৃষ্ঠা)

৪৭. অর্থাৎ যারা সোজা কথাকে উলটোভাবে চিন্তা করে এবং উলটো ফলাফল বের করে তাদের বুদ্ধি উলটোমুখো হয়েছে। এ কারণেই তারা কুরআনের সত্যতা প্রমাণ পেশকারী প্রকৃত সত্যগুলোকে তাদের মিথ্যা হবার প্রমাণ গণ্য করছে। আর এজন্যই তাদেরকে নিম্নমুখী করে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝٣٥ فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۝٣٦ وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝٣٧

৪ রুকূ'

আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম[৪৮] এবং তার সাথে তার ভাই হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে লাগিয়েছিলাম আর তাদের বলেছিলাম, যাও সেই সম্প্রদায়ের কাছে যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছে।[৪৯] শেষ পর্যন্ত তাদের আমি ধ্বংস করে দিলাম। একই অবস্থা হলো নূহের সম্প্রদায়েরও যখন তারা রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো,[৫০] আমি তাদের ডুবিয়ে দিলাম এবং সারা দুনিয়ার লোকদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত করলাম, আর এ জালেমদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ঠিক করে রেখেছি।[৫১]

৪৮. এখানে কিতাব বলে সম্ভবত তাওরাত নামে পরিচিত গ্রন্থটিকে বুঝানো হচ্ছে না, যা মিসর থেকে বনী ইসরাঈলদের নিয়ে বের হবার সময় হযরত মূসাকে দেয়া হয়েছিল। বরং এখানে এমন সব নির্দেশের কথা বলা হচ্ছে, যেগুলো নবুওয়াতের দায়িত্বে নিয়োজিত হবার সময় থেকে নিয়ে মিসর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত হযরত মূসাকে দেয়া হয়েছিল। এর অন্তরভুক্ত রয়েছে ফেরাউনের দরবারে হযরত মূসা যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি এবং ফেরাউনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার সময় যে সব নির্দেশ তাঁকে দেয়া হয়েছিল সেগুলোও। কুরআন মজীদের বিভিন্নস্থানে এগুলোর উল্লেখ আছে। কিন্তু যতদূর মনে হয় তাওরাতে এগুলো অন্তরভুক্ত করা হয়নি। দশটি বিধানের মাধ্যমে তাওরাতের সূচনা হয়েছে। বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করার সময় সিনাই এলাকার তূর পাহাড়ে প্রস্তর ফলকে লিখিত আকারে তাঁকে এগুলো দেয়া হয়েছিল।

৪৯. অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব (আ) ও হযরত ইউসুফের (আ) মাধ্যমে যেসব আয়াত তাদের কাছে পৌঁছেছিল এবং পরবর্তীকালে বনী ইসরাঈলের সৎকর্মশীলরা তাদের কাছে যেগুলো প্রচার করেছিলেন।

৫০. যেহেতু মানুষ কখনো নবী হতে পারে একথা মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছিল, তাই তাদের এ মিথ্যাচার কেবলমাত্র হযরত নূহের বিরুদ্ধেই ছিল না বরং মূলত নবুওয়াতের পদকেই তারা অস্বীকার করেছিল।

৫১. অর্থাৎ আখেরাতের শাস্তি।

وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَأَصْحَٰبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًۢا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَٰلَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ أَتَوْا۟ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِىٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا۟ يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

এভাবে আদ ও সামূদ এবং আসহাবুর রস্[৫২] *ও মাঝখানের শতাব্দীগুলোর বহু লোককে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে আমি (পূর্বে ধ্বংস প্রাপ্তদের) দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককে ধ্বংস করে দিয়েছি। আর সেই জনপদের ওপর দিয়ে তো তারা যাতায়াত করেছে যার ওপর নিকৃষ্টতম বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল।*[৫৩] *তারা কি তার অবস্থা দেখে থাকেনি? কিন্তু তারা মৃত্যুর পরের জীবনের আশাই করে না।*[৫৪]

তারা যখন তোমাকে দেখে, তোমাকে বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করে। (বলে), "এ লোককে আল্লাহ রসূল করে পাঠিয়েছেন? এতো আমাদের পথভ্রষ্ট করে নিজেদের দেবতাদের থেকেই সরিয়ে দিতো যদি না আমরা তাদের প্রতি অটল বিশ্বাসী হয়ে থাকতাম।[৫৫] *বেশ, সে সময় দূরে নয় যখন শাস্তি দেখে তারা নিজেরাই জানবে ভ্রষ্টতায় কে দূরে চলে গিয়েছিল।*

৫২. আসহাবুর রস্ কারা ছিল, এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি। তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাদের কোন বর্ণনাই সন্তোষজনক নয়। বড় জোর এতটুকু বলা যেতে পারে, তারা এমন এক সম্প্রদায় ছিল যারা তাদের নবীকে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিয়ে বা ঝুলিয়ে রেখে হত্যা করেছিল। আরবী ভাষায় "রাস্‌স" বলা হয় পুরাতন বা অন্ধ কূপকে।

৫৩. অর্থাৎ লূত জাতির জনপদ। নিকৃষ্টতম বৃষ্টি মানে পাথর বৃষ্টি। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় একথা বলা হয়েছে। হিজায বাসীদের বাণিজ্য কাফেলা ফিলিস্তিন ও সিরিয়া যাবার পথে এ এলাকা অতিক্রম করতো। সেখানে তারা কেবল ধ্বংসাবশেষ দেখতো না বরং আশপাশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখে লূত জাতির শিক্ষণীয় ধ্বংস কাহিনীও শুনতো।

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

কখনো কি তুমি সেই ব্যক্তির অবস্থা ভেবে দেখেছো, যে তার নিজের প্রবৃত্তির কামনাকে প্রভু রূপে গ্রহণ করেছে?[৫৬] তুমি কি এহেন ব্যক্তিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিতে পারো? তুমি কি মনে করো তাদের অধিকাংশ লোক শোনে ও বোঝে? তারা পশুর মতো বরং তারও অধম।[৫৭]

৫৪. অর্থাৎ যেহেতু তারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাই নিছক একজন দর্শক হিসেবে এ ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করেছে। এ থেকে কোন শিক্ষা নেয়নি। এ থেকে জানা যায়, পরকাল বিশ্বাসী ও পরকাল অবিশ্বাসীর দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে কত বড় ফারাক। একজন নিছক ঘটনা বা কীর্তিকলাপ দেখে অথবা বড়জোর ইতিহাস রচনা করে। কিন্তু অন্যজন ঐসব জিনিস থেকেই নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং জীবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন প্রকৃত সত্যের নাগাল পায়।

৫৫. কাফেরদের এ দু'টি কথা পরস্পর বিরোধী। প্রথম কথাটি থেকে জানা যায়, তারা নবীকে (সা) তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে এবং তাঁকে বিদ্রূপ করে তাঁর মর্যাদা হ্রাস করতে চাচ্ছে। তারা যেন বলতে চাচ্ছে, নবী (সা) তাঁর মর্যাদার চাইতে অনেক বেশী বড় দাবী করেছেন। দ্বিতীয় কথা জানা যায়, তারা তাঁর যুক্তির শক্তি ও ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা মেনে নিচ্ছে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে স্বীকার করে নিচ্ছে যে, তারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের আরাধ্য দেবতাদের বন্দনায় অবিচল না থাকলে এ ব্যক্তি তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিতেন। ইসলামী আন্দোলন তাদেরকে কি পরিমাণ আতংকিত করে তুলেছিল এই পরস্পর বিরোধী কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বেহায়ার মতো যখন তামাসা–বিদ্রূপ করতো তখন হীনমন্যতা বোধের পীড়নে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে এমন সব কথা বের হয়ে যেতো যা থেকে এ শক্তিটি তাদের মনে কি পরিমাণ আতংক সৃষ্টি করেছে তা স্পষ্ট বুঝা যেতো।

৫৬. প্রবৃত্তির কামনাকে খোদায় পরিণত করার মানে হচ্ছে, তার পূজা করা। আসলে এটাও ঠিক মূর্তি পূজা করা বা কোন সৃষ্টিকে উপাস্যে পরিণত করার মতই শিরক। হযরত আবু উমামাহ রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ما تحت ظل السماء من اله يعبد من دون الله تعالى اعظم عند الله عزوجل من هوى يتبع –

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

৫ রুকূ'

তুমি কি দেখ না কিভাবে তোমার রব ছায়া বিস্তার করেন? তিনি চাইলে একে চিরন্তন ছায়ায় পরিণত করতেন। আমি সূর্যকে করেছি তার পথ–নির্দেশক।[৫৮] তারপর (যতই সূর্য উঠতে থাকে) আমি এ ছায়াকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে গুটিয়ে নিতে থাকি।[৫৯]

"এ আকাশের নিচে যতগুলো উপাস্যেরই উপাসনা করা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপাস্য হচ্ছে এমন প্রবৃত্তির কামনা যার অনুসরণ করা হয়।" (তাবারানী) [আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আল কাহাফ ৫০ টীকা।]

যে ব্যক্তি নিজের কামনাকে বুদ্ধির অধীনে রাখে এবং বুদ্ধি ব্যবহার করে নিজের জন্য ন্যায় ও অন্যায়ের পথের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, সে যদি কোন ধরনের শিরকী বা কুফরী কর্মে লিপ্ত হয়েও পড়ে তাহলে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সঠিক পথে আনা যেতে পারে এবং সে সঠিক পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর তার ওপর অবিচল থাকবে এ আস্থাও পোষণ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রবৃত্তির দাস হচ্ছে একটি লাগামহীন উট। তার কামনা তাকে যেদিকে নিয়ে যাবে সে পথহারা হয়ে সেদিকেই দৌড়াতে থাকবে। তার মনে ন্যায় ও অন্যায় এবং হক ও বাতিলের মধ্যে ফারাক করার এবং একটিকে ত্যাগ করে অন্যটিকে গ্রহণ করার কোন চিন্তা আদৌ সক্রিয় থাকে না। তাহলে কে তাকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনতে পারে? আর ধরে নেয়া যাক, যদি সে মেনেও নেয় তাহলে তাকে কোন নৈতিক বিধানের অধীন করে দেয়া কোন মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়।

৫৭. অর্থাৎ গরু–ছাগলের দল যেমন জানে না তাদের যারা হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা তাদের চারণক্ষেত্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, না কসাইখানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তারা কেবল চোখ বন্ধ করে যারা হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের ইশারায় চলতেই থাকে, ঠিক তেমনি এ জনসাধারণও তাদের নিজেদের শয়তানী প্রবৃত্তি ও পথ ভ্রষ্টকারী নেতাদের ইশারায় চোখ বন্ধ করে চলতেই থাকছে। তারা জানে না তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কল্যাণের দিকে, না ধ্বংসের দিকে। এ পর্যন্ত তাদের অবস্থা গরু–ছাগলের সাথে তুলনীয়। কিন্তু গরু–ছাগলকে আল্লাহ বুদ্ধিজ্ঞান ও চেতনা শক্তি দান করেননি। তারা যদি চারণক্ষেত্র ও কসাইখানার মধ্যে কোন পার্থক্য না করে থাকে তাহলে এতে অবাক হবার কিছু নেই। তবে অবাক হতে হয় যখন দেখা যায় একদল মানুষ যাদের আল্লাহ বুদ্ধি–জ্ঞান ও চেতনা শক্তি দান করেছেন এবং তারপরও তারা গরু–ছাগলের মতো অসচেতনতা ও গাফলতির মধ্যে ডুবে রয়েছে।

কেউ যেন প্রচার–প্রচারণাকে অর্থহীন গণ্য করা এ ভাষণের উদ্দেশ্য বলে মনে না করেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে এ কথাগুলো এজন্য

বলা হচ্ছে না যে তিনি যেন লোকদেরকে অনর্থক বুঝাবার চেষ্টা ত্যাগ করেন। আসলে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যেই এ বক্তব্য রাখা হয়েছে, যদিও বাহ্যত সম্বোধন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আসলে তাদের এ কথা শুনানো উদ্দেশ্য যে, ওহে গাফেলরা! তোমাদের এ অবস্থা কেন? আল্লাহ কি তোমাদের বুদ্ধি–বিবেক এজন্য দিয়েছেন যে, তোমরা দুনিয়ায় পশুদের মতো জীবন যাপন করবে?

৫৮. মূলে "দলীল" (دليل) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক এমন একটি অর্থে যে অর্থে ইংরেজী ভাষায় Pilot শব্দটির ব্যবহার হয়। মাঝি–মাল্লাদের পরিভাষায় "দলীল" এমন এক ব্যক্তিকে বলা হয় যে নৌকাকে পথ–নির্দেশনা দিয়ে চালাতে থাকে। ছায়ার ওপর সূর্যকে দলীল করার অর্থ হচ্ছে এই যে, ছায়ার ছড়িয়ে পড়া ও সংকুচিত হওয়া সূর্যের উপরে ওঠা ও নেমে যাওয়া এবং তার উদয় হওয়া ও অস্তে যাওয়ার ওপর নির্ভরশীল এবং তার আলামত।

ছায়া অর্থ আলোক ও অন্ধকারের মাঝামাঝি এমন অবস্থা যা সকাল বেলা সূর্য ওঠার আগে হয় এবং সারাদিন ঘরের মধ্যে, দেয়ালের পেছনে ও গাছের নিচে থাকে।

৫৯. নিজের দিকে গুটিয়ে নেয়া মানে হচ্ছে, অদৃশ্য ও বিলীন করে দেয়া। কারণ যে কোন জিনিস ধ্বংস হয় তা আল্লাহরই দিকে ফিরে যায়। প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর দিক থেকেই আসে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়।

এ আয়াতের দু'টি দিক। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক। বাহ্যিক দিক থেকে আয়াতটি মুশরিকদের বলছে, যাদি তোমরা পৃথিবীতে পশুর মতো জীবন ধারণ না করতে এবং কিছুটা বুদ্ধি–বিবেচনা ও সচেতনতার সাথে এগিয়ে চলতে, তাহলে প্রতিনিয়ত তোমরা এই যে ছায়া দেখতে পাচ্ছো এটিই তোমাদের এ শিক্ষা দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, নবী তোমাদের যে তাওহীদের শিক্ষা দিচ্ছেন তা যথার্থই সত্য ও সঠিক। তোমাদের সারা জীবন এ ছায়ার জোয়ার–ভাটার সাথে বিজড়িত। যদি চিরন্তন ছায়া হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে কোন প্রাণী এমন কি উদ্ভিদও জীবিত থাকতে পারে না। কারণ সূর্যের আলো ও উত্তাপের ওপর তাদের সবার জীবন নির্ভর করে। ছায়া যদি একেবারেই না থাকে তাহলেও জীবন অসাধ্য। কারণ সর্বক্ষণ সূর্যের মুখোমুখি থাকার এবং তার রশ্মি থেকে কোন আড়াল না পাওয়ার ফলে কোন প্রাণী এবং কোন উদ্ভিদও বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। বরং পানিও উধাও হয়ে যাবে। রোদ ও ছায়ার মধ্যে যদি হঠাৎ করে পরিবর্তন হতে থাকে তাহলে পৃথিবীর সৃষ্টিকূল পরিবেশের এসব আকস্মিক পরিবর্তন বেশীক্ষণ বরদাশ্ত করতে পারবে না। কিন্তু একজন মহাজ্ঞানী স্রষ্টা ও সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে এমন একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন যার ফলে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ধীরে ধীরে ছায়া পড়ে ও হ্রাস–বৃদ্ধি হয় এবং রোদ ক্রমান্বয়ে বের হয়ে আসে এবং বাড়তে ও কমতে থাকে। এ ধরনের বিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা কোন অন্ধ প্রকৃতির হাতে আপনাআপনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অথবা বহুসংখ্যক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভুও একে প্রতিষ্ঠিত করে এভাবে একটি ধারাবাহিক নিয়ম–শৃংখলা সহকারে চালিয়ে আসতে পারে না।

কিন্তু এসব বাহ্যিক শব্দের অভ্যন্তর থেকে আর একটি সূক্ষ্ম ইংগিতও পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে, বর্তমানে এই যে কুফরী ও শির্কের অজ্ঞতার ছায়া চতুরদিকে ছেয়ে আছে

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْيِىَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰىٓ اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾

আর তিনিই রাতকে তোমাদের জন্য পোশাক,[৬০] ঘুমকে মৃত্যুর শান্তি এবং দিনকে জীবন্ত হয়ে ওঠার সময়ে পরিণত করেছেন।[৬১]

আর তিনিই নিজের রহমতের আগেভাগে বাতাসকে সুসংবাদদাতারূপে পাঠান। তারপর আকাশ থেকে বর্ষণ করেন বিশুদ্ধ পানি[৬২] একটি মৃত এলাকাকে তার মাধ্যমে জীবন দান করার এবং নিজের সৃষ্টির মধ্য থেকে বহুতর পশু ও মানুষকে তা পান করাবার জন্য।[৬৩] এ বিস্ময়কর কার্যকলাপ আমি বার বার তাদের সামনে আনি[৬৪] যাতে তারা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে কিন্তু অধিকাংশ লোক কুফরী ও অকৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কোন মনোভাব পোষণ করতে অস্বীকার করে।[৬৫]

এটা কোন স্থায়ী জিনিস নয়। কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকারে হেদায়াতের সূর্য উদিত হয়েছে। বাহ্যত ছায়া বিস্তার লাভ করেছে দূর দূরান্তে। কিন্তু এ সূর্য যতই উপরে উঠতে থাকবে ততই ছায়া সংকুচিত হতে থাকবে। তবে একটু সবরের প্রয়োজন। আল্লাহর আইন কখনো আকস্মিক পরিবর্তন আনে না। বস্তুজগতে যেমন সূর্য ধীরে ধীরে ওপরে ওঠে এবং ছায়া ধীরে ধীরে সংকুচিত হয় ঠিক তেমনি চিন্তা ও নৈতিকতার জগতেও হেদায়াতের সূর্যের উত্থান ও ভ্রষ্টতার ছায়ার পতন ধীরে ধীরেই হবে।

৬০. অর্থাৎ ঢাকবার ও লুকাবার জিনিস।

৬১. এ আয়াতের তিনটি দিক রয়েছে। একদিক থেকে এখানে তাওহীদের যুক্তি পেশ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় দিক থেকে নিত্যদিনকার মানবিক অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাবনার যুক্তি পেশ করা হচ্ছে। তৃতীয় দিক থেকে সূক্ষ্মভাবে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, জাহেলীয়াতের রাত শেষ হয়ে গেছে, এখন জ্ঞান, চেতনা ও হেদায়াতের উজ্জ্বল দিবালোকের স্ফূরণ ঘটেছে এবং শিগগির বা দেরীতে যেমনি করেই হোক নিদ্রিতরা জেগে উঠবেই। তবে যাদের জন্য রাতের ঘুম ছিল মৃত্যু ঘুম তারা আর জাগবে না এবং তাদের না জেগে ওঠা হবে তাদের নিজেদের জন্যই জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া, দিনের কাজ কারবার তাদের কারণে বন্ধ হয়ে যাবে না।

৬২. অর্থাৎ এমন পানি যা সব ধরনের পংকিলতা থেকেও মুক্ত হয় আবার কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থ ও জীবানুও তার মধ্যে থাকে না। যার সাহায্যে নাপাকি ধুয়ে সাফ করা যায় এবং মানুষ, পশু, পাখি, উদ্ভিদ সবাই জীবনী শক্তি লাভ করে।

৬৩. উপরের আয়াতটির মতো এ আয়াতটিরও তিনটি দিক রয়েছে। এর মধ্যে তাওহীদের যুক্তি রয়েছে, পরকালের যুক্তিও রয়েছে এবং এ সংগে এ সূক্ষ বিষয়বস্তুটিও এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, জাহেলীয়াতের যুগ ছিল মূলত খরা ও দুর্ভিক্ষের যুগ। সে যুগে মানবিকতার ভূমি অনুর্বর ও অনাবাদী থেকে গিয়েছিল। এখন আল্লাহ অনুগ্রহ করে নবুওয়াতের রহমতের মেঘমালা পাঠিয়েছেন। তা থেকে অহী জ্ঞানের নির্ভেজাল জীবনবারি বর্ষিত হচ্ছে। সবাই না হলেও আল্লাহর বহু বান্দা তার স্বচ্ছ ধারায় অবগাহন করতে পারবেই।

৬৪. মূল শব্দগুলো হচ্ছে وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ –এর তিনটি অর্থ হতে পারে। এক, বারিধারা বর্ষণের এ বিষয়বস্তুটি আমি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বারবার বর্ণনা করে প্রকৃত সত্য বুঝাবার চেষ্টা করেছি। দুই, আমি বারবার গ্রীষ্ম ও খরা, মওসূমী বায়ু, মেঘ, বৃষ্টি এবং তা থেকে সৃষ্ট বিচিত্র জীবন–উপকরণসমূহ তাদের দেখাতে থেকেছি। তিন, আমি বৃষ্টিকে আবর্তিত করতে থাকি। অর্থাৎ সব সময় সব জায়গায় সমান বৃষ্টিপাত হয় না। বরং কখনো কোথাও চলে একদম খরা, কোথাও কম বৃষ্টিপাত হয়, কোথাও চাহিদা অনুযায়ী বৃষ্টিপাত হয়, কোথাও ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার আবির্ভাব হয় এবং এসব অবস্থায় বিভিন্ন বিচিত্র ফলাফল সামনে আসতে থাকে।

৬৫. যদি প্রথম দিক থেকে (অর্থাৎ তাওহীদের যুক্তির দৃষ্টিতে) দেখা যায়, তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়ঃ লোকেরা যদি চোখ মেলে তাকায় তাহলে নিছক বৃষ্টির ব্যবস্থাপনারই মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর একক রব্বুল আলামীন হবার প্রমাণ স্বরূপ এত বিপুল সংখ্যক নিদর্শন দেখতে পাবে যে, একমাত্র সেটিই নবীর তাওহীদের শিক্ষা সত্য হবার পক্ষে তাদের নিশ্চিন্ত করতে পারে। কিন্তু আমি বারবার এ বিষয়বস্তুর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এবং দুনিয়ায় পানি বন্টনের এ কার্যকলাপ নিত্যনতুনভাবে একের পর এক তাদের সামনে আসতে থাকলেও এ জালেমরা কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না। তারা সত্য ও ন্যায়নীতিকে মেনে নেয় না। তাদের আমি বুদ্ধি ও চিন্তার যে নিয়ামত দান করেছি তার জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে না। এমন কি তারা নিজেরা যা কিছু বুঝতো না তা তাদের বুঝাবার জন্য কুরআনে বার বার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে–এ অনুগ্রহের জন্য শোকর গুজারীও করে না।

দ্বিতীয় দিক থেকে (অর্থাৎ আখেরাতের যুক্তির দৃষ্টিতে) দেখলে এর অর্থ দাঁড়ায় ঃ প্রতি বছর তাদের সামনে গ্রীষ্ম ও খরায় অসংখ্য সৃষ্টির মৃত্যুমুখে পতিত হবার এবং তারপর বর্ষার বদৌলতে মৃত উদ্ভিদ ও কীটপতংগের জীবিত হয়ে ওঠার নাটক অভিনীতি হতে থাকে। কিন্তু সবকিছু দেখেও এ নির্বোধের দল মৃত্যুপরের জীবনকে অসম্ভব বলে চলছে। বারবার সত্যের এ দ্ব্যর্থহীন নিদর্শনের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় কিন্তু কুফরী ও অস্বীকৃতির অচলায়তন কোনক্রমেই টলে না। তাদের বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তির যে অতুলনীয় নিয়ামত দান করা হয়েছে তার অস্বীকৃতির ধারা কোনক্রমে খতমই হয় না। শিক্ষা ও উপদেশ দানের যে অনুগ্রহ তাদের প্রতি করা হয়েছে তার প্রতি অকৃতজ্ঞ মনোভাব তাদের চিরকাল অব্যাহত রয়েছে।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

যদি আমি চাইতাম তাহলে এক একটি জনবসতিতে এক একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী পাঠাতে পারতাম।[৬৬] কাজেই হে নবী, কাফেরদের কথা কখনো মেনে নিয়ো না এবং এ কুরআন নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তম জিহাদ করো।[৬৭]

আর তিনিই দুই সাগরকে মিলিত করেছেন। একটি সুস্বাদু ও মিষ্ট এবং অন্যটি লোনা ও খার। আর দু'য়ের মাঝে একটি অন্তরাল রয়েছে, একটি বাধা তাদের একাকার হবার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে রেখেছে।[৬৮]

আর তিনিই পানি থেকে একটি মানুষ তৈরি করেছেন, আবার তার থেকে বংশীয় ও শ্বশুরালয়ের দু'টি আলাদা ধারা চালিয়েছেন।[৬৯] তোমার রব বড়ই শক্তি সম্পন্ন।

যদি তৃতীয় দিকটি (অর্থাৎ খরার সাথে জাহেলীয়াতের এবং রহমতের বারিধারার সাথে অহী ও নবুওয়াতের তুলনাকে) সামনে রেখে দেখা হয় তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় ঃ মানব জাতির ইতিহাসে এ দৃশ্য বার বার সামনে এসেছে যে, যখনই এ দুনিয়া নবী ও আল্লাহর কিতাবের কল্যাণসুধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তখনই মানবতা বন্ধ্যা হয়ে গেছে এবং চিন্তা ও নৈতিকতার ভূমিতে কাঁটাগুল্ম ছাড়া আর কিছুই উৎপন্ন হয়নি। আর যখনই অহী ও রিসালাতের জীবন বারি এ পৃথিবীতে পৌঁছে গেছে তখনই মানবতার উদ্যান ফলেফুলে সুশোভিত হয়েছে। জ্ঞান–বিজ্ঞান মূর্খতা ও জাহেলীয়াতের স্থান দখল করেছে। জুলুম–নিপীড়ণের জায়গায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফাসেকী ও অশ্লীলতার জায়গায় নৈতিক ও চারিত্রিক মাহাত্মের ফুল ফুটেছে। যেদিকে তার দান যতটুকু পৌঁছেছে সেদিকেই অসদাচার কমে গেছে এবং সদাচার বেড়ে গেছে। নবীদের আগমন সবসময় একটি শুভ ও কল্যাণকর চিন্তা ও নৈতিক বিপ্লবের সূচনা করেছে। কখনো এর ফল খারাপ হয়নি। আর নবীদের বিধান ও নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করে বা তা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানব জাতি সব সময় ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে। কখনো এর ফল ভালো হয়নি। ইতিহাস এ দৃশ্য বারবার দেখিয়েছে এবং কুরআনও বার বার এদিকে ইশারা করেছে। কিন্তু এরপরও

লোকেরা শিক্ষা নেয় না। এটি একটি অমোঘ সত্য। হাজার বছরের মানবিক অভিজ্ঞতার ছাপ এর গায়ে লেগে আছে। কিন্তু একে অস্বীকার করা হচ্ছে। আর আজ নবী ও কিতাবের নিয়ামত দান করে আল্লাহ যে জনপদকে ধন্য করেছেন সে এর শোকর গুজারী করার পরিবর্তে উলটো অকৃতজ্ঞ মনোভাব প্রকাশের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৬৬. অর্থাৎ এমনটি করা আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল না। চাইলে আমি বিভিন্ন স্থানে নবীর আবির্ভাব ঘটাতে পারতাম। কিন্তু তা আমি করিনি। বরং সারা দুনিয়ার জন্য মাত্র একজন নবী পাঠিয়েছি। একটি সূর্য যেমন সারা দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট ঠিক তেমনি সঠিক পথ প্রদর্শনের এ একমাত্র সূর্যই সারা দুনিয়াবাসীর জন্য যথেষ্ট।

৬৭. বৃহত্তম জিহাদের তিনটি অর্থ। এক, চূড়ান্ত প্রচেষ্টা, অর্থাৎ চেষ্টা ও প্রাণপাত করার ব্যাপারে মানুষের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া। দুই, বড় আকারের প্রচেষ্টা। অর্থাৎ নিজের সমস্ত উপায়–উপকরণ তার মধ্যে নিয়োজিত করা। তিন, ব্যাপক প্রচেষ্টা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রচেষ্টার কোন দিক এবং মোকাবিলার কোন ময়দান ছেড়ে না দেয়া। প্রতিপক্ষের শক্তি যেসব ময়দানে কাজ করছে সেসব ময়দানে নিজের শক্তি নিয়োজিত করা এবং সত্যের শির উঁচু করার জন্য যেসব দিক থেকে কাজ করার প্রয়োজন হয় সেসব দিক থেকে কাজ করা। কন্ঠ ও কলমের জিহাদ, ধন ও প্রাণের জিহাদ এবং বন্দুক ও কামানের যুদ্ধ সবই এর অন্তরভুক্ত।

৬৮. যেখানে কোন বড় নদী এসে সাগরে পড়ে এমন প্রত্যেক জায়গায় এ অবস্থা হয়। এছাড়া সমুদ্রের মধ্যেও বিভিন্ন জায়গায় মিঠা পানির স্রোত পাওয়া যায়। সমুদ্রের ভীষণ লবণাক্ত পানির মধ্যেও সে তার মিষ্টতা পুরোপুরি বজায় রাখে। তুর্কী নৌসেনাপতি সাইয়েদী আলী রইস তাঁর ষোড়শ শতকে লেখিত "মিরআতুল মামালিক" গ্রন্থে পারস্য উপসাগরে এমনিধারার একটি স্থান চিহ্নিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, সেখানে লবণাক্ত পানির নিচে রয়েছে মিঠা পানির স্রোত। আমি নিজে আমাদের নৌসেনাদের জন্য সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করেছি। বর্তমান যুগে আমেরিকান কোম্পানী যখন সউদী আরবে তেল উত্তোলনের কাজ শুরু করে তখন তারাও শুরুতে পারস্য উপসাগরের এসব স্রোত থেকে পানি সংগ্রহ করতে থাকে। পরে দাহরানের কাছে পানির কূয়া খনন করা হয় এবং তা থেকে পানি উঠানো হতে থাকে। বাহরাইনের কাছেও সমুদ্রের তলায় মিঠা পানির স্রোত রয়েছে। সেখান থেকে লোকেরা কিছুদিন আগেও মিঠা পানি সংগ্রহ করতে থেকেছে।

এ হচ্ছে আয়াতের বাহ্যিক বিষয়বস্তু। আল্লাহর শক্তিমত্তার একটি প্রকাশ থেকে এটি তাঁর একক ইলাহ ও একক রব হবার প্রমাণ পেশ করে। কিন্তু এর শব্দাবলীর অভ্যন্তর থেকে একটি সূক্ষ্ম ইশারা অন্য একটি বিষয়বস্তুর সন্ধান দেয়। সেটি হচ্ছে, মানব সমাজের সমুদ্র যতই লোনা ও খার হয়ে থাক না কেন আল্লাহ যখনই চান তার তলদেশ থেকে একটি সৎকর্মশীল দলের মিঠা স্রোত বের করে আনতে পারেন এবং সমুদ্রের লোনা পানির তরংগগুলো যতই শক্তি প্রয়োগ করুক না কেন তারা এই স্রোত গ্রাস করতে সক্ষম হবে না।

৬৯. অর্থাৎ নগণ্য এক ফোঁটা পানি থেকে মানুষের মতো এমনি ধরনের একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি তৈরি করাটা তো সামান্য কৃতিত্বের ব্যাপার ছিল না কিন্তু তার উপর আরো

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ﴿٥٥﴾

এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে লোকেরা এমন সব সত্তার পূজা করছে যারা না তাদের উপকার করতে পারে, না অপকার। আবার অতিরিক্ত হচ্ছে এই যে, কাফের নিজের রবের মোকাবিলায় প্রত্যেক বিদ্রোহীর সাহায্যকারী হয়ে আছে।[৭০]

কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষের একটি নয় বরং দু'টি আলাদা আলাদা নমুনা (নর ও নারী) তৈরি করেছেন। তারা মানবিক গুণাবলীর দিক দিয়ে একই পর্যায়ভুক্ত হলেও দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা অনেক বেশী। কিন্তু এ বিভিন্নতার কারণে তারা পরস্পর বিরোধী ও বিপরীতমুখী নয় বরং পরস্পরের পুরোপুরি জোড়ায় পরিণত হয়েছে। তারপর এ জোড়াগুলো মিলিয়ে তিনি অদ্ভূত ভারসাম্য সহকারে (যার মধ্যে অন্যের কৌশল ও ব্যবস্থাপনার সামান্যতম দখলও নেই) দুনিয়ায় পুরুষও সৃষ্টি করছেন আবার নারীও। তাদের থেকে একদিকে পুত্র ও নাতিদের একটি ধারা চলছে। তারা অন্যের ঘর থেকে বিয়ে করে স্ত্রী নিয়ে আসছে। আবার অন্যদিকে কন্যা ও নাতনীদের একটি ধারা চলছে। তারা স্ত্রী হয়ে অন্যের ঘরে চলে যাচ্ছে। এভাবে এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবার মিশে সারা দেশ এক বংশ ও এক সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত হয়ে যাচ্ছে।

এখানেও এ বিষয়বস্তুর দিকে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত আছে যে, এ সমগ্র জীবন ক্ষেত্রে যে কর্মকৌশলটি সক্রিয় রয়েছে তার কর্মধারাই কিছুটা এমনি ধরনের যার ফলে এখানে বিভিন্নতা ও বিরোধ এবং তারপর বিভিন্ন বিরোধীয় পক্ষের জোড়া থেকেই যাবতীয় ফলাফলের উদ্ভব ঘটে। কাজেই তোমরা যে বিভিন্নতা ও বিরোধের মুখোমুখি হয়েছো তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। এটিও একটি ফলদায়ক জিনিস।

৭০. আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত ও তাঁর আইন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দুনিয়ার যেখানে যা কিছু প্রচেষ্টা চলছে কাফেরের সমবেদনা তার প্রতি হবে না বরং তার সমবেদনা হবে এমন সব লোকদের প্রতি যারা সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। অনুরূপভাবে কাফেরের সমস্ত আগ্রহ আল্লাহর হুকুম মেনে চলার ও তাঁর আনুগত্য করার সাথে সম্পৃক্ত হবে না বরং তাঁর হুকুম অমান্য করার সাথে সম্পৃক্ত হবে। আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কাজ যে যেখানেই করবে কাফের যদি কার্যত তার সাথে শরীক না হতে পারে তাহলে অন্ততপক্ষে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়েই দেবে। এভাবে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের বুকে সাহস যোগাবে। অপরদিকে, যদি কেউ আল্লাহর হুকুম পালন করতে থাকে তাহলে কাফের তাকে বাধা দেবার ব্যাপারে একটুও ইতস্তত করবে না। নিজে বাধা দিতে না পারলে তাকে হিম্মতহারা করার জন্য যাকিছু সে করতে পারে তা করে ফেলবে। এমনকি যদি তার শুধুমাত্র নাক সিটকাবার ক্ষমতা বা সুযোগ থাকে তাহলে তাও করবে। আল্লাহর হুকুম অমান্য করার প্রতিটি খবর তার জন্য হবে হৃদয়

وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝٥٦ قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلٰى رَبِّهِۦ سَبِيلًا ۝٥٧

হে মুহাম্মাদ! তোমাকে তো আমি শুধুমাত্র একজন সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি।[৭১] এদের বলে দাও, "এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না, যে চায় সে তার নিজের রবের পথ অবলম্বন করুক, এটিই আমার প্রতিদান।"[৭১(ক)]

জুড়ানো সুখবর। অন্যদিকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার প্রতিটি খবর যেন তার কলিজায় তীরের মতো বিঁধবে।

৭১. অর্থাৎ কোন ঈমানদারকে পুরস্কার এবং কোন অস্বীকারকারীকে শাস্তি দেয়া তোমার কাজ নয়। কাউকে জোর করে ঈমানের দিকে টেনে আনা এবং কাউকে জবরদস্তি অস্বীকার করা থেকে দূরে রাখার কাজেও তুমি নিযুক্ত হওনি। যে ব্যক্তি সত্য–সঠিক পথ গ্রহণ করবে তাকে শুভ পরিণামের সুসংবাদ দেবে এবং যে ব্যক্তি নিজের কু পথে অবিচল থাকবে তাকে আল্লাহর পাকড়াও ও শাস্তির ভয় দেখাবে, তোমার দায়িত্ব এতটুকুই, এর বেশী নয়।

কুরআন মজীদের যেখানেই এ ধরনের উক্তি এসেছে সেখানেই তার বক্তব্যের মূল লক্ষ হচ্ছে কাফের সমাজ। সেখানে এ কথা বলাই তাদের উদ্দেশ্য যে, নবী হচ্ছেন একজন নিস্বার্থ সংস্কারক, যিনি আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণার্থে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে থাকেন এবং তাদের শুভ ও অশুভ পরিণাম সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন। তিনি জোরপূর্বক তোমাদের এ পয়গাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন না। এভাবে বাধ্য করলে তোমরা অনর্থক বিক্ষুব্ধ হয়ে সংঘাত সংঘর্ষে লিপ্ত হতে। তোমরা যদি মেনে নাও তা হলে এতে তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে, তাঁর দু' পয়সা লাভ হবে না। আর যদি না মানো তাহলে নিজেদেরই ক্ষতি হবে, তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ, এখন আমার সাথে তোমাদের ব্যাপার জড়িত হয়ে পড়েছে।—একথা না বুঝার কারণে অনেক সময় লোকেরা এ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে যে, মুসলমানদের ব্যাপারেও বুঝি নবীর কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া এবং শুভ পরিণামের সুসংবাদ শুনিয়ে দিয়েই শেষ। অথচ কুরআন বিভিন্ন স্থানে বার বার সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে যে, মুসলমানদের জন্য নবী কেবল সুসংবাদদাতাই নন বরং শিক্ষক, পরিশুদ্ধকারী এবং কর্মের আদর্শও। মুসলমানদের জন্য তিনি শাসক, বিচারক এবং এমন আমীরও যার আনুগত্য করতে হবে। তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে আসা প্রতিটি ফরমান তাদের জন্য আইনের মর্যাদা রাখে। সর্বান্তকরণে তাদের এ আইন মেনে চলতে হবে। কাজেই যারা وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ও مَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلٰغُ এবং এ ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্যান্য আয়াতকে নবী ও মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেন তারা বিরাট ভুল করে যাচ্ছেন।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾

সেজদা

হে মুহাম্মাদ! ভরসা করো এমন আল্লাহর প্রতি যিনি জীবিত এবং কখনো মরবেন না। তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো। নিজের বান্দাদের গোনাহের ব্যাপারে কেবল তাঁরই জানা যথেষ্ট। তিনিই ছয়দিনে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সব তৈরি করে রেখে দিয়েছেন, তারপর তিনিই (বিশ্ব-জাহানের সিংহাসন) আরশে সমাসীন হয়েছেন,[৭২] তিনিই রহমান, যে জানে তাকে জিজ্ঞেস করো তাঁর অবস্থা সম্পর্কে।

তাদেরকে যখন বলা হয়, এই রহমানকে সিজদা করো তখন তারা বলে, "রহমান কি? তুমি যার কথা বলবে তাকেই কি আমরা সিজদা করতে থাকবো"?[৭৩] এ উপদেশটি উল্‌টো তাদের ঘৃণা আরো বাড়িয়ে দেয়।[৭৪]

৭১ (ক). ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিনূন ৭০ টীকা।

৭২. মহান আল্লাহর আরশের ওপর সমাসীন হবার বিষয়টির ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আরাফ ৪১-৪২, ইউনূস ৪ এবং হূদ ৭ টীকা।

পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী ছ'দিনে তৈরি করার বিষয়টি মুতাশাবিহাতের অন্তরভুক্ত। এর অর্থ নির্ধারণ করা কঠিন। হতে পারে একদিন অর্থ একটি যুগ, আবার এও হতে পারে, দুনিয়ায় আমরা একদিন বলতে যে সময়টুকু বুঝি একদিন অর্থ সেই পরিমাণ সময়। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা হা-মীম-আস্ সাজ্‌দাহ ১১-১৫ টীকা)।

৭৩. একথা তারা বলতো আসলে নিছক কাফের সুলভ ঔদ্ধত্য ও গোয়ার্তুমির বশে। যেমন ফেরাউন হযরত মূসাকে বলেছিল وَمَا رَبُّ الْعَٰلَمِينَ ؟ "রব্বুল আলামীন আবার কি?" অথচ মক্কার কাফেররা রহমান তথা দয়াময় আল্লাহ সম্পর্কে বেখবর ছিল না এবং ফেরাউনও রব্বুল আলামীন সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। কোন কোন মুফাস্‌সির এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, আরবদের মধ্যে আল্লাহর "রহমান" নামটি বেশী প্রচলিত ছিল না, তাই তারা এ আপত্তি করেছে। কিন্তু আয়াতের প্রকাশ ভংগী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, না

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ﴿٦١﴾ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿٦٢﴾ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾

৬ রুকূ'

অসীম বরকত সম্পন্ন তিনি যিনি আকাশে বুরুজ নির্মাণ করেছেন[৭৫] এবং তার মধ্যে একটি প্রদীপ[৭৬] ও একটি আলোকময় চাঁদ উজ্জ্বল করেছেন। তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে শিক্ষা গ্রহণ করতে অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায়।[৭৭]

রহমানের (আসল) বান্দা তারাই[৭৮] যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে[৭৯] এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়, তোমাদের সালাম।[৮০] তারা নিজেদের রবের সামনে সিজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়।[৮১]

জানার কারণে এ আপত্তি করা হয়নি বরং করা হয়েছিল জাহেলীয়াতের প্রাবল্যের কারণে। নয়তো এজন্য পাকড়াও করার পরিবর্তে আল্লাহ নরমভাবে তাদের বুঝিয়ে দিতেন যে, এটাও আমারই একটি নাম, এতে অবাক হবার কিছু নেই। তা ছাড়া একথা ঐতিহাসিকভাবেও প্রমাণিত যে, আরবে প্রাচীনকাল থেকে রহমান শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এটা বহুল প্রচলিত ও পরিচিত শব্দ ছিল। দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আস সাজদাহ-৫ ও সাবা ৩৫ টীকা।

৭৪. এখানে তেলাওয়াতের সিজদা করার ব্যাপারে সকল আলেম একমত। প্রত্যেক কুরআন পাঠক ও শ্রোতার এ জায়গায় সিজদা করা উচিত। তাছাড়া যখনই কেউ এ আয়াতটি শুনবে জবাবে বলবে, زَادَنَا اللّٰهُ خُضُوْعًا مَا زَادَ لِلْاَعْدَاءِ نُفُوْرًا "আল্লাহ করুন, ইসলামের দুশমনদের ঘৃণা যত বাড়ে আমাদের আনুগত্য ও বিনয় যেন ততই বাড়ে।" এটি একটি সুন্নাত।

৭৫. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হিজর ৮-১২ টীকা।

৭৬. অর্থাৎ সূর্য। যেমন সূরা নূহে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (আর সূর্যকে প্রদীপ বানিয়েছেন) [১৬ আয়াত]

৭৭. এ দু'টি ভিন্ন ধরনের মর্যাদা কিন্তু স্বভাবের দিক দিয়ে এরা পরস্পরের জন্য অপরিহার্য। দিন–রাত্রির আবর্তন ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করার ফলে মানুষ প্রথমে এ থেকে তাওহীদের শিক্ষা লাভ করে এবং আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে গিয়ে থাকলে সংগে সংগেই সজাগ হয়ে যায়। এর দ্বিতীয় ফল হয়, আল্লাহর রবুবীয়াতের অনুভূতি জাগ্রত হয়ে মানুষ আল্লাহর সমীপে মাথা নত করে এবং কৃতজ্ঞতার প্রতিমূর্তিতে পরিণত হয়।

৭৮. অর্থাৎ যে রহমানকে সিজদা করার জন্য তোমাদের বলা হচ্ছে এবং তোমরা তা অস্বীকার করছো, সবাই তো তাঁর জন্মগত বান্দা কিন্তু সচেতনতা সহকারে বন্দেগীর পথ অবলম্বন করে যারা এসব বিশেষ গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে তারাই তাঁর প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দা। তাছাড়া তোমাদের যে সিজদা করার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার ফলাফল তাঁর বন্দেগীর পথ অবলম্বনকারীদের জীবনে দেখা যাচ্ছে এবং তা অস্বীকার করার ফলাফল তোমাদের নিজেদের জীবন থেকে পরিস্ফুট হচ্ছে। এখানে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র নৈতিকতার দু'টি আদর্শের তুলনা করা। একটি আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল এবং দ্বিতীয় আদর্শটি জাহেলীয়াতের অনুসারী লোকদের মধ্যে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু এ তুলনামূলক আলোচনার জন্য শুধুমাত্র প্রথম আদর্শ চরিত্রের সুস্পষ্ট বৈশিষ্টগুলো সামনে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় আদর্শকে প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ও চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে সে নিজেই প্রতিপক্ষের ছবি দেখে নেয় এবং নিজেই উভয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে। তার চিত্র পৃথকভাবে পেশ করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ চারপাশের সকল সমাজে তার সোচ্চার উপস্থিতি ছিল।

৭৯. অর্থাৎ অহংকারের সাথে বুক ফুলিয়ে চলে না। গর্বিত স্বৈরাচারী ও বিপর্যয়কারীর মতো নিজের চলার মাধ্যমে নিজের শক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা করে না। বরং তাদের চালচলন হয় একজন ভদ্র, মার্জিত ও সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মতো। নম্রভাবে চলার মানে দুর্বল ও রুগীর মতো চলা নয় এবং একজন প্রদর্শন অভিলাষী নিজের বিনয় প্রদর্শন করার বা নিজের আল্লাহ ভীতি দেখাবার জন্য যে ধরনের কৃত্রিম চলার ভংগী সৃষ্টি করে সে ধরনের কোন চলাও নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে চলার সময় এমন শক্তভাবে পা ফেলতেন যেন মনে হতো ওপর থেকে ঢালুর দিকে নেমে যাচ্ছেন। হযরত উমরের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি এক যুবককে দুর্বলভাবে হেঁটে যেতে দেখে তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অসুস্থ? সে বলে, না। তিনি ছড়ি উঠিয়ে তাকে ধমক দিয়ে বলেন, শক্ত হয়ে সবল ব্যক্তির মতো চলো। এ থেকে জানা যায়, নম্রভাবে চলা মানে, একজন ভালো মানুষের স্বাভাবিকভাবে চলা। কৃত্রিম বিনয়ের সাহায্যে যে চলার ভংগী সৃষ্টি করা হয় অথবা যে চলার মধ্য দিয়ে বানোয়াট দীনতা ও দুর্বলতার প্রকাশ ঘটানো হয় তাকে নম্রভাবে চলা বলে না।

কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে, মানুষের চলার মধ্যে এমন কি গুরুত্ব আছে যে কারণে আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রসংগে সর্বপ্রথম এর কথা বলা হয়েছে? এ প্রশ্নটিকে যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বুঝা যায় যে, মানুষের চলা শুধুমাত্র তার হাঁটার একটি ভংগীর নাম নয় বরং আসলে এটি হয় তার মন–মানস, চরিত্র ও নৈতিক কার্যাবলীর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির চলা,

একজন গুণ্ডা ও বদমায়েশের চলা, একজন স্বৈরাচারী ও জালেমের চলা, একজন আত্মম্ভরী অহংকারীর চলা, একজন সভ্য-ভব্য ব্যক্তির চলা, একজন দরিদ্র-দীনহীনের চলা এবং এভাবে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের লোকদের চলা পরস্পর থেকে এত বেশী বিভিন্ন হয় যে, তাদের প্রত্যেককে দেখে কোন্ ধরনের চলার পেছনে কোন্ ধরনের ব্যক্তিত্ব কাজ করছে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কাজেই আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, রহমানের বান্দাদের তোমরা সাধারণ লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখেই তারা কোন্ ধরনের লোক পূর্ব পরিচিতি ছাড়াই আলাদাভাবে তা চিহ্নিত করতে পারবে। এ বন্দেগী তাদের মানসিকতা ও চরিত্র যেভাবে তৈরী করে দিয়েছে তার প্রভাব তাদের চালচলনেও সুস্পষ্ট হয়। এক ব্যক্তি তাদের দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই জানতে পারে, তারা ভদ্র, ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিশীল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী, তাদের দিক থেকে কোন প্রকার অনিষ্টের আশংকা করা যেতে পারে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল ৪৩, সূরা লোকমান ৩৩ টীকা)

৮০. মূর্খ মানে অশিক্ষিত বা লেখাপড়া নাজানা লোক নয় বরং এমন লোক যারা জাহেলী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবার উদ্যোগ নিয়েছে এবং কোন ভদ্রলোকের সাথে অশালীন ব্যবহার করতে শুরু করেছে। রহমানের বান্দাদের পদ্ধতি হচ্ছে, তারা গালির জবাবে গালি এবং দোষারোপের জবাবে দোষারোপ করে না। এভাবে প্রত্যেক বেহুদাপনার জবাবে তারাও সমানে বেহুদাপনা করে না। বরং যারাই তাদের সাথে এহেন আচরণ করে তাদের সালাম দিয়ে তারা অগ্রসর হয়ে যায়, যেমন কুরআনের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে :

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ - (القصص : ٥٥)

"আর যখন তারা কোন বেহুদা কথা শোনে, তা উপেক্ষা করে যায়। বলে, আরে ভাই, আমাদের কাজের ফল আমরা পাবো এবং তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে। সালাম তোমাদের, আমরা জাহেলদের সাথে কথা বলি না।" (আল কাসাস : ৫৫) [ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল কাসাস ৭২ ও ৭৮ টীকা]

৮১. অর্থাৎ ওটা ছিল তাদের দিনের জীবন এবং এটা হচ্ছে রাতের জীবন। তাদের রাত আরাম আয়েশে, নাচগানে, খেলা-তামাশায়, গপ-সপে এবং আড্ডাবাজী ও চুরি-চামারিতে অতিবাহিত হয় না। জাহেলীয়াতের এসব পরিচিত বদ কাজগুলোর পরিবর্তে তারা এ সমাজে এমন সব সৎকর্ম সম্পাদনকারী যাদের রাত কেটে যায় আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে দোয়া ও ইবাদাত করার মধ্য দিয়ে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তাদের জীবনের এ দিকগুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন সূরা সাজদায় বলা হয়েছে :

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا -

"তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে, নিজেদের রবকে ডাকতে থাকে আশায় ও আশংকায়।" (১৬ আয়াত)

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

তারা দোয়া করতে থাকে ঃ " হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও, তার আযাব তো সর্বনাশা। আশ্রয়স্থল ও আবাস হিসেবে তা বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা।[৮২] তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং উভয় প্রান্তিকের মাঝামাঝি তাদের ব্যয় ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।[৮৩] তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন কোন সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না।[৮৪]—এসব যে–ই করে সে তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাকে উপর্যুপরি শাস্তি দেয়া হবে[৮৫] এবং সেখানেই সে পড়ে থাকবে চিরকাল লাঞ্ছিত অবস্থায়।

সূরা যারিয়াতে বলা হয়েছে ঃ

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ○ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

"এ সকল জান্নাতবাসী ছিল এমন সব লোক যারা রাতে সামান্যই ঘুমাতো এবং ভোর রাতে মাগফিরাতের দোয়া করতো।" (১৭–১৮ আয়াত)

সূরা যুমারে বলা হয়েছে ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ –

"যে ব্যক্তি হয় আল্লাহর হুকুম পালনকারী, রাতের বেলা সিজদা করে ও দাঁড়িয়ে থাকে, আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের প্রত্যাশা করে তার পরিণাম কি মুশরিকের মতো হতে পারে?" (৯ আয়াত)

৮২. অর্থাৎ এ ইবাদাত তাদের মধ্যে কোন অহংকারের জন্ম দেয় না। আমরা তো আল্লাহর প্রিয়, কাজেই আগুন আমাদের কেমন করে স্পর্শ করতে পারে, এ ধরনের আত্মগর্বও তাদের মনে সৃষ্টি হয় না। বরং নিজেদের সমস্ত সৎকাজ ও ইবাদাত–বন্দেগী সত্ত্বেও তারা এ ভয়ে কাঁপতে থাকে যে, তাদের কাজের ভুল–ত্রুটিগুলো বুঝি তাদের আযাবের সম্মুখীন করলো। নিজেদের তাকওয়ার জোরে জান্নাত জয় করে নেবার অহংকার তারা করে না। বরং নিজেদের মানবিক দুর্বলতাগুলো মনে করে এবং এজন্যও নিজেদের কার্যাবলীর ওপর নয় বরং আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ওপর থাকে তাদের ভরসা।

৮৩. অর্থাৎ তাদের অবস্থা এমন নয় যে, আরাম–আয়েশ, বিলাসব্যসন, মদ–জুয়া, ইয়ার–বন্ধু, মেলা–পার্বন ও বিয়েশাদীর পেছনে অঢেল পয়সা খরচ করছে এবং নিজের সামর্থের চেয়ে অনেক বেশী করে নিজেকে দেখাবার জন্য খাবার–দাবার, পোশাক–পরিচ্ছদ, বাড়ি–গাড়ি, সাজগোজ ইত্যাদির পেছনে নিজের টাকা–পয়সা ছড়িয়ে চলছে। আবার তারা একজন অর্থলোভীর মতো নয় যে, এক একটা পয়সা গুণে গুণে রাখে। এমন অবস্থাও তাদের নয় যে, নিজেও খায় না, নিজের সামর্থ অনুযায়ী নিজের ছেলেমেয়ে ও পরিবারের লোকজনদের প্রয়োজনও পূর্ণ করে না এবং প্রাণ খুলে কোন ভালো কাজে কিছু ব্যয়ও করে না। আরবে এ দু'ধরনের লোক বিপুল সংখ্যায় পাওয়া যেতো। একদিকে ছিল একদল লোক যারা প্রাণ খুলে খরচ করতো। কিন্তু প্রত্যেকটি খরচের উদ্দেশ্য হতো ব্যক্তিগত বিলাসিতা ও আরাম–আয়েশ অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেকে উঁচু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং নিজের দানশীলতা ও ধনাঢ্যতার ডংকা বাজানো। অন্যদিকে ছিল সর্বজন পরিচিত কৃপণের দল। ভারসাম্যপূর্ণ নীতি খুব কম লোকের মধ্যে পাওয়া যেতো। আর এই কম লোকদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ।

এ প্রসংগে অমিতব্যয়িতা ও কার্পণ্য কি জিনিস তা জানা উচিত। ইসলামের দৃষ্টিতে তিনটি জিনিসকে অমিতব্যয়িতা বলা হয়। এক, অবৈধ কাজে অর্থ ব্যয় করা, তা একটি পয়সা হলেও। দুই, বৈধ কাজে ব্যয় করতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে সে নিজের সামর্থের চাইতে বেশী ব্যয় করে অথবা নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী যে অর্থসম্পদ সে লাভ করেছে তা নিজেরই বিলাসব্যসনে ও বাহ্যিক আড়ম্বর অনুষ্ঠানে ব্যয় করতে পারে। তিন, সৎকাজে ব্যয় করা। কিন্তু আল্লাহর জন্য নয় বরং অন্য মানুষকে দেখাবার জন্য। পক্ষান্তরে কার্পণ্য বলে বিবেচিত হয় দু'টি জিনিস। এক, মানুষ নিজের ও নিজের পরিবার–পরিজনদের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের সামর্থ ও মর্যাদা অনুযায়ী ব্যয় করে না। দুই, ভালো ও সৎকাজে তার পকেট থেকে পয়সা বের হয় না। এ দু'টি প্রান্তিকতার মাঝে ইসলামই হচ্ছে ভারসাম্যের পথ। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

من فقه الرجل قصده فى معيشته

"নিজের অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা মানুষের ফকীহ (জ্ঞানবান) হবার অন্যতম আলামত।" (আহমদ ও তাবারানী, বর্ণনাকারী আবুদ্ দারদা)

৮৪. অর্থাৎ আরববাসীরা যে তিনটি বড় গোনাহের সাথে বেশী করে জড়িত থাকে সেগুলো থেকে তারা দূরে থাকে। একটি হলো শির্‌ক, দ্বিতীয়টি অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং তৃতীয়টি যিনা। এ বিষয়বস্তুটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপুল সংখ্যক হাদীসে বর্ণনা করেছেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীস। তাতে বলা হয়েছে ঃ একবার নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করা হলো, সবচেয়ে বড় গোনাহ কি? তিনি বললেন ঃ ان تجعل لله ندا وهو خلقك "তুমি যদি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাও। অথচ আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর? বললেন ঃ ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك "তুমি যদি তোমার সন্তানকে হত্যা কর এই ভয়ে যে সে তোমার সাথে আহারে অংশ নেবে।" জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর? বললেন ঃ ان تزنى حليلة جارك "তুমি যদি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমদ) যদিও আরো অনেক কবীরা গোনাহ আছে কিন্তু সেকালের আরব সমাজে এ তিনটি গোনাহই সবচেয়ে বেশী জেঁকে বসেছিল। তাই এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের এ বৈশিষ্ট সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছিল যে, সমগ্র আরব সমাজে মাত্র এ গুটিকয় লোকই এ পাপগুলো থেকে মুক্ত আছে।

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, মুশরিকদের দৃষ্টিতে তো শির্‌ক থেকে দূরে থাকা ছিল একটি মস্ত বড় দোষ, এক্ষেত্রে একে মুসলমানদের একটি প্রধান গুণ হিসেবে তাদের সামনে তুলে ধরার যৌক্তিকতা কি ছিল? এর জবাব হচ্ছে আরববাসীরা যদিও শিরকে লিপ্ত ছিল এবং এ ব্যাপারে তারা অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট মনোভাবের অধিকারী ছিল কিন্তু আসলে এর শিকড় উপরিভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল, গভীর তলদেশে পৌছেনি। দুনিয়ার কোথাও কখনো শিরকের শিকড় মানব প্রকৃতির গভীরে প্রবিষ্ট থাকে না। বরঞ্চ নির্ভেজাল আল্লাহ বিশ্বাসের মহত্ব তাদের মনের গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছিল। তাকে উদ্দীপিত করার জন্য শুধুমাত্র উপরিভাগে একটুখানি আঁচড় কাটার প্রয়োজন ছিল। জাহেলিয়াতের ইতিহাসের বহুতর ঘটনাবলী এ দু'টি কথার সাক্ষ দিয়ে থাকে। যেমন আবরাহার হামলার সময় কুরাইশদের প্রত্যেকটি শিশুও জানতো যে, কাবাগৃহে রক্ষিত মূর্তিগুলো এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না বরং একমাত্র এ গৃহের মালিক আল্লাহই এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। হাতি সেনাদের ধ্বংসের পর সমকালীন কবিরা যে সব কবিতা ও কাসীদা পাঠ করেছিলেন এখনো সেগুলো সংরক্ষিত আছে। সেগুলোর প্রতিটি শব্দ সাক্ষ দিচ্ছে, তারা এ ঘটনাকে নিছক মহান আল্লাহর শক্তির প্রকাশ মনে করতো এবং এতে তাদের উপাস্যদের কোন কৃতিত্ব আছে বলে ভুলেও মনে করতো না। এ সময় কুরাইশ ও আরবের সমগ্র মুশরিক সমাজের সামনে শিরকের নিকৃষ্টতম পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শিত হয়েছিল। আবরাহা মক্কা যাওয়ার পথে তায়েফের কাছাকাছি পৌছে গেলে তায়েফবাসীরা আবরাহা কর্তৃক তাদের "লাত" দেবতার মন্দির বিধ্বস্ত হওয়ার আশংকায় তাকে কাবা ধ্বংসের কাজে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছিল এবং পার্বত্য পথে তার সৈন্যদের নিরাপদে মক্কায় পৌছিয়ে দেবার জন্য পথ প্রদর্শকও দিয়েছিল। এ ঘটনার তিক্ত স্মৃতি কুরাইশদেরকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানসিকভাবে পীড়ন করতে থাকে এবং বছরের পর বছর তারা তায়েফের পথ প্রদর্শকের কবরে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকে। তাছাড়া কুরাইশ ও অন্যান্য আরববাসীরা নিজেদের দীনকে হযরত ইবরাহীমের আনীত দীন মনে করতো। নিজেদের বহু ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি এবং বিশেষ করে হজ্জের নিয়মকানুন ও রসম

রেওয়াজকে ইবরাহীমের দীনের অংশ গণ্য করতো। তারা একথাও মানতো যে, হযরত ইবরাহীম একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করতেন এবং তিনি কখনো মূর্তি পূজা করেননি। তাদের মধ্যে যেসব কথা ও কাহিনী প্রচলিত ছিল তাতে মূর্তি পূজার প্রচলন তাদের দেশে কবে থেকে শুরু হয়েছিল এবং কোন্ মূর্তিটি কে কবে কোথায় থেকে এনেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষিত ছিল। একজন সাধারণ আরবের মনে নিজের উপাস্য দেবতাদের প্রতি যে ধরনের ভক্তি–শ্রদ্ধা ছিল তা এভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, কখনো তার প্রার্থনা ও আশা–আকাংখা বিরোধী কোন ঘটনা ঘটে গেলে অনেক সময় নিজের উপাস্য দেবতাদেরকেই সে তিরস্কার করতো, তাদেরকে অপমান করতো এবং তাদের সামনে নযরানা পেশ করতো না। একজন আরব নিজের পিতার হত্যাকারী থেকে প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিল। 'যুল খালাসাহ' নামক ঠাকুরের আস্তানায় গিয়ে সে ধর্না দেয় এবং এ ব্যাপারে তার ভবিষ্যত কর্মপন্থা জানতে চায়। সেখান থেকে এ ধরনের কাজ না করার জবাব আসে। এতে আরবটি ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে থাকে ঃ

لو كنت يا ذا الخلص الموتورا   مثلى وكان شيخك المقبورا

لم تنه عن قتل العداة زورا

অর্থাৎ " হে যুল খালাসা! তুমি যদি হতে আমার জায়গায়
নিহত হতো যদি তোমার পিতা
তাহলে কখনো তুমি মিথ্যাচারী হতে না
বলতে না প্রতিশোধ নিয়ো না জালেমদের থেকে।"

অন্য একজন আরব তার উটের পাল নিয়ে যায় সা'দ নামক দেবতার আস্তানায় তাদের জন্য বরকত লাভ করার উদ্দেশ্যে। এটি ছিল একটি লম্বা ও দীর্ঘ মূর্তি। বলির পশুর চাপ চাপ রক্ত তার গায়ে লেপ্টেছিল। উটেরা তা দেখে লাফিয়ে ওঠে এবং চারদিকে ছুটে পালিয়ে যেতে থাকে। আরবটি তার উটগুলোকে এভাবে চারদিকে বিশৃংখলভাবে ছুটে যেতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে মূর্তিটির গায়ে পাথর মারতে মারতে বলতে থাকে ঃ "আল্লাহ তোর সর্বনাশ করুক। আমি এসেছিলাম বরকত নেবার জন্য কিন্তু তুই তো আমার এই বাকি উটগুলোকেও ভাগিয়ে দিয়েছিস।" অনেক মূর্তি ছিল যেগুলো সম্পর্কে বহু ন্যাক্কারজনক গল্প প্রচলিত ছিল। যেমন ছিল আসাফ ও নায়েলার ব্যাপারে। এ দু'টি মূর্তি রক্ষিত ছিল সাফা ও মারওয়ার ওপর। এদের সম্পর্কে প্রচলিত ছিল যে, এরা দু'জন ছিল মূলত একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক। এরা কাবাঘরের মধ্যে যিনা করে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে পাথরে পরিণত করে দেন। যেসব দেবতার এ হচ্ছে আসল রূপ, তাদের পূজারী ও ভক্তদের মনে তাদের কোন যথার্থ মর্যাদা থাকতে পারে না। এসব দিক সামনে রাখলে এ কথা সহজে অনুধাবন করা যায় যে, আল্লাহর প্রতি নির্ভেজাল আনুগত্যের একটি সুগভীর মূল্যবোধ তাদের অন্তরের অন্তস্থলে বিরাজিত ছিল। কিন্তু একদিকে অন্ধ রক্ষণশীলতা তাকে দমিয়ে রেখেছিল এবং অন্যদিকে কুরাইশ পুরোহিতরা এর বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ উদ্দীপিত করে তুলছিল। কারণ তারা আশংকা করছিল দেবতাদের প্রতি ভক্তি–শ্রদ্ধা খতম হয়ে গেলে আরবে তাদের যে কেন্দ্রীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তা

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

তবে তারা ছাড়া যারা (ঐসব গোনাহের পর) তাওবা করেছে এবং ঈমান এনে সৎকাজ করতে থেকেছে।[৮৬] *এ ধরনের লোকদের অসৎ কাজগুলোকে আল্লাহ সৎকাজের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন*[৮৭] *এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।*

খতম হয়ে যাবে এবং তাদের অর্থোপার্জনও বাধাগ্রস্ত হবে। এসব উপাদানের ভিত্তিতে যে মুশরিকী ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল তা তাওহীদের দাওয়াতের মোকাবিলায় কোন গুরুত্ব ও মর্যাদা সহকারে দাঁড়াতে পারতো না। তাই কুরআন নিজেই মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে উদাত্ত কন্ঠে বলেছে ঃ তোমাদের সমাজে যেসব কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, তারা শির্‌কমুক্ত এবং নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এদিক থেকে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বকে মুশরিকরা মুখে মেনে নিতে না চাইলেও মনে মনে তারা এর ভারীত্ব অনুভব করতো।

৮৫. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এ শাস্তির ধারা খতম হবে না বরং একের পর এক জারী থাকবে। দুই, যে ব্যক্তি কুফরী, শিরক বা নাস্তিক্যবাদের সাথে হত্যা ও অন্যান্য গোনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে যাবে সে বিদ্রোহের শাস্তি আলাদাভাবে ভোগ করবে এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে আলাদা আলাদাভাবে। তার ছোট বড় প্রত্যেকটি অপরাধ শুমার করা হবে। কোন একটি ভুলও ক্ষমা করা হবে না। হত্যার জন্য একটি শাস্তি দেয়া হবে না বরং হত্যার প্রত্যেকটি কর্মের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি দেয়া হবে। যিনার শাস্তিও একবার হবে না বরং যতবারই সে এ অপরাধটি করবে প্রত্যেকবারের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি পাবে। তার অন্যান্য অপরাধ ও গোনাহের শাস্তিও এ রকমই হবে।

৮৬. যারা ইতিপূর্বে নানা ধরনের অপরাধ করেছে এবং এখন সংশোধন প্রয়াসী হয়েছে তাদের জন্য এটি একটি সুসংবাদ। এটি ছিল সাধারণ ক্ষমার (General Amnesty) একটি ঘোষণা। এ ঘোষণাটিই সেকালের বিকৃত সমাজের লাখো লাখো লোককে স্থায়ী বিকৃতি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। এটিই তাদেরকে আশার আলো দেখায় এবং অবস্থা সংশোধনে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যথায় যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমরা যে পাপ করেছো তার শাস্তি থেকে এখন কোন প্রকারেই নিষ্কৃতি পেতে পারো না, তাহলে এটি তাদেরকে হতাশ করে চিরকালের জন্য পাপ সাগরে ডুবিয়ে দিতো এবং তাদের সংশোধনের আর কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। অপরাধীকে একমাত্র ক্ষমার আশাই অপরাধের শৃংখল থেকে মুক্ত করতে পারে। নিরাশ হবার পর সে ইবলীসে পরিণত হয়। তাওবার এ নিয়ামতটি আরবের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট লোকদেরকে কিভাবে সঠিক পথে এনেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে তা অনুমান করা

যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইবনে জারীর ও তাবারানী এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, একদিন আমি মসজিদে নববী থেকে এশার নামায পড়ে ফিরছি এমন সময় দেখি এক ভদ্রমহিলা আমার দরজায় দাঁড়িয়ে। আমি তাকে সালাম দিয়ে আমার কামরায় চলে গেলাম এবং দরজা বন্ধ করে নফল নামায পড়তে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর সে দরজার কড়া নাড়লো। আমি উঠে দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কি চাও? সে বলতে লাগলো, আমি আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করতে এসেছি। আমি যিনা করেছি। আমার পেটে অবৈধ সন্তান ছিল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে আমি তাকে মেরে ফেলেছি। এখন আমি জানতে চাই আমার গোনাহ মাফ হবার কোন পথ আছে কি না? আমি বললাম, না কোনক্রমেই মাফ হবে না। সে বড়ই আক্ষেপ সহকারে হা–হুতাশ করতে করতে চলে গেলো। সে বলতে থাকলো ঃ "হায়! এ সৌন্দর্য আগুনের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল।" সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে নামায শেষ করার পর আমি তাঁকে রাতের ঘটনা শুনালাম। তিনি বললেন ঃ আবু হুরাইরা, তুমি বড়ই ভুল জবাব দিয়েছো। তুমি কি কুরআনে এ আয়াত পড়নি–

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ .... اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ

وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا (الفرقان : ٦٨–٧٠)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ জবাব শুনে আমি সংগে সংগেই বের হয়ে পড়লাম। মহিলাটিকে খুঁজতে লাগলাম। রাতে এশার সময়ই তাকে পেলাম। আমি তাকে সুখবর দিলাম। তাকে বললাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার প্রশ্নের এ জওয়াব দিয়েছেন। শোনার সাথেসাথেই সে সিজদানত হলো এবং বলতে থাকলো, সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমার জন্য ক্ষমার দরজা খুলে দিয়েছেন। তারপর সে গোনাহ থেকে তাওবা করলো এবং নিজের বাঁদীকে তার পুত্রসহ মুক্ত করে দিল। হাদীসে প্রায় একই ধরনের অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেটি একটি বৃদ্ধের ঘটনা। তিনি এসে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে আরজ করছিলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! সারা জীবন গোনাহের মধ্যে কেটে গেলো। এমন কোনো গোনাহ নেই যা করিনি। নিজের গোনাহ যদি দুনিয়ার সমস্ত লোকদের মধ্যে ভাগ করে দেই তাহলে সবাইকে গোনাহের সাগরে ডুবিয়ে দেবে। এখনো কি আমার ক্ষমার কোন পথ আছে? জবাব দিলেন ঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছো? বৃদ্ধ বললেন ঃ আমি সাক্ষ দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রসূল। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ যাও, আল্লাহ গোনাহ মাফ করবেন এবং তোমার গোনাহগুলোকে নেকীতে পরিণত করে দেবেন। বৃদ্ধ বললেন ঃ আমার সমস্ত অপরাধ ও পাপ কি ক্ষমা করবেন? জবাব দিলেন ঃ হাঁ, তোমার সমস্ত অপরাধ ও পাপ ক্ষমা করে দেবেন। (ইবনে কাসীর, ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে)

৮৭. এর দু'টি অর্থ হয়। এক, যখন তারা তাওবা করবে তখন ইতিপূর্বে কুফরী জীবনে তারা যে সমস্ত খারাপ কাজ করতো তার জায়গায় এখন ঈমান আনুগত্যের জীবনে মহান আল্লাহ তাদের সৎকাজ করার সুযোগ দেবেন এবং তারা সৎকাজ করতে থাকবে। ফলে সৎকাজ তাদের অসৎ কাজের জায়গা দখল করে নেবে। দুই, তাওবার ফলে কেবল তাদের আমলনামা থেকে তারা কুফরী ও গোনাহগারির জীবনে যেসব অপরাধ করেছিল সেগুলো

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

যে ব্যক্তি তাওবা করে সৎকাজের পথ অবলম্বন করে, সে তো আল্লাহর দিকে ফিরে আসার মতই ফিরে আসে।[৮৮] *—(আর রহমানের বান্দা হচ্ছে তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না*[৮৯] *এবং কোন বাজে জিনিসের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকলে ভদ্রলোকের মতো অতিক্রম করে যায়।*[৯০] *তাদের যদি তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয়া হয় তাহলে তারা তার প্রতি অন্ধ বধির হয়ে থাকে না।*[৯১]

কেটে দেয়া হবে না বরং তার পরিবর্তে প্রত্যেকের আমলনামায় এ নেকী লেখা হবে যে, এ হচ্ছে সেই বান্দা যে বিদ্রোহ ও নাফরমানির পথ পরিহার করে আনুগত্য ও হুকুম মেনে চলার পথ অবলম্বন করেছে। তারপর যতবারই সে নিজের পূর্ববর্তী জীবনের খারাপ কাজগুলো স্মরণ করে লজ্জিত হয়ে থাকবে এবং নিজের প্রভূ রব্বুল আলামীনের কাছে তাওবা করে থাকবে ততটাই নেকী তার ভাগে লিখে দেয়া হবে। কারণ ভুলের জন্য লজ্জিত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়াই একটি নেকীর কাজ। এভাবে তার আমলনামায় পূর্বেকার সমস্ত পাপের জায়গা দখল করে নেবে পরবর্তীকালের নেকীসমূহ এবং কেবলমাত্র শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার মধ্যেই তার পরিণাম সীমিত থাকবে না বরং উল্টো তাকে পুরস্কৃতও করা হবে।

৮৮. অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে তাঁর দরবারই বান্দার আসল ফিরে আসার জায়গা এবং নৈতিক দিক দিয়েও তাঁর দরবারই এমন একটি জায়গা যেদিকে তার ফিরে আসা উচিত। আবার ফলাফলের দিক দিয়েও তাঁর দরবারের দিকে ফিরে আসা লাভজনক। নয়তো দ্বিতীয় এমন কোন জায়গা নেই যেখানে এসে মানুষ শাস্তি থেকে বাঁচতে অথবা পুরস্কার পেতে পারে। এছাড়া এর অর্থ এও হয় যে, সে এমন একটি দরবারের দিকে ফিরে যায় যেখানে সত্যি ফিরে যাওয়া যেতে পারে, যেটি সর্বোত্তম দরবার, সমস্ত কল্যাণ যেখান থেকে উৎসারিত হয়, যেখান থেকে লজ্জিত অপরাধীকে খেদিয়ে দেওয়া হয় না বরং ক্ষমা ও পুরস্কৃত করা হয়, যেখানে ক্ষমা প্রার্থনাকারীর অপরাধ গণনা করা হয় না বরং দেখা হয় সে তাওবা করে নিজের কতটুকু সংশোধন করে নিয়েছে এবং যেখানে বান্দা এমন প্রভুর সাক্ষাত পায় যিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য উঠেপড়ে লাগেন না বরং নিজের লজ্জাবনত গোলামের জন্য রহমতের দরজা খুলে দেন।

৮৯. এরও দু'টি অর্থ হয়। এক, তারা কোন মিথ্যা সাক্ষ দেয় না এবং এমন কোন জিনিসকে প্রকৃত ঘটনা ও সত্য হিসেবে গণ্য করে না যাকে প্রকৃত ঘটনা ও সত্য বলে তারা জানে না। অথবা তারা যাকে প্রকৃত ঘটনা ও সত্যের বিরোধী ও বিপরীত বলে নিশ্চিতভাবে

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (৭৪) أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَٰمًا (৭৫) خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (৭৬) قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (৭৭)

তারা প্রার্থনা করে থাকে, " হে আমাদের রব! আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের ও নিজেদের সন্তানদেরকে নয়ন শীতলকারী বানাও[৯২] এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকীদের ইমাম।[৯৩]—এরাই নিজেদের সবরের[৯৪] ফল উন্নত মনজিলের আকারে পাবে।[৯৫] অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। কী চমৎকার সেই আশ্রয় এবং সেই আবাস!

হে মুহাম্মাদ! লোকদের বলো, "আমার রবের তোমাদের কি প্রয়োজন, যদি তোমরা তাঁকে না ডাকো।[৯৬] এখন যে তোমরা মিথ্যা আরোপ করেছো, শিগ্‌গীর এমন শাস্তি পাবে যে, তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হবে না।"

জানে। দুই, তারা মিথ্যা প্রত্যক্ষ করে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিথ্যাচার দেখে না এবং তা দেখার সংকল্প করে না। এ দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে মিথ্যা শব্দটি বাতিল ও অকল্যাণের সমার্থক। খারাপ কাজের গায়ে শয়তান যে বাহ্যিক স্বাদ চাকচিক্য ও লাভের প্রলেপ লাগিয়ে রেখেছে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই মানুষ সেদিকে যায়। এ প্রলেপ অপসৃত হলে প্রত্যেকটি অসৎ কাজ মিথ্যা ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ দেখা যায়। এ ধরনের মিথ্যার জন্য মানুষ কখনো প্রাণপাত করতে পারে না। কাজেই প্রত্যেকটি বাতিল, গোনাহ ও খারাপ কাজ এদিক দিয়ে মিথ্যা যে, তা মিথ্যা চাকচিক্যের কারণে মানুষকে নিজের দিকে টেনে নেয়। মু'মিন যেহেতু সত্যের পরিচয় লাভ করে তাই এ মিথ্যা যতই হৃদয়গ্রাহী যুক্তি অথবা দৃষ্টিনন্দন শিল্পকারিতা কিংবা শ্রুতিমধুর সুকণ্ঠের পোশাক পরিহিত হয়ে আসুক না কেন এসব যে তার নকল রূপ, তা সে চিনে ফেলে।

৯০. এখানে মূলে لغو শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উপরে যে মিথ্যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে لغو শব্দটি তার ওপরও প্রযুক্ত হয় এবং এই সংগে সমস্ত অর্থহীন, আজেবাজে ফালতু কথাবার্তা ও কাজও এর অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা জেনে শুনে এ ধরনের কথা ও কাজ দেখতে বা শুনতে অথবা তাতে অংশ গ্রহণ করতে যায় না। আর যদি কখনো তাদের পথে এমন কোন জিনিস এসে যায়, তাহলে

তার প্রতি একটা উড়ো নজর না দিয়েও তারা এভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে যেমন একজন অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি কোন ময়লার স্তূপ অতিক্রম করে চলে যায়। ময়লা ও পচা দুর্গন্ধের ব্যাপারে একজন কুরুচিসম্পন্ন ও নোংরা ব্যক্তিই আগ্রহ পোষণ করতে পারে কিন্তু একজন সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক বাধ্যতামূলক পরিস্থিতির শিকার হওয়া ছাড়া কখনো তার ধারে কাছে যাওয়াও বরদাশত করতে পারে না। দুর্গন্ধের স্তূপের কাছে বসে আনন্দ পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল মু'মিনূন ৪ টীকা।)

৯১. মূল শব্দগুলো হচ্ছে لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا এর শাব্দিক তরজমা হচ্ছে, "তারা তার ওপর অন্ধ ও বোবা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। কিন্তু এখানে "ঝাঁপিয়ে পড়া" আভিধানিক অর্থে নয় বরং পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আমরা কথায় বলি, "জিহাদের হুকুম শুনে বসে রইলো।" এখানে বসে থাকা শব্দটি আভিধানিক অর্থে নয় বরং জিহাদের জন্য না ওঠা ও নড়চড়া না করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তারা এমন লোক নয় যারা আল্লাহর আয়াত শুনে একটুও নড়ে না বরং তারা তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোতে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা সেগুলো মেনে চলে। যেটি ফরয করা হয়েছে তা অবশ্য পালন করে। যে কাজের নিন্দা করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকে। যে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে তার কল্পনা করতেই তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে।

৯২. অর্থাৎ তাদেরকে ঈমান ও সৎকাজের তাওফীক দান করো এবং পবিত্র–পরিচ্ছন্ন চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী করো কারণ একজন মু'মিন তার স্ত্রী ও সন্তানদের দৈহিক সৌন্দর্য ও আয়েশ–আরাম থেকে নয় বরং সদাচার ও সচ্চরিত্রতা থেকেই মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। দুনিয়ায় যারা তার সবচেয়ে প্রিয় তাদেরকে দোজখের ইন্ধনে পরিণত হতে দেখার চাইতে বেশী কষ্টকর জিনিস তার কাছে আর কিছুই নেই। এ অবস্থায় স্ত্রীর সৌন্দর্য ও সন্তানদের যৌবন ও প্রতিভা তার জন্য আরো বেশী মর্মজ্বালার কারণ হবে। কারণ সে সব সময় এ মর্মে দুঃখ করতে থাকবে যে, এরা সবাই নিজেদের এসব যোগ্যতা ও গুণাবলী সত্ত্বেও আল্লাহর আযাবের শিকার হবে।

এখানে বিশেষ করে এ বিষয়টি দৃষ্টিসমক্ষে রাখা উচিত যে, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখন মক্কার মুসলমানদের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না যার প্রিয়তম আত্মীয় কুফরী ও জাহেলিয়াতের মধ্যে অবস্থান করছিল না। কোন স্বামী ঈমান এনে থাকলে তার স্ত্রী তখনো কাফের ছিল। কোন স্ত্রী ঈমান এনে থাকলে তার স্বামী তখনো কাফের ছিল। কোন যুবক ঈমান এনে থাকলে তার মা–বাপ, ভাই, বোন সবাই তখনো কাফের ছিল। আর কোন বাপ ঈমান এনে থাকলে তখনো তার যুবক পুত্ররা কুফরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ অবস্থায় প্রত্যেকটি মুসলমান একটি কঠিন আত্মিক যন্ত্রণা ভোগ করছিল এবং তার অন্তর থেকে যে দোয়া বের হচ্ছিল তার সর্বোত্তম প্রকাশ এ আয়াতে করা হয়েছে। "চোখের শীতলতা" শব্দ দু'টি এমন একটি অবস্থার চিত্র অংকন করেছে যা থেকে বুঝা যায়, নিজের প্রিয়জনদেরকে কুফরী ও জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখে এক ব্যক্তি

এতই কষ্ট অনুভব করছে যেন তার চোখ ব্যথায় টনটন করছে এবং সেখানে খচখচ করে কাঁটার মতো বিঁধছে। দীনের প্রতি তারা যে ঈমান এনেছে তা যে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারেই এনেছে—একথাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের অবস্থা এমন লোকদের মতো নয় যাদের পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন ধর্মীয় দল ও উপদলে যোগ দেয় এবং সব ব্যাংকে আমাদের কিছু না কিছু পুঁজি আছে এই ভেবে সবাই নিশ্চিন্ত থাকে।

৯৩. অর্থাৎ তাকওয়া-আল্লাহভীতি ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে আমরা সবার চেয়ে এগিয়ে যাবো। কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতার ক্ষেত্রে সবার অগ্রগামী হবো। নিছক সৎকর্মশীলই হবো না বরং সৎকর্মশীলদের নেতা হবো এবং আমাদের বদৌলতে সারা দুনিয়ায় কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতা প্রসারিত হবে। একথার মর্মার্থ এই যে, এরা এমন লোক যারা ধন-দৌলত ও গৌরব-মাহাত্মের ক্ষেত্রে নয় বরং আল্লাহভীতি ও সৎকর্মশীলতার ক্ষেত্রে পরস্পরের অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের যুগে কিছু লোক এ আয়াতটিকেও নেতৃত্ব লাভের জন্য প্রার্থী হওয়া ও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের জন্য অগ্রবর্তী হওয়ার বৈধতার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাদের মতে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, " হে আল্লাহ! মুত্তাকীদেরকে আমাদের প্রজা এবং আমাদেরকে তাদের শাসকে পরিণত করো।" বস্তুত, ক্ষমতা ও পদের প্রার্থীরা ছাড়া আর কারো কাছে এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রশংসনীয় হতে পারে না।

৯৪. সবর শব্দটি এখানে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সত্যের শত্রুদের জুলুম-নির্যাতনের মোকাবিলা সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সাথে করা। সত্য দীনকে প্রতিষ্ঠিত ও তার মর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে সব ধরনের বিপদ-আপদ ও কষ্ট বরদাশত করা। সব রকমের ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবিলায় সঠিক পথে দৃঢ়পদ থাকা। শয়তানের সমস্ত প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির যাবতীয় কামনা সত্ত্বেও কর্তব্য সম্পাদন করা। হারাম থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করা। গোনাহের যাবতীয় স্বাদ ও লাভ প্রত্যাখ্যান করা এবং সৎকাজ ও সঠিক পথে অবস্থানের প্রত্যেকটি ক্ষতি ও তার বদৌলতে অর্জিত প্রতিটি বঞ্চনা মেনে নেওয়া। মোটকথা এ একটি শব্দের মধ্যে দীন এবং দীনী মনোভাব, কর্মনীতি ও নৈতিকতার একটি বিশাল জগত আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

৯৫. মূলে غُرْفَة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে উঁচু দালান। সাধারণত এর অনুবাদে "বালাখানা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এ থেকে একতলা বা দোতলা কক্ষের ধারণা মনের পাতায় ভেসে ওঠে। অথচ সত্য বলতে কি দুনিয়ায় মানুষ যতই বৃহদাকার ও উচ্চতম ইমারত তৈরি করুক না কেন এমন কি মানুষের অবচেতন মনে জান্নাতের ইমারতের যেসব নক্শা সংরক্ষিত আছে ভারতের তাজমহল ও আমেরিকার আকাশচুম্বী ইমারতগুলো (sky-scrapers)ও তার কাছে নিছক কতিপয় কদাকার কাঠামো ছাড়া আর কিছুই নয়।

৯৬. অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা না করো, তার ইবাদাত না করো এবং নিজেদের প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য তাঁকে সাহায্যের জন্য না ডাকো, তাহলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের কোন গুরুত্বই নেই। এ কারণে তিনি নগণ্য তৃণখণ্ডের সমানও তোমাদের পরোয়া করবেন না। নিছক সৃষ্টি হবার দিক দিয়ে তোমাদের ও পাথরের মধ্যে

কোন ফারাক নেই। আল্লাহর কোন প্রয়োজন পূরণ করতে হলে তোমাদের ওপর নির্ভর করতে হয় না। তোমরা বন্দেগী না করলে তাঁর কোন কাজ ব্যাহত হবে না। তোমাদের তাঁর সামনে হাত পাতা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করাই তাঁর দৃষ্টিকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করে। এ কাজ না করলে তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে ময়লা আবর্জনার মতো।

আশ্ শু'আরা

২৬

নামকরণ

২২৪ আয়াতের وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ থেকে সূরার নামটি গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে বুঝা যাচ্ছে এবং হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে যে, এ সূরাটির নাযিলের সময়-কাল হচ্ছে মক্কার মধ্যবর্তীকালীন যুগ। ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনামতে প্রথমে সূরা তা–হা নাযিল হয়, তারপর ওয়াকি'আহ এবং এরপর সূরা আশ্ শু'আরা। (রূহুল মাআনী, ১৯ খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা) আর সূরা তা–হা সম্পর্কে জানা আছে, এটি হযরত উমরের (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

ভাষণের পটভূমি হচ্ছে, মক্কার কাফেররা লাগাতার অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের মোকাবিলা করছিল। এ জন্য তারা বিভিন্ন রকমের বাহানাবাজীর আশ্রয় নিচ্ছিল। কখনো বলতো, তুমি তো আমাদের কোন চিহ্ন দেখালে না, তাহলে আমরা কেমন করে তোমাকে নবী বলে মেনে নেবো। কখনো তাঁকে কবি ও গণক আখ্যা দিয়ে তাঁর শিক্ষা ও উপদেশাবলীকে কথার মারপ্যাঁচে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতো। আবার কখনো তাঁর মিশনকে হালকা ও গুরুত্বহীন করে দেবার জন্য বলতো, কয়েকজন মূর্খ ও অর্বাচীন যুবক অথবা সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক তাঁর অনুসারী হয়েছে, অথচ এ শিক্ষা যদি তেমন প্রেরণাদায়ক ও প্রাণপ্রবাহে পূর্ণ হতো তাহলে জাতির শ্রেষ্ঠ লোকেরা, পণ্ডিত, জ্ঞানী–গুণী ও সরদাররা একে গ্রহণ করে নিতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে তাদের আকীদা–বিশ্বাসের ভ্রান্তি এবং তাওহীদ ও আখেরাতের সত্যতা বুঝাবার চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু তারা হঠকারিতার নিত্য নতুন পথ অবলম্বন করতে কখনোই ক্লান্ত হতো না। এ জিনিসটি রসূলুল্লাহর (সা) জন্য অসহ্য মর্মযাতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এ দুঃখে তিনি চরম মানসিক পীড়ন অনুভব করছিলেন।

এহেন অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয়। বক্তব্যের সূচনা এভাবে হয় ঃ তুমি এদের জন্য ভাবতে ভাবতে নিজের প্রাণ শক্তি ধ্বংস করে দিচ্ছো কেন? এরা কোন নিদর্শন দেখেনি,

এটাই এদের ঈমান না আনার কারণ নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে, এরা একগুয়ে ও হঠকারী। এরা বুঝালেও বুঝে না। এরা এমন কোন নিদর্শনের প্রত্যাশী, যা জোরপূর্বক এদের মাথা নুইয়ে দেবে। আর এ নিদর্শন যথাসময়ে যখন এসে যাবে তখন তারা নিজেরাই জানতে পারবে, যে কথা তাদেরকে বুঝানো হচ্ছিল তা একেবারেই সঠিক ও সত্য ছিল। এ ভূমিকার পর দশ রুকূ' পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, সত্য প্রত্যাশীদের জন্য আল্লাহর দুনিয়ায় সর্বত্র নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলো দেখে তারা সত্যকে চিনতে পারে। কিন্তু হঠকারীরা কখনো বিশ্ব-জগতের নিদর্শনাদি এবং নবীদের মু'জিযাসমূহ তথা কোন জিনিস দেখেও ঈমান আনেনি। যতক্ষণ না আল্লাহর আযাব এসে তাদরেকে পাকড়াও করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের গোমরাহীর ওপর অবিচল থেকেছে। এ সম্বন্ধের প্রেক্ষিতে এখানে ইতিহাসের সাতটি জাতির অবস্থা পেশ করা হয়েছে। মক্কার কাফেররা এ সময় যে হঠকারী নীতি অবলম্বন করে চলছিল ইতিহাসের এ সাতটি জাতিও সেকালে সেই একই নীতির আশ্রয় নিয়েছিল। এ ঐতিহাসিক বর্ণনার আওতাধীনে কতিপয় কথা মানস পটে অংকিত করে দেয়া হয়েছে।

এক ঃ নিদর্শন দু' ধরনের। এক ধরনের নিদর্শন আল্লাহর যমীনে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলো দেখে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি নবী যে জিনিসের দিকে আহবান জানাচ্ছেন সেটি সত্য হতে পারে কিনা সে সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে পারে। দ্বিতীয় ধরনের নিদর্শন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় দেখেছে, নূহের সম্প্রদায় দেখেছে, আদ ও সামূদ দেখেছে, লূতের সম্প্রদায় ও আইকাবাসীরাও দেখেছে। এখন কাফেররা কোন্ ধরনের নিদর্শন দেখতে চায় এটা তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের ব্যাপার।

দুই ঃ সকল যুগে কাফেরদের মনোভাব একই রকম ছিল। তাদের যুক্তি ছিল একই প্রকার। তাদের আপত্তি ছিল একই। ঈমান না আনার জন্য তারা একই বাহানাবাজীর আশ্রয় নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা একই পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক নবীর শিক্ষা একই ছিল। তাদের চরিত্র ও জীবননীতি একই রঙে রঞ্জিত ছিল। নিজেদের বিরোধীদের মোকাবিলায় তাঁদের যুক্তি-প্রমাণের ধরন ছিল একই। আর তাঁদের সবার সাথে আল্লাহর রহমতও ছিল একই ধরনের। এ দু'টি আদর্শের উপস্থিতি ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। কাফেররা নিজেরাই দেখতে পারে তাদের নিজেদের কোন্ ধরনের ছবি পাওয়া যায় এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিসত্তায় কোন্ ধরনের আদর্শের নিদর্শন পাওয়া যায়।

তৃতীয় যে কথাটির বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে সেটি হচ্ছে আল্লাহ একদিকে যেমন অজেয় শক্তি, পরাক্রম ও ক্ষমতার অধিকারী অপরদিকে তেমনি পরম করুণাময়ও। ইতিহাসে একদিকে রয়েছে তাঁর ক্রোধের দৃষ্টান্ত এবং অন্যদিকে রহমতেরও। এখন লোকদের নিজেদেরকেই এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা নিজেদের তাঁর রহমতের যোগ্য বানাবে না ক্রোধের।

শেষ রুকূ'তে এ আলোচনাটির উপসংহার টানতে গিয়ে বলা হয়েছে, তোমরা যদি নিদর্শনই দেখতে চাও, তাহলে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো যেসব ভয়াবহ নিদর্শন দেখেছিল সেগুলো দেখতে চাও কেন? এ কুরআনকে দেখো। এটি তোমাদের নিজেদের ভাষায় রয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখো। তাঁর সাথীদেরকে দেখো।

এটি কি কোন শয়তান বা জিনের বাণী হতে পারে? এ বাণীর উপস্থাপককে কি তোমাদের গণৎকার বলে মনে হচ্ছে? মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদেরকে কি তোমরা কবি ও তাদের সহযোগী ও সমমনারা যেমন হয় তেমনি ধরনের দেখেছো? জিদ ও হঠকারিতার কথা আলাদা। কিন্তু নিজেদের অন্তরের অন্তস্থলে উঁকি দিয়ে দেখো সেখানে কি এর সমর্থন পাওয়া যায়? যদি মনে মনে তোমরা নিজেরাই জানো গণকবৃত্তি ও কাব্যচর্চার সাথে তাঁর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই, তাহলে এই সাথে একথাও জেনে নাও, তোমরা জুলুম করছো, কাজেই জালেমের পরিণামই তোমাদের ভোগ করতে হবে।

طٰسٓمٓ ۝١ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝٣ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ۝٤

তা–সীন–মীম। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।[১] *হে মুহাম্মাদ! এ লোকেরা ঈমান আনছে না বলে তুমি যেন দুঃখে নিজের প্রাণ বিনষ্ট করে দিতে বসেছ।*[২] *আমি চাইলে আকাশ থেকে এমন নিদর্শন অবতীর্ণ করতে পারতাম যার ফলে তাদের ঘাড় তার সামনে নত হয়ে যেতো।*[৩]

১. অর্থাৎ এ সূরার যে আয়াতগুলো পেশ করা হচ্ছে এগুলো এমন একটি কিতাবের আয়াত যা তার বক্তব্য পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করেছে। এগুলো পড়ে বা শুনে যে কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে এগুলো কোন্ জিনিসের দিকে আহবান জানাচ্ছে, কোন্ জিনিস থেকে বিরত রাখছে, কাকে সত্য বলছে এবং কাকে মিথ্যা গণ্য করছে। মেনে নেয়া বা না মেনে নেয়া আলাদা কথা কিন্তু এর শিক্ষা বুঝা যায়নি এবং এ কিতাব কি ত্যাগ করার এবং কি গ্রহণ করার আহবান জানাচ্ছে এ থেকে তা জানতেই পারা যায়নি এমন কথা বলার অবকাশ কোন ব্যক্তির নেই।

কুরআনকে "আল কিতাবুল মুবীন" বা সুস্পষ্ট কিতাব বলার আরো একটি অর্থও আছে। সেটি হচ্ছে, এটি যে আল্লাহর কিতাব সে ব্যাপারটি সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত। এর ভাষা, বর্ণনা, বিষয়বস্তু এবং এর উপস্থাপিত সত্য ও এর নাযিল হবার অবস্থা সবকিছু পরিষ্কার বলে দিচ্ছে—এটি বিশ্ব–জগতের প্রভুরই কিতাব। এদিক দিয়ে বিচার করলে এ কিতাবের প্রত্যেকটি বাক্যই একটি নিদর্শন ও মু'জিযা। কোন ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি–বিবেক ব্যবহার করলে তার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য পৃথক কোন নিদর্শনের প্রয়োজনই হয় না। সুস্পষ্ট কিতাবের এ "আয়াত" তথা নিদর্শন তাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য যথেষ্ট।

সামনের দিকে এ সূরায় যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে এ ছোট্ট প্রারম্ভিক বাক্যটি নিজের দ্বিবিধ অর্থের দৃষ্টিতে তার সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক রাখে। মক্কার কাফেররা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মু'জিযার দাবী জানাচ্ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, এ মু'জিযা দেখে তিনি যে সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পয়গাম এনেছেন সে ব্যাপারে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবে। বলা হয়েছে, সত্যিই যদি ঈমান আনার জন্য কেউ নিদর্শনের দাবী করে থাকে, তাহলে তো "কিতাবুল মুবীন" তথা সুস্পষ্ট কিতাবের এ আয়াতগুলোই সে জন্য যথেষ্ট। অনুরূপভাবে কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে দোষারোপ করতো এ মর্মে যে, তিনি কবি বা গণক। বলা হয়েছে, এ কিতাবটি তো কোন হেঁয়ালী বা ধাঁধা নয়। কিতাবটি পরিষ্কারভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজের শিক্ষা পেশ করছে। নিজেই দেখে নাও, এ শিক্ষা কি কোন কবি বা গণকের হতে পারে? (তারা তো সচরাচর হেঁয়ালীপূর্ণ কথা বলতে অভ্যস্ত)

২. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা কাহ্ফে বলা হয়েছেঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا

"এরা এ শিক্ষার প্রতি ঈমান না আনলে সম্ভবত তুমি এদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে ও আক্ষেপ করতে করতে মারা যাবে।" (৬ আয়াত)

আবার সূরা ফাতের–এ বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ "তাদের অবস্থার প্রতি দুঃখ ও আক্ষেপ করে যেন তোমার প্রাণ ধ্বংস না হয়ে যায়।" (৮ আয়াত) এ থেকে সে যুগে নিজের জাতির পথভ্রষ্টতা, তার নৈতিক অবক্ষয় ও গোয়ার্তুমি শুধরানোর জন্য তাঁর সকল প্রচেষ্টার প্রবল বিরোধিতা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন হৃদয়বিদারক ও কষ্টকর অবস্থায় তাঁর দিবারাত্র অতিবাহিত করতেন তা আন্দাজ করা যায়। بخع শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, পুরোপুরি জবেহ করা। بَاخِعٌ نَّفْسَكَ এর আভিধানিক অর্থ হয়, তুমি নিজেই নিজেকে হত্যা করে ফেলছো।

৩. অর্থাৎ এমন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা যার ফলে সমগ্র কাফেরকুল ঈমান ও আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়, এটা আল্লাহর জন্য কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না। যদি তিনি এমনটি না করে থাকেন তাহলে তার কারণ এ নয় যে, এ কাজটি তাঁর শক্তির বাইরে বরং এর কারণ হচ্ছে, এভাবে জোরপূর্বক ঈমান আদায় করে নিতে তিনি চান না। তিনি চান লোকেরা বুদ্ধি–বিবেক ব্যবহার করে এমন সব আয়াতের মাধ্যমে সত্যকে চিনে নিক, যেগুলো আল্লাহর কিতাবে পেশ করা হয়েছে, যেগুলো সমগ্র বিশ্ব জগতে চারদিকে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে রয়েছে এবং যেগুলো তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেই বিরাজিত রয়েছে। তারপর যখন তাদের অন্তর এ মর্মে সাক্ষ দেবে যে, নবীগণ যা পেশ করেছেন তাই যথার্থ সত্য এবং তার বিরুদ্ধে যেসব আকীদা–বিশ্বাস ও পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে তা মিথ্যা, তখন তারা জেনে বুঝে মিথ্যা ত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ করবে। আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে এ স্বেচ্ছাকৃত ঈমান, মিথ্যা পরিহার ও সত্য অনুসৃতিই চান। এ জন্য তিনি মানুষকে ইচ্ছা ও সংকল্পের স্বাধীনতা দান করেছেন। এ জন্যই তিনি মানুষকে সঠিক–বেঠিক যে পথেই সে যেতে চায় সে পথে চলার স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ জন্যই তিনি মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় প্রবণতাই রেখে দিয়েছেন। অশ্লীলতা ও তাকওয়া উভয় পথই তার সামনে খুলে দিয়েছেন। শয়তানকে পথভ্রষ্ট করার স্বাধীনতা দান করেছেন।

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۝٥

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝٦

তাদের কাছে দয়াময়ের পক্ষ থেকে যে নতুন নসীহতই আসে, তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। এখন যখন তারা মিথ্যা আরোপ করেছে, তখন তারা যে জিনিসের প্রতি বিদ্রূপ করে চলেছে, অচিরেই তার প্রকৃত স্বরূপ (বিভিন্ন পদ্ধতিতে) তারা অবগত হবে।[৪]

সঠিক পথ দেখাবার জন্য নবুওয়াত, অহী ও কল্যাণের প্রতি আহবানের ধারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পথ বাছাই করে নেবার জন্য মানুষকে সময়োপযোগী যাবতীয় যোগ্যতা দিয়ে তাকে পরীক্ষার স্থলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন—সে চাইলে কুফরী ও ফাসেকীর পথ অথবা ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করতে পারে। যদি আল্লাহ এমন কোন কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যা মানুষকে ঈমান আনতে ও আনুগত্য করতে বাধ্য করে দেয়, তাহলে এ পরীক্ষার সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। বাধ্যতামূলক ঈমানই যদি কাংখিত হতো, তাহলে নিদর্শন অবতীর্ণ করার কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ মানুষকে এমন প্রকৃতি ও কাঠামোয় সৃষ্টি করতে পারতেন যেখানে কুফরী, নাফরমানী ও অসৎকর্মের কোন সম্ভাবনাই থাকতো না। বরং ফেরেশতাদের মতো মানুষও জন্মগত বিশ্বস্ত ও অনুগত হতো। কুরআন মজীদের বিভিন্নস্থানে এ সত্যটির প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝

"যদি তোমার রব চাইতেন, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমান আনতো। এখন তুমি কি লোকদের ঈমান আনতে বাধ্য করবে?" (ইউনুস ৯৯ আয়াত)

আরো বলা হয়েছে :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ

"যদি তোমার রব চাইতেন, তাহলে সমস্ত মানুষকে একই উম্মতে পরিণত করে দিতে পারতেন। তারা তো বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে এবং একমাত্র তারাই পথভ্রষ্ট হবে না যাদের প্রতি রয়েছে তোমার রবের অনুগ্রহ, এ জন্যই তো তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন।" (হূদ, ১১৮ ও ১১৯ আয়াত)

(আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস ১০১ ও ১০২ এবং সূরা হূদ ১১৬ টীকা)

আর তারা কি কখনো পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি? আমি কত রকমের কত বিপুল পরিমাণ উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ তার মধ্যে সৃষ্টি করেছি? নিশ্চয়ই তার মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে,[৫] কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। আর যথার্থই তোমার রব পরাক্রান্তও এবং অনুগ্রহশীলও।[৬]

৪. অর্থাৎ যাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যুক্তিসহকারে তাদেরকে কিছু বুঝাবার ও সঠিক পথ দেখাবার যে কোন চেষ্টাই করা হলে তারা প্রত্যাখ্যান ও অনাগ্রহের মাধ্যমে তার জবাব দেয়, তাদের অন্তরে জোরপূর্বক ঈমান স্থাপন করার জন্য আকাশ থেকে নিদর্শন অবতীর্ণ করে তাদের চিকিৎসা করা যায় না বরং এ ধরনের লোকদের যখন একদিকে পুরোপুরি বুঝানো হয়ে গিয়ে থাকে এবং অন্যদিকে তারা প্রত্যাখ্যানের পর্যায় অতিক্রম করে চূড়ান্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা আরোপ করতে এবং সেখান থেকেও অগ্রসর হয়ে প্রকৃত সত্যের প্রতি বিদ্রূপ করতে শুরু করে তখন তাদের অশুভ পরিণাম দেখিয়ে দেয়াই উচিত। এ অশুভ পরিণাম তাদেরকে এভাবেও দেখানো যেতে পারে যে, দুনিয়ায় যে সত্যের প্রতি তারা বিদ্রূপ করতো তাদের সকল বাধা–বিপত্তি উপেক্ষা করে তা বিজয় লাভ করবে। এ পরিণাম এভাবেও দেখানো যেতে পারে যে, তাদের ওপর একটি যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল হবে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। এ পরিণাম এভাবেও তাদের সামনে আসতে পারে যে, কয়েক বছর নিজেদের ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত থাকার পর তারা অনিবার্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে এবং অবশেষে তাদের কাছে একথা প্রমাণ হয়ে যাবে যে, যে পথে তারা নিজেদের জীবনের সমস্ত পুঁজি নিয়োগ করেছিল সেটি ছিল পুরোপুরি মিথ্যা এবং নবীগণ যে পথ পেশ করতেন এবং যার প্রতি তারা সারা জীবন ঠাট্টা–বিদ্রূপ করে এসেছে। সেটিই ছিল সত্য। এ অশুভ পরিণাম সামনে আসার যেহেতু অনেকগুলো পথ ছিল এবং বিভিন্ন লোকের সামনে তা বিভিন্ন আকারে আসতে পারে এবং চিরকালই এসেছে। তাই আয়াতে একবচনে نبأ এর পরিবর্তে বহুবচনে انباء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ যে জিনিসের প্রতি এরা বিদ্রূপ করছে তার প্রকৃত অবস্থা বিভিন্ন আকারে তারা জানতে পারবে।

৫. অর্থাৎ সত্যের অনুসন্ধানের জন্য কারো নিদর্শনের প্রয়োজন হলে তার দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। এ পৃথিবীর শ্যামল প্রকৃতির প্রতি একবার চোখ মেলে দেখুক। সে জানতে পারবে, বিশ্ব ব্যবস্থার যে স্বরূপ নবীগণ পেশ করেন (অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব) এবং মুশরিক বা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারীরা যে মতবাদ পেশ করে তার মধ্যে কোন্‌টি সঠিক। পৃথিবীর মাটিতে যেসব রকমারি জিনিস যে বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে, যেসব উপাদান

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّٰلِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾

২ রুকূ'

তাদেরকে সে সময়ের কথা শুনাও যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বলেছিলেন,[৭] "জালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও—ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে[৮]—তারা কি ভয় করে না?"[৯]

ও শক্তির বদৌলতে উৎপন্ন হচ্ছে, যেসব নিয়মের আওতায় উৎপাদিত হচ্ছে, তারপর তাদের বৈশিষ্ট ও গুণাবলীতে এবং অসংখ্য সৃষ্টির অসংখ্য প্রয়োজনের মধ্যে যে সুস্পষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান, সেসব জিনিস দেখে কেবলমাত্র একজন নির্বোধই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে যে, এসব কিছু কোন মহাকৌশলীর কৌশল, কোন জ্ঞানীর জ্ঞান, কোন শক্তিমানের শক্তি এবং কোন স্রষ্টার সৃষ্টি পরিকল্পনা ছাড়া শুধুমাত্র এমনিই আপনাআপনি হচ্ছে, অথবা কোন একজন খোদা এ সমগ্র পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা করছেন না বরং বহু খোদার কৌশল ও ব্যবস্থাপনাই পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র এবং বায়ু ও পানির মধ্যে এ সামঞ্জস্য এবং এসব উপাদান থেকে সৃষ্ট উদ্ভিদ ও বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য প্রাণীর প্রয়োজনের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে রেখেছে। একজন বিবেক-বুদ্ধিমান মানুষ, সে যদি কোন প্রকার হঠকারী ও পূর্ব-বিদ্বেষ পোষণকারী না হয়ে থাকে, তাহলে এ দৃশ্য দেখে স্বতস্ফূর্তভাবে এই বলে চিৎকার করে উঠবে, নিশ্চয়ই এগুলো আল্লাহর অস্তিত্বের এবং এক ও একক আল্লাহর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট আলামত। এসব নিদর্শন থাকতে আবার কোন্ ধরনের মু'জিযার প্রয়োজন, যা না দেখলে মানুষ তাওহীদের সত্যতায় বিশ্বাস করতে পারে না?

৬. অর্থাৎ তিনি এমন শক্তিধর যে, যদি কাউকে শাস্তি দিতে চান, তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই ধ্বংস করে দেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও শাস্তি দেবার ব্যাপারে তিনি কখনো তাড়াহুড়ো করেন না, এটা তাঁর দয়ার মূর্ত প্রকাশ। বছরের পর বছর এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ধরে ঢিল দিতে থাকেন। চিন্তা করার, বুঝার ও সামলে নেবার সুযোগ দিয়ে যেতে থাকেন। সারা জীবনের সমস্ত নাফরমানী একটিমাত্র তাওবায় মাফ করে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

৭. ভূমিকার আকারে ওপরের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর এবার ঐতিহাসিক বর্ণনার সূচনা হচ্ছে। হযরত মূসা ও ফেরাউনের কাহিনী দিয়ে এ বর্ণনার শুরু। এর মাধ্যমে বিশেষভাবে যে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য তা নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত হযরত মূসাকে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব অবস্থার মুখোমুখি ছিলেন তার তুলনায় ছিল অনেক বেশী কঠিন। হযরত মূসা ছিলেন একটি দাস জাতির সদস্য। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এ জাতিকে মারাত্মকভাবে দাবিয়ে রেখেছিল। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ছিলেন কুরাইশ সম্প্রদায়ের সদস্য। তাঁর বংশ ও পরিবার কুরাইশদের অন্যান্য বংশ ও পরিবারের সাথে পুরোপুরি সমান মর্যদায় অবস্থান করছিল। হযরত মূসা নিজেই সেই ফেরাউনের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং একটি হত্যা অভিযোগে দশ বছর আত্মগোপন করে থাকার পর তাঁকে আবার সেই বাদশাহর দরবারে গিয়ে দাঁড়াবার হুকুম দেয়া হয়েছিল যার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের কোন নাজুক অবস্থার মুখোমুখি হননি। তাছাড়া ফেরাউনের সাম্রাজ্য ছিল সে সময় দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তিশালী সাম্রাজ্য। তার সাথে কুরাইশদের শক্তির কোন তুলনাই ছিল না। এ সত্ত্বেও ফেরাউন হযরত মূসার কোন ক্ষতিই করতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে সংঘর্ষ বাধিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে আল্লাহ কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের এ শিক্ষা দিতে চান যে, আল্লাহ যার পৃষ্ঠপোষক থাকেন তার সাথে মোকাবিলা করে কেউ জিততে পারে না। ফেরাউনই যখন মূসার মোকাবিলায় কিছুই করতে পারেনি তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলায় তোমাদের জয়লাভের কথা কল্পনাই করা যায় না।

দ্বিতীয়ত হযরত মূসার মাধ্যমে ফেরাউনকে যেসব নিদর্শন দেখানো হয়েছে তার চেয়ে বেশী সুস্পষ্ট নিদর্শন আর কী হতে পারে? তারপর হাজার হাজার লোকের সমাবেশে ফেরাউনেরই চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে যাদুকরদের সাথে মোকাবিলা করে একথা প্রমাণও করে দেয়া হয়েছে যে, হযরত মূসা যাকিছু দেখাচ্ছেন তা যাদু নয়। যেসব যাদুশিল্প বিশেষজ্ঞগণ ফেরাউনের নিজের সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং যাদেরকে ফেরাউন নিজেই ডেকেছিল, তারা নিজেরাই এ সত্য স্বীকার করে নিয়েছে যে, হযরত মূসার লাঠি যে অজগরে পরিণত হয়েছিল, সে ব্যাপারটি ছিল যথার্থ ও অকৃত্রিম এবং শুধুমাত্র আল্লাহর মু'জিযার মাধ্যমেই এমনটি হতে পারে, যাদুর সাহায্যে এমনটি হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যাদুকররা ঈমান এনে এবং নিজেদের প্রাণকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশই রাখেনি যে, হযরত মূসার পেশকৃত নিদর্শন সত্যিই মু'জিযা, যাদু নয়। কিন্তু এ ব্যাপারেও যারা হঠকারিতায় লিপ্ত ছিল তারা নবীর সত্যতা স্বীকার করেনি। এখন তোমরা কেমন করে একথা বলতে পারো যে, তোমাদের ঈমান আনা আসলে কোন ইন্দ্রিয়ানুভূত মু'জিযা ও বস্তুগত নিদর্শন দেখার ওপর নির্ভরশীল? জাতীয় ও বংশগত স্বার্থ, জাহেলী বিদ্বেষ ও স্বার্থপূজার উর্ধে উঠে মানুষ খোলা মনে হক ও বাতিলের পার্থক্য অনুধাবন করে অসত্য কথা পরিহার করে সত্য ও সঠিক কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলে এ কিতাবে, এ কিতাব উপস্থাপনকারীর জীবনে এবং আল্লাহর বিশাল বিশ্ব-জগতে প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সর্বক্ষণ যেসব নিদর্শন দেখতে পারে তাই তার জন্য যথেষ্ট হয়। নয়তো এমন একজন হঠকারী ব্যক্তি যে সত্যের সন্ধান করে না এবং প্রবৃত্তির স্বার্থ পূজায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যে তার স্বার্থে আঘাত লাগে এমন কোন সত্য গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়, সে যতই নিদর্শন দেখুক না কেন তার সামনে আকাশ ও পৃথিবী উল্টে দিলেও সে ঈমান আনবে না।

তৃতীয়ত এ হঠকারিতার যে পরিণাম ফেরাউন দেখেছে তা এমন কোন পরিণাম নয় যা দেখার জন্য অন্য লোকেরা পাগল হয়ে গেছে। নিজের চোখে আল্লাহর শক্তিমত্তার নিদর্শন দেখে নেবার পর যে তা মানে না সে এমনি ধরনের পরিণতিরই সম্মুখীন হয়। এখন তোমরা কি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে এর স্বাদ আস্বাদন করা পছন্দ করছো?

قَالَ رَبِّ اِنِّیْۤ اَخَافُ اَنْ یُّكَذِّبُوْنِ ﴿۱۲﴾ وَ یَضِیْقُ صَدْرِیْ وَ لَا یَنْطَلِقُ لِسَانِیْ فَاَرْسِلْ اِلٰی هٰرُوْنَ ﴿۱۳﴾ وَ لَهُمْ عَلَیَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنِ ﴿۱۴﴾ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰیٰتِنَاۤ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿۱۵﴾

সে বললো, " হে আমার রব! আমার ভয় হয় তারা আমাকে মিথ্যা বলবে, আমার বক্ষ সংকুচিত হচ্ছে এবং আমার জিহবা সঞ্চালিত হচ্ছে না। আপনি হারুনের প্রতি রিসালাত পাঠান![১০] আর আমার বিরুদ্ধে তো তাদের একটি অভিযোগও আছে। তাই আমার আশংকা হয় তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।"[১১] আল্লাহ বললেন, "কখ্খনো না, তোমরা দু'জন যাও আমার নিদর্শনগুলো নিয়ে,[১২] আমি তোমাদের সাথে সবকিছু শুনতে থাকবো।

তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ ১০৩ থেকে ১৩৭, সূরা ইউনুস ৭৫ থেকে ৯২, সূরা বনী ইসরাঈল ১০১ থেকে ১০৪ এবং সূরা তা–হা ৯ থেকে ৭৯ আয়াত।

৮. এ বর্ণনাভংগী ফেরাউনের সম্প্রদায়ের চরম নির্যাতনের কথা প্রকাশ করছে। "জালেম সম্প্রদায়" হিসেবে তাদেরকে পরিচিত করানো হচ্ছে। যেন তাদের আসল নামই হচ্ছে জালেম সম্প্রদায় এবং ফেরাউনের সম্প্রদায় হচ্ছে তার তরজমা ও ব্যাখ্যা।

৯. অর্থাৎ হে মূসা! দেখো কেমন অদ্ভূত ব্যাপার, এরা নিজেদেরকে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করে দুনিয়ায় জুলুম–নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে এবং ওপরে আল্লাহ আছেন, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, এ ভয় তাদের নেই।

১০. সূরা তা–হা–এর ২ এবং সূরা কাসাস–এর ৪ রুকূ'তে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সেই আলোচনাগুলোকে এর সাথে মিলিয়ে দেখলে জানা যায়, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম প্রথমত এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজে একাকী যেতে ভয় পাচ্ছিলেন। (আমার বক্ষ সংকুচিত হচ্ছে বাক্যটি একথাই প্রকাশ করছে) দ্বিতীয়ত তাঁর মধ্যে এ অনুভূতি ছিল, তিনি বাকপটু নন এবং অনর্গল ও দ্রুত কথা বলার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই তিনি হযরত হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে নবী বানিয়ে তাঁর সাথে পাঠাবার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন জানান। কারণ হযরত হারুন অত্যন্ত বাকপটু, প্রয়োজনে তিনি হযরত মূসাকে সমর্থন দেবেন এবং তাঁর বক্তব্যকে সত্য প্রমাণ করে তাঁর হাত শক্তিশালী করবেন। হতে পারে, প্রথম দিকে হযরত মূসা তাঁর পরিবর্তে হযরত হারুনকে এ দায়িত্বে নিযুক্ত করার আবেদন জানান, কিন্তু পরে যখন তিনি অনুভব করেন আল্লাহ তাঁকেই নিযুক্ত করতে চান তখন আবার তাঁকে নিজের সাহায্যকারী করার আবেদন জানান। এ সন্দেহ হবার কারণ হচ্ছে, হযরত মূসা এখানে তাঁকে সাহায্যকারী করার আবেদন জানাচ্ছেন না বরং বলছেন ঃ فَاَرْسِلْ اِلٰی هٰرُوْنَ "আপনি হারুনের কাছে রিসালাত পাঠান।" আর সূরা তা–হা–এ তিনি আবেদন জানান ঃ

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٧﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾

ফেরাউনের কাছে যাও এবং তাকে বলো, রব্বুল আলামীন আমাদের পাঠিয়েছেন যাতে তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও সে জন্য।"[১৩]

ফেরাউন বললো, "আমরা কি তোমাকে আমাদের এখানে প্রতিপালন করিনি যখন ছোট্ট শিশুটি ছিলে?[১৪] তুমি নিজের জীবনের বেশ ক'টি বছর আমাদের এখানে কাটিয়েছো এবং তারপর তুমি যে কর্মটি করেছ তাতো করেছোই[১৫] তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ।"

وَٱجْعَل لِّى وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِى هَٰرُونَ أَخِى

"আমার জন্য আমার পরিবার থেকে একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দিন, আমার ভাই হারুনকে।"

এ ছাড়া সূরা কাসাসে তিনি আবেদন জানান ঃ

وَأَخِى هَٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِىٓ –

"আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বেশী বাকপটু, কাজেই আপনি তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে আমার সত্যতা প্রমাণ করে।"

এ থেকে মনে হয়, সম্ভবত এই পরবর্তী আবেদন দু'টি পরে করা হয়েছিল এবং এ সূরায় হযরত মূসা থেকে যে কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে সেটিই ছিল প্রথম কথা।

বাইবেলের বর্ণনা এ থেকে ভিন্ন। বাইবেল বলছে, ফেরাউনের জাতি তাকে মিথ্যুক বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এ ভয় এবং নিজের কন্ঠের জড়তার ওজর পেশ করে হযরত মূসা এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পুরোপুরি অস্বীকারই করে দিয়েছিলেন ঃ " হে প্রভু, বিনয় করি, অন্য যাহার হাতে পাঠাইতে চাও, এ বার্তা পাঠাও।" তারপর আল্লাহ নিজেই হযরত হারুনকে তাঁর জন্য সাহায্যকারী নিযুক্ত করে তাঁকে এ মর্মে রাজী করান যে, তাঁরা দু'ভাই মিলে ফেরাউনের কাছে যাবেন। (যাত্রা পুস্তক ৪ঃ১–১৭) আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা তা–হা, ১৯ টীকা।

১১. সূরা কাসাসের ২ রুকূ'তে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। হযরত মূসা ফেরাউনের সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে একজন ইসরাঈলীর সাথে

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّآلِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْمًا وَجَعَلَنِى مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٢٢﴾

মূসা জবাব দিল, "সে সময় অজ্ঞতার মধ্যে? আমি সে কাজ করেছিলাম।[১৬] তারপর তোমাদের ভয়ে আমি পালিয়ে গেলাম। এরপর আমার রব আমাকে "হুকুম" দান করলেন[১৭] এবং আমাকে রসূলদের অন্তরভুক্ত করে নিলেন। আর তোমার অনুগ্রহের কথা যা তুমি আমার প্রতি দেখিয়েছো, তার আসল কথা হচ্ছে এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছিলে।"[১৮]

লড়তে দেখে একটি ঘুঁষি মেরেছিলেন। এতে সে মারা গিয়েছিল। তারপর হযরত মূসা যখন জানতে পারলেন, এ ঘটনার খবর ফেরাউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা জানতে পেরেছে এবং তারা প্রতিশোধ নেবার প্রস্তুতি চালাচ্ছে তখন তিনি দেশ ছেড়ে মাদ্‌য়ানের দিকে পালিয়ে গেলেন। এখানে আট–দশ বছর আত্মগোপন করে থাকার পর যখন তাঁকে হুকুম দেয়া হলো তুমি রিসালাতের বার্তা নিয়ে সেই ফেরাউনের দরবারে চলে যাও, যার ওখানে আগে থেকেই তোমার বিরুদ্ধে হত্যার মামলা ঝুলছে, তখন যথার্থই হযরত মূসা আশংকা করলেন, বার্তা শুনাবার সুযোগ আসার আগেই তারা তাঁকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করে ফেলবে।

১২. নিদর্শনাদি বলতে এখানে লাঠি ও সাদা হাতের কথা বলা হয়েছে। সূরা আ'রাফ ১৩, ১৪, তা–হা ১, নামল ১ ও কাসাসের ৪ রুকূ'তে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

১৩. হযরত মূসা ও হারুনের দাওয়াতের দু'টি অংশ ছিল। একটি ছিল ফেরাউনকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহবান করা। সকল নবীর দাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এটিই। দ্বিতীয়টি ছিল বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের গোলামীর বন্ধন মুক্ত করা। এটি ছিল বিশেষভাবে কেবলমাত্র তাঁদের দু'জনেরই আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত দায়িত্ব। কুরআন মজীদে কোথাও শুধুমাত্র প্রথম অংশটির উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন সূরা নাযি'আতে) আবার কোথাও শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশটির।

১৪. এ থেকে হযরত মূসা যে ফেরাউনের গৃহে লালিত পালিত হয়েছিলেন, এ ফেরাউন যে সে ব্যক্তি নয়, এ চিন্তার প্রতি সমর্থন মেলে। বরং এ ফেরাউন ছিল তার পুত্র। এ যদি সে ফেরাউন হতো, তাহলে বলতো, আমি তোকে লালন–পালন করেছিলাম। কিন্তু এ বলছে, আমাদের এখানে তুমি ছিলে। আমরা তোমাকে লালন–পালন করেছিলাম। (এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ ৮৫–৯৩ টীকা)

১৫. হযরত মূসার মাধ্যমে যে হত্যা কার্য সংঘটিত হয়েছিল সেই ঘটনার প্রতি এখানে ইংগিত করা হয়েছে।

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

ফেরাউন বললো,[১৯] "রব্বুল আলামীন আবার কে?"[২০]

মূসা জবাব দিল, "আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রব এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে যা কিছু আছে তাদেরও রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারী হও।"[২১]

ফেরাউন তার আশপাশের লোকদের বললো, "তোমরা শুনছো তো?"

মূসা বললো, " তোমাদেরও রব এবং তোমাদের বাপ–দাদাদেরও রব যারা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।"[২২]

ফেরাউন (উপস্থিত লোকদের) বললো, "তোমাদের কাছে প্রেরিত তোমাদের এ রসূল সাহেবটি তো দেখছি একেবারেই পাগল।"

মূসা বললো, "পূর্ব ও পশ্চিম এবং যা কিছু তার মাঝখানে আছে সবার রব, যদি তোমরা কিছু বুদ্ধি–জ্ঞানের অধিকারী হতে।"[২৩]

১৬. মূলে وَاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ "আমি তখন গোমরাহীর মধ্যে অবস্থান করছিলাম।" অথবা "আমি সে সময় এ কাজ করেছিলাম পথভ্রষ্ট থাকা অবস্থায়।" এ ضلالت শব্দটি অবশ্যই গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতারই সমার্থক। বরং আরবী ভাষায় এ শব্দটি অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা, ভুল, ভ্রান্তি, বিস্মৃতি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূরা কাসাসে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে এখানে ضلالت শব্দটিকে অজ্ঞতা অর্থে গ্রহণ করাই বেশী সঠিক হবে। হযরত মূসা সেই কিবতীকে একজন ইসরাঈলীর ওপর জুলুম করতে দেখে শুধুমাত্র একটি ঘুঁষি মেরেছিলেন। সবাই জানে, ঘুঁষিতে সাধারণত মানুষ মরে না। আর তিনি হত্যা করার উদ্দেশ্যেও ঘুঁষি মারেননি। ঘটনাক্রমে এতেই সে মরে গিয়েছিল। তাই সঠিক ঘটনা এ ছিল যে, এটি ইচ্ছাকৃত হত্যা ছিল না বরং ছিল ভুলক্রমে হত্যা। হত্যা নিশ্চয়ই হয়েছে কিন্তু ইচ্ছা করে হত্যা করার সংকল্প করে হত্যা করা হয়নি। হত্যা করার জন্য যেসব অস্ত্র বা উপায় ও কায়দা ব্যবহার করা

হয় অথবা যেগুলোর সাহায্যে হত্যাকার্য সংঘটিত হতে পারে তেমন কোন অস্ত্র, উপায় বা কায়দাও ব্যবহার করা হয়নি।

১৭. অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং নবুওয়াতের পরোয়ানা। "হুকুম" অর্থ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হয় আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীকে কর্তৃত্ব করার অনুমতিও (Authority) হয়। এরি ভিত্তিতে তিনি ক্ষমতা সহকারে কথা বলেন।

১৮. অর্থাৎ তোমরা যদি বনী ইসরাঈলের প্রতি জুলুম-নিপীড়ন না চালাতে তাহলে আমি প্রতিপালিত হবার জন্য তোমাদের গৃহে কেন আসতাম? তোমাদের জুলুমের কারণেই তো আমার মা আমাকে ঝুড়িতে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। নয়তো আমার লালন-পালনের জন্য কি আমার নিজের গৃহ ছিল না? তাই এ লালন-পালনের জন্য অনুগৃহীত করার খোটা দেয়া তোমার মুখে শোভা পায় না।

১৯. হযরত মূসাকে ফেরাউনের কাছে যে বাণী পৌছাবার জন্য পাঠানো হয়েছিল তিনি নিজেকে রব্বুল আলামীনের রসূল হিসেবে পেশ করে তা তাকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন, এ বিস্তারিত বিবরণটি এখানে বাদ দেয়া হয়েছে। একথা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত যে, যে বাণী পৌছিয়ে দেবার জন্য নবীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল তিনি নিশ্চয়ই তা পৌছিয়ে দিয়ে থাকবেন। তাই তা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেটি বাদ দিয়ে এবার এমন সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে যা এ বাণী প্রচারের পর ফেরাউন ও মূসার মধ্যে হয়েছিল।

২০. এ প্রশ্নটি করা হয় হযরত মূসার উক্তির ওপর ভিত্তি করে। তিনি বলেন, আমি রব্বুল আলামীনের (সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক, প্রভু ও শাসকের) পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি এবং এ জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দেবে। এটি ছিল সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য। এর পরিষ্কার অর্থ ছিল, হযরত মূসা যাঁর প্রতিনিধিত্বের দাবীদার তিনি সারা বিশ্ব-জাহানের সকল সৃষ্টির ওপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসনের অধিকারী এবং তিনি ফেরাউনকে নিজের অনুগত গণ্য করে তার শাসন কর্তৃত্বের পরিসরে একজন উর্ধতন শাসনকর্তা হিসেবে কেবল হস্তক্ষেপই করছেন না বরং তার নামে এ ফরমানও পাঠাচ্ছেন যে, তোমার প্রজাদের একটি অংশকে আমার মনোনীত প্রতিনিধির হাতে সোপর্দ করো, যাতে সে তাদেরকে তোমার রাষ্ট্রসীমার বাইরে বের করে আনতে পারে। একথায় ফেরাউন জিজ্ঞেস করছে, এ সারা বিশ্ব-জাহানের মালিক ও শাসনকর্তাটি কে? যিনি মিসরের বাদশাহকে তার প্রজাকূলের অন্তরভূক্ত সামান্য এক ব্যক্তির মাধ্যমে এ ফরমান পাঠাচ্ছেন?

২১. অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে বসবাসকারী কোন সৃষ্টি ও ধ্বংসশীল শাসন কর্তৃত্বের দাবীদারের পক্ষ থেকে আসিনি বরং এসেছি আকাশ ও পৃথিবীর মালিকের পক্ষ থেকে। যদি তোমরা বিশ্বাস করো এ বিশ্ব-জাহানের কোন স্রষ্টা-মালিক ও শাসনকর্তা আছেন তাহলে বিশ্ববাসীর রব কে একথা বুঝা তোমাদের পক্ষে কঠিন হবার কথা নয়।

২২. হযরত মূসা (আ) ফেরাউনের দরবারীদেরকে সম্বোধন করে এ ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ফেরাউন বলেছিল, তোমরা শুনছো? হযরত মূসা তাদেরকে বলেন, আমি এমন সব মিথ্যা রবের প্রবক্তা নই যারা আজ আছে, কাল ছিল না এবং কাল ছিল কিন্তু আজ নেই। তোমাদের এ ফেরাউন যে আজ তোমাদের রবে পরিণত হয়েছে সে

ফেরাউন বললো, "যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বলে মেনে নাও, তাহলে কারাগারে যারা পচে মরছে তোমাকেও তাদের দলে ভিড়িয়ে দেবো।"২৪

মূসা বললো, "আমি যদি তোমার সামনে একটি সুস্পষ্ট জিনিস আনি তবুও?"২৫

ফেরাউন বললো, " বেশ, তুমি আনো যদি তুমি সত্যবাদী হও।"২৬

কাল ছিল না এবং কাল তোমাদের বাপ–দাদারা যেসব ফেরাউনকে রবে পরিণত করেছিল তারা আজ নেই। আমি কেবলমাত্র সেই রবের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসনাধিকার স্বীকার করি যিনি আজও তোমাদের এবং এই ফেরাউনের রব এবং এর পূর্বে তোমাদের ও এর যে বাপ–দাদারা চলে গেছেন তাদের সবারও রব ছিলেন।

২৩. অর্থাৎ আমাকে পাগল গণ্য করা হচ্ছে। কিন্তু আপনারা যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন, তাহলে নিজেরাই ভেবে দেখুন, প্রকৃতপক্ষে কি এ বেচারা ফেরাউন যে পৃথিবীর সামান্য একটু ভূখণ্ডের বাদশাহ হয়ে বসেছে সে রব? অথবা পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক এবং মিসরসহ পূর্ব ও পশ্চিম দ্বারা পরিব্যাপ্ত প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক যিনি তিনি রব? আমি তো তাঁরই শাসন কর্তৃত্ব মানি এবং তাঁরই পক্ষ থেকে এ হুকুম তাঁর এক বান্দার কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।

২৪. এ কথোপকথনটি বুঝতে হলে এ বিষয়টি সামনে থাকতে হবে যে, আজকের মতো প্রাচীন যুগেও "উপাস্য"–এর ধারণা কেবলমাত্র ধর্মীয় অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ উপাস্য শুধুমাত্র পূজা, আরাধনা, মানত ও নযরানা লাভের অধিকারী। তার অতি প্রাকৃতিক প্রাধান্য ও কর্তৃত্বের কারণে মানুষ নিজের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে তার কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের জন্য প্রার্থনা করবে, এ মর্যাদাও তার আছে। কিন্তু কোন উপাস্য আইনগত ও রাজনৈতিক দিক দিয়েও প্রাধান্য বিস্তার করার এবং পার্থিব বিষয়াদিতে তার ইচ্ছামতো যে কোন হুকুম দেবে আর তার বিধি–নিষেধকে উচ্চতর আইন হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তার সামনে মানুষকে মাথা নত করতে হবে। এ কথা পৃথিবীর ভুয়া শাসনকর্তারা আগেও কখনো মেনে নেয়নি এবং আজো মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা সবসময় একথা বলে এসেছে, দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যাপারে আমরা পূর্ণ স্বাধীন। কোন উপাস্যের আমাদের রাজনীতিতে ও আইনে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। এটিই ছিল পার্থিব রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যসমূহের সাথে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও

তাঁদের অনুসারী সংস্কারকদের সংঘাতের আসল কারণ। তাঁরা এদের কাছ থেকে সমগ্র বিশ্ব–জাহানের মালিক আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করেছেন এবং এরা এর জবাবে যে কেবলমাত্র নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের দাবী পেশ করতে থেকেছে তাই নয় বরং এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরাধী ও বিদ্রোহী গণ্য করেছে, যে তাদের ছাড়া অন্য কাউকে আইন ও রাজনীতির ময়দানে উপাস্য হিসেবে মেনে নিয়েছে। এ ব্যাখ্যা থেকে ফেরাউনের এ কথাবার্তার সঠিক মর্ম ভালোভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। যদি কেবলমাত্র পূজা–অর্চনা ও নযরানা–মানত পেশ করার ব্যাপার হতো, তাহলে হযরত মূসা অন্য দেবতাদের বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে এর হকদার মনে করেন এটা তার কাছে কোন আলোচনার বিষয়ই হতো না। যদি কেবলমাত্র এ অর্থেই মূসা আলাইহিস সালাম তাকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাওহীদমুখী হবার দাওয়াত দিতেন তাহলে তার ক্রোধোন্মত্ত হবার কোন কারণই ছিল না। বড়জোর সে যদি কিছু করতো তাহলে নিজের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করতো অথবা হযরত মূসাকে বলতো, আমার ধর্মের পণ্ডিতদের সাথে বিতর্ক করে নাও। কিন্তু যে জিনিসটি তাঁকে ক্রোধোন্মত্ত করে দিয়েছে সেটি ছিল এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে পেশ করে তাকে এমনভাবে একটি রাজনৈতিক হুকুম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন যেন সে একজন অধীনস্থ শাসক এবং একজন উর্ধতন শাসনকর্তার দূত এসে তার কাছে এ হুকুমের প্রতি আনুগত্য করার দাবী করছেন। এ অর্থে সে নিজের ওপর কোন রাজনৈতিক ও আইনগত প্রাধান্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বরং তার কোন প্রজা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে উর্ধতন শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নেবে, এটাও সে বরদাশত করতে পারতো না। তাই সে প্রথমে চ্যালেঞ্জ করলো "রব্বুল আলামীনে"র পরিভাষাকে। কারণ তাঁর পক্ষ থেকে যে বার্তা নিয়ে আসা হয়েছিল তার মধ্যে শুধুমাত্র ধর্মীয় উপাসনার নয় বরং সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ভাবধারা সুস্পষ্ট ছিল। তারপর হযরত মূসা যখন বারবার ব্যাখ্যা করে বললেন, তিনি যে রব্বুল আলামীনের বার্তা এনেছেন তিনি কে? তখন সে পরিষ্কার হুমকি দিল, মিসর দেশে তুমি যদি আমার ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌম কর্তৃত্বের নাম উচ্চারণ করবে তাহলে তোমাকে জেলখানার ভাত খেতে হবে।

২৫. অর্থাৎ যদি আমি সত্যিই সমগ্র বিশ্ব–জাহানের, আকাশ ও পৃথিবীর এবং পূর্ব ও পশ্চিমের রবের পক্ষ থেকে যে আমাকে পাঠানো হয়েছে এর সপক্ষে সুস্পষ্ট আলামত পেশ করি, তাহলে এ অবস্থায়ও কি আমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করা হবে এবং আমাকে কারাগারে পাঠানো হবে?

২৬. হযরত মূসার প্রশ্নের জবাবে ফেরাউনের এ উক্তি স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে যে, প্রাচীন ও আধুনিক কালের মুশরিকদের থেকে তার অবস্থা ভিন্নতর ছিল না। অন্য সব মুশরিকদের মতোই সে আল্লাহকে অতিপ্রাকৃত অর্থে সকল উপাস্যের উপাস্য বলে বিশ্বাস করতো এবং তাদের মতো একথাও স্বীকার করতো যে, বিশ্ব-জাহানে সকল দেবতার চাইতে

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾

(তার মুখ থেকে একথা বের হতেই) মূসা নিজের লাঠিটি ছুড়ে মারলো। তৎক্ষণাৎ সেটি হলো একটি সাক্ষাত অজগর।[২৭] তারপর সে নিজের হাত (বগলের ভেতর থেকে) টেনে বের করলো এবং তা সকল প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে চক্‌মক্ করছিল।[২৮]

তাঁর শক্তি বেশী। তাই হযরত মূসা তাঁকে বলেন, যদি তুমি আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত বলে বিশ্বাস না করো, তাহলে আমি এমন সব নিদর্শন পেশ করবো যা থেকে আমি যে তাঁর প্রেরিত তা প্রমাণ হয়ে যাবে। আর এ কারণেই সে–ও জবাব দেয়, ঠিক আছে যদি তোমার দাবী সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আনো তোমার নিদর্শন। অন্যথায় সোজা কথা, যদি সে আল্লাহর অস্তিত্ব অথবা তাঁর বিশ্ব–জাহানের মালিক হবার ব্যাপারেই সন্দিহান হতো, তাহলে নিদর্শনের প্রশ্নই উঠতে পারতো না। নিদর্শনের প্রশ্ন তো তখনই সামনে আসতে পারে যখন আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হওয়া স্বীকৃত হয় কিন্তু হযরত মূসা তাঁর প্রেরিত কি না এ ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দেয়।

২৭. কুরআন মজীদে কোন জায়গায় এ জন্য حَيَّةٌ (সাপ) আবার কোথাও جَانٌ (সাধারণত ছোট ছোট সাপকে বলা হয়) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখানে বলা হচ্ছে ثُعْبَانٌ (অজগর)। ইমাম রাযী এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন حَيَّة আরবী ভাষায় সর্পজাতির সাধারণ নাম। তা ছোট সাপও হতে পারে আবার বড় সাপও হতে পারে। আর ثُعْبَانٌ শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, দৈহিক আয়তন ও স্থূলতার দিক দিয়ে তা ছিল অজগরের মতো। অন্যদিকে جَانٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ছোট সাপের মতো তার ক্ষীপ্রতা ও তেজস্বীতার জন্য।

২৮. কোন কোন তাফসীরকার ইহুদীদের বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে بَيْضَاءُ এর অর্থ করেছেন "সাদা" এবং এর অর্থ এভাবে নিয়েছেন, বগল থেকে বের হতেই স্বাভাবিক রোগমুক্ত হাত ধবল কুষ্ঠরোগীর মতো সাদা হয়ে গেলো? কিন্তু ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর, যামাখ্‌শারী, রাযী, আবুস সাউদ ঈমাদী, আলূসী ও অন্যান্য বড় বড় মুফাস্‌সিরগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এখানে بَيْضَاءُ মানে হচ্ছে, উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়। যখনই হযরত মূসা বগল থেকে হাত বের করলেন তখনই অকস্মাত সমগ্র পরিবেশ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং অনুভূত হতে লাগলো যেন সূর্য উদিত হয়েছে।

(আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা তা–হা, ১৩ টীকা)।

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗۤ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٣٦﴾ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٨﴾

৩ রুকূ'

ফেরাউন তার চারপাশে উপস্থিত সরদারদেরকে বললো, "এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন দক্ষ যাদুকর। নিজের যাদুর জোরে সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়।[২৯] এখন বলো তোমরা কী হুকুম দিচ্ছো?"[৩০]

তারা বললো, "তাকে ও তার ভাইকে আটক করো এবং শহরে শহরে হরকরা পাঠাও। তারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে তোমার কাছে নিয়ে আসুক।"

তাই একদিন নির্দিষ্ট সময়ে[৩১] যাদুকরদেরকে একত্র করা হলো।

২৯. মু'জিযা দু'টির শ্রেষ্ঠত্ব এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। মাত্র এক মুহূর্ত আগে নিজের এক সাধারণ প্রজাকে দরবারের মধ্যে রিসালাতের কথাবার্তা ও বনী ইসরাঈলের মুক্তির দাবী করতে দেখে ফেরাউন তাকে পাগল ঠাউরিয়েছিল। (কারণ তার দৃষ্টিতে একটি গোলাম জাতির কোন ব্যক্তির পক্ষে তার মতো পরাক্রমশালী বাদশাহর সামনে এ ধরনের দুসাহস করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।) এবং এই বলে ধমক দিচ্ছিল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে মেনে নাও, তাহলে তোমাকে কারাগারে আটকে মারবো। আর এখন মাত্র এক মুহূর্ত পরে এ নিদর্শনগুলো দেখার সাথে সাথেই তার মধ্যে এমন ভীতির সঞ্চার হলো যে, নিজের বাদশাহী ও রাজ্য হারাবার ভয়ে সে ভীত হয়ে পড়লো এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রকাশ্য দরবারে নিজের অধস্তন কর্মচারীদের সামনে সে যে কেমন অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে চলছে সে অনুভূতিই সে হারিয়ে ফেললো। বনী ইসরাঈলের মতো একটি নির্যাতিত-নিপীড়িত জাতির দু'টি লোক যুগের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী বাদশাহর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের সাথে কোন লোক-লস্কর ছিল না। তাদের জাতির মধ্যে কোন সক্রিয়তা ও প্রাণশক্তি ছিল না। দেশের কোথাও বিদ্রোহের সামান্যতম আলামতও ছিল না। দেশের বাইরের অন্য কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিও তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল না। এ অবস্থায় শুধুমাত্র একটি লাঠিকে সর্পে পরিণত হতে ও একটি হাতকে ঔজ্জ্বল্য বিকীরণ করতে দেখে অকস্মাত তার এই বলে চিৎকার করে ওঠা যে, এ দু'টি সহায়-সম্বলহীন লোক আমাকে সিংহাসনচ্যুত করবে এবং সমগ্র শাসক শ্রেণীকে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বেদখল করে দেবে—একথার কী অর্থ হতে পারে? এ ব্যক্তি যাদুবলে এসব করে ফেলবে— একথা বলাও তার অত্যধিক হতবুদ্ধি হওয়ারই

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٤٣﴾

এবং লোকদের বলা হলো, "তোমরাও কি সমাবেশে যাবে?[৩২] হয়তো আমরা যাদুকরদের ধর্মের অনুসরণের ওপরই বহাল থাকবো, যদি তারা বিজয়ী হয়।"[৩৩]

যখন যাদুকররা ময়দানে এলো, তারা ফেরাউনকে বললো, "আমরা কি পুরস্কার পাবো, যদি আমরা বিজয়ী হই?"[৩৪]

সে বললো, "হাঁ, আর তোমরা তো সে সময় নিকটবর্তীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।"[৩৫]

মূসা বললো, " তোমাদের যা নিক্ষেপ করার আছে নিক্ষেপ করো।"

প্রমাণ। যাদুবলে দুনিয়ায় কখনো কোথাও কোন রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়নি, কোন দেশ বিজিত হয়নি, কোন যুদ্ধ জয়ও হয়নি। যাদুকররা তো তার নিজের দেশেই ছিল এবং তারা বড় বড় তেলেসমাতি দেখাতে পারতো। কিন্তু সে নিজে জানতো, ভেল্কিবাজীর খেলা দেখিয়ে পুরস্কার নেয়া ছাড়া তাদের আর কোন কৃতিত্ব নেই। রাজ্য তো দূরের কথা, সে বেচারারা তো রাজ্যের একজন সামান্য পুলিশ কনস্টেবলকেও চ্যালেঞ্জ করার হিম্মত রাখতো না।

৩০. ফেরাউন যে অত্যধিক হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, এ বাক্যাংশটি সে কথাই প্রকাশ করে। সে নিজেকে উপাস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল এবং এদের সবাইকে করে রেখেছিল নিজের গোলাম। কিন্তু এখন উপাস্য সাহেব ভয়ের চোটে অস্থির হয়ে বান্দাদের কাছেই জিজ্ঞেস করছে তোমরা কি হুকুম দাও। অন্য কথায় বলা যায়, সে যেন বলতে চাচ্ছে, আমার বুদ্ধি তো এখন বিকল হয়ে গেছে, তোমরাই বলো আমি কিভাবে এ বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

৩১. সূরা তা-হা-এ উল্লেখিত হয়েছে, কিবতীদের জাতীয় ঈদের দিনকে (يوم الزينة) এ প্রতিদ্বন্দ্বীতার দিন হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে উৎসব ও মেলা উপলক্ষে আগত সমস্ত লোকেরা এ বিরাট প্রতিযোগিতা দেখতে পাবে এটাই ছিল উদ্দেশ্য। এ জন্য সময় নির্ধারিত করা হয়েছিল সূর্য আকাশে উঠে চারদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ার পর। এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে সবার চোখের সামনে উভয় পক্ষের শক্তির প্রদর্শনী হবে এবং আলোর অভাবে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবার অবকাশ থাকবে না।

৩২. অর্থাৎ শুধুমাত্র ঘোষণা ও বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করা হয়নি বরং জনগণকে উদ্দীপিত ও উত্তেজিত করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখার জন্য ময়দানে হাজির করার উদ্দেশ্যে লোকও নিয়োগ করা হয়। এ থেকে জানা যায়, প্রকাশ্য দরবারে হযরত মূসা যেসব মু'জিযা দেখিয়েছিলেন সেগুলোর খবর সাধারণ লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দেশের লোকেরা এতে প্রভাবিত হতে চলেছে বলে ফেরাউনের মনে আশংকা দেখা দিয়েছিল। তাই সে চাচ্ছিল বেশী বেশী জনসমাগম হোক এবং লোকেরা দেখে নিক লাঠির সাপে পরিণত হওয়া কোন বড় কথা নয়, আমাদের দেশের প্রত্যেক যাদুকরও এ ভেল্কিবাজী দেখাতে পারে।

৩৩. এ বাক্যাংশটি প্রমাণ করছে যে, ফেরাউনের দরবারের যেসব লোক হযরত মূসার মু'জিযা দেখেছিল এবং দরবারের বাইরের যেসব লোকের কাছে এর নির্ভরযোগ্য খবর পৌঁছে গিয়েছিল, নিজেদের পিতৃপুরুষের ধর্মের ওপর তাদের বিশ্বাসের ভিত্ নড়ে যাচ্ছিল এবং এখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে কাজ করেছেন তাদের যাদুকররাও কোনক্রমে তা করিয়ে দেখিয়ে দিক, এরি ওপর তাদের ধর্মের টিকে থাকা নির্ভর করছিল। ফেরাউন ও তার রাজ্যের কর্মকর্তাগণ একে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকর মোকাবিলা মনে করছিল। তাদের প্রেরিত লোকেরা সাধারণ মানুষের মগজে এ চিন্তা প্রবেশ করাবার চেষ্টা করছিল যে, যাদুকররা যদি কামিয়াব হয়ে যায়, তাহেল মূসার ধর্ম গ্রহণ করার হাত থেকে আমরা বেঁচে যাবো, অন্যথায় আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের অপমৃত্যু ঘটবে।

৩৪. এ ছিল মুশরিকী ধর্মের রক্ষকদের অবস্থা। মূসা আলাইহিস সালামের হামলা থেকে তারা নিজেদের ধর্মকে বাঁচাতে চাচ্ছিল। এ জন্য চূড়ান্ত মোকাবিলার সময় তাদের মধ্যে যে পবিত্র আবেগের সঞ্চার হয়েছিল তা ছিল এই যে, তারা বাজী জিততে পারলে সরকার বাহাদুর থেকে কিছু পুরস্কার পাওয়া যাবে।

৩৫. আর এ ছিল সমকালীন বাদশাহর পক্ষ থেকে ধর্ম ও জাতির খিদমতগারদেরকে প্রদান করার মতো সবচেয়ে বড় ইনাম। অর্থাৎ কেবল টাকা পয়সাই পাওয়া যাবে না, দরবারে আসনও পাওয়া যাবে। এভাবে ফেরাউন ও তার যাদুকররা প্রথম পর্যায়েই নবী ও যাদুকরের বিরাট নৈতিক পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। একদিকে ছিল উন্নত মনোবল। বনী ইসরাঈলের মতো একটি নিগৃহীত জাতির এক ব্যক্তি দশ বছর যাবত নরহত্যার অভিযোগে আত্মগোপন করে থাকার পর ফেরাউনের দরবারে বুক টান করে এসে দাঁড়াচ্ছেন। নির্ভীক কণ্ঠে বলে যাচ্ছেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাকে পাঠিয়েছেন, বনী ইসরাঈলকে আমার হাতে সোপর্দ করে দাও। ফেরাউনের সাথে মুখোমুখি বিতর্ক করতে তিনি সামান্যতম সংকোচ অনুভব করছেন না। তার হুমকি ধমকিকে তিলার্ধও গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অন্যদিকে হীন মনোবলের প্রকাশ। বাপ-দাদার ধর্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে যাদুকরদেরকে ফেরাউনের দরবারেই ডেকে পাঠানো হচ্ছে। এরপরও হাত জোড় করে তারা বলছে, জনাব! কিছু ইনাম তো মিলবে? আর জবাবে অর্থ পুরস্কার ছাড়াও রাজ নৈকট্যও লাভ করা যাবে শুনে খুশীতে বাগেবাগ। নবী কোন্ প্রকৃতির মানুষ এবং তাঁর মোকাবিলায় যাদুকররা কেমন ধরনের লোক, এ দু'টি বিপরীত চরিত্র আপনা আপনি একথা প্রকাশ করে দিচ্ছে। কোন ব্যক্তি নির্লজ্জতার সকল সীমালংঘন না করলে নবীকে যাদুকর বলার দুসাহস দেখাতে পারে না।

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾

তারা তখনই নিজেদের দড়িদড়া ও লাঠিসোঁটা নিক্ষেপ করলো এবং বললো, "ফেরাউনের ইজ্জতের কসম, আমরাই বিজয়ী হবো।"৩৬ তারপর মূসা নিজের লাঠিটি নিক্ষেপ করলো। অকস্মাত সে তাদের কৃত্রিম কীর্তিগুলো গ্রাস করতে থাকলো। তখন সকল যাদুকর স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদাবনত হয়ে পড়লো এবং বলে উঠলো, "মেনে নিলাম আমরা রব্বুল আলামীনকে — মূসা ও হারুনের রবকে।"৩৭

৩৬. এখানে এ আলোচনা বাদ দেয়া হয়েছে যে, হযরত মূসার মুখে এ বাক্য উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই যখন যাদুকররা নিজেদের দড়িদড়া ও লাঠিসোঁটা ছুঁড়ে দিল তখন অকস্মাত সেগুলোকে বহু সাপের আকারে কিলবিল করতে করতে হযরত মূসার দিকে দৌড়ে যেতে দেখা গেলো। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এর বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

"যখন তারা নিজেদের মন্ত্র নিক্ষেপ করলো তখন লোকদের দৃষ্টিকে যাদুগ্রস্ত করে দিল, সবাইকে আতংকিত করে ফেললো এবং বিরাট যাদু বানিয়ে নিল।"

সূরা তা-হা-এ এমন এক সময়ের চিত্র আঁকা হয়েছে যখন ঃ

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۝

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ۝

"সহসা তাদের যাদুর ফলে হযরত মূসার মনে হলো যেন তাদের রশি ও লাঠিগুলো দৌড়ে চলে আসছে। এতে মূসা মনে মনে ভয় পেয়ে গেলো।"

৩৭. এটা হযরত মূসার মোকাবিলায় তাদের পক্ষ থেকে নিছক পরাজয়ের স্বীকৃতি ছিল না। ব্যাপারটা এমন ছিল না যে, কেউ বলতো, আরে ছেড়ে দাও, একজন বড় যাদুকর ছোট যাদুকরদেরকে হারিয়ে দিয়েছে। বরং তাদের সিজদানত হয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনা যেন প্রকাশ্যে সর্ব সমক্ষে হাজার হাজার মিসরবাসীর সামনে একথার স্বীকৃতি ও ঘোষণা দিয়ে দেয়া যে, মূসা যা কিছু এনেছেন তা আমাদের যাদু শিল্পের অন্তরগত নয়, এ কাজ তো একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কুদরতেই হতে পারে।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۬ؕ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾

ফেরাউন বললো, "তোমরা মূসার কথা মেনে নিলে আমি তোমাদের অনুমতি দেবার আগেই! নিশ্চয়ই এ তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের যাদু শিখিয়েছে।[৩৮] *বেশ, এখনই তোমরা জানবে। আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করাবো এবং তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবো।"*[৩৯]

৩৮. এখানে যেহেতু বক্তব্য পরম্পরার সাথে সম্পর্ক রেখে কেবলমাত্র এতটুকু দেখানো উদ্দেশ্য যে, কোন জেদী ও হঠকারী ব্যক্তি একটি সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখার এবং তার মু'জিযা হবার সপক্ষে স্বয়ং যাদুকরদের সাক্ষ শুনার পরও কিভাবে তাকে যাদু আখ্যা দিয়ে যেতে থাকে, তাই ফেরাউনের শুধুমাত্র এতটুকু উক্তি এখানে উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু সূরা আ'রাফে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا –

"এ একটি ষড়যন্ত্র, যা তোমরা সবাই মিলে এ রাজধানী নগরে তৈরি করেছো, যাতে এর মালিকদেরকে কর্তৃত্ব থেকে বেদখল করে দাও।"

এভাবে ফেরাউন সাধারণ জনতাকে একথা বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করে যে, যাদুকরদের এ ঈমান মু'জিযার কারণে নয় বরং এটি নিছক একটি যোগসাজশ। এখানে আসার আগে মূসার সাথে এদের এ মর্মে সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল যে, এখানে এসে এরা মূসার মোকাবিলায় পরাজয় বরণ করে নেবে এবং এর ফলে যে রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হবে তার সুফল এরা উভয় গোষ্ঠী মিলে ভোগ করবে।

৩৯. যাদুকররা আসলে মূসা আলাইহিস সালামের সাথে যোগসাজশ করে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল, নিজের এ অভিমতকে সফল করে তোলার জন্য ফেরাউন এ ভয়ংকর হুমকি দিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে এরা প্রাণ বাঁচাবার জন্য ষড়যন্ত্র স্বীকার করে নেবে এবং এর ফলে পরাজিত হবার সাথে সাথে তাদের সিজদাবনত হয়ে ঈমান আনার ফলে হাজার হাজার দর্শকের ওপর যে নাটকীয় প্রভাব পড়েছিল তা নির্মূল হয়ে যাবে। এ দর্শকবৃন্দ স্বয়ং ফেরাউনের আমন্ত্রণে এ চূড়ান্ত মোকাবিলা উপভোগ করার জন্য সমবেত হয়েছিল। তার প্রেরিত লোকেরাই তাদেরকে এ ধারণা দিয়েছিল যে, মিসরীয় জাতির ধর্ম বিশ্বাস এখন এ যাদুকরদের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল রয়েছে। এরা সফলকাম হলে জাতি তার পূর্বপুরুষের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে, অন্যথায় মূসার দাওয়াতের সয়লাব তাকে ও তার সাথে ফেরাউনের রাজত্বকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥١﴾

তারা জবাব দিল, "কোন পরোয়া নেই, আমরা নিজেদের রবের কাছে পৌঁছে যাবো। আর আমরা আশা করি আমাদের রব আমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন, কেননা, সবার আগে আমরা ঈমান এনেছি।[৪০]

৪০. অর্থাৎ আমাদের একদিন তো আমাদের রবের কাছে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। এখন যদি তুমি আমাদের হত্যা করো, তাহলে এর ফলে যেদিনটি আসবার ছিল সেটি আজ এসে যাবে, এর বেশী আর কিছু হবে না। এ অবস্থায় ভয় পাওয়ার প্রশ্ন কেন উঠবে? বরং উল্‌টো আমাদের তো মাগফেরাত পাওয়ার ও গোনাহ মাফের আশা আছে। কারণ আজ এখানে সত্য প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই আমরা তা মেনে নেবার ক্ষেত্রে এক মুহূর্তও দেরী করিনি এবং এ বিশাল সমাবেশে আমরাই প্রথমে অগ্রবর্তী হয়ে ঈমান এনেছি।

ফেরাউন ঢেঁড়া পিটিয়ে যে জনগোষ্ঠীকে সমবেত করেছিল তাদের সবার সামনে যাদুকরদের এ জবাব দু'টি কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে ঃ

এক ঃ ফেরাউন একজন মহা মিথ্যুক, হঠকারী ও প্রতারক। সে নিজে ফায়সালা করার জন্য যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল তাতে মূসা আলাইহিস সালামের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিজয়কে সোজাভাবে মেনে নেবার পরিবর্তে এখন সে সহসা একটি মিথ্যা ষড়যন্ত্রের গল্প ফেঁদে বসেছে এবং হত্যা ও শাস্তির হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক তার স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করছে। এ গল্প যদি সামান্যও সত্য হতো, তাহলে যাদুকররা হাত–পা কাটাবার ও শূলবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দেবার জন্য এত হন্যে হয়ে যেতো না। এ ধরনের কোন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যদি কোন রাজত্ব লাভের লোভ থেকে থাকতো, তাহলে এখন তো আর তার কোন অবকাশ নেই। কারণ রাজত্ব এখন যাদের ভাগ্যে আছে তারাই তা ভোগ করবে, এ ভাগ্যাহতরা তো এখন শুধুমাত্র নিহত হওয়া ও শাস্তি লাভ করার জন্য রয়ে গেছে। এ ভয়াবহ বিপদ মাথায় নিয়েও এ যাদুকরদের নিজেদের ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা পরিষ্কারভাবে একথা প্রমাণ করে যে, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। বরং এ ক্ষেত্রে সত্য কথা হচ্ছে, যাদুকররা নিজেদের যাদুবিদ্যায় পারদর্শী হবার কারণে যথার্থই জানতে পেরেছে যে, মূসা আলাইহিস সালাম যা কিছু দেখিয়েছেন তা কোনক্রমেই যাদু নয় বরং প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কুদরতের প্রকাশ।

দুই ঃ এ সময় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজার হাজার জনতার সামনে যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটি ছিল এই যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথেই এ যাদুকরদের চরিত্রে কেমন নৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়ে গেলো। ইতিপূর্বে তাদের অবস্থা ছিল ঃ তারা পূর্বপুরুষদের ধর্মকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল এবং এ জন্য ফেরাউনের সামনে হাত জোড় করে ইনাম চাইছিল। আর এখন

وَاَوۡحَیۡنَاۤ اِلٰی مُوۡسٰۤی اَنۡ اَسۡرِ بِعِبَادِیۡۤ اِنَّکُمۡ مُّتَّبَعُوۡنَ ﴿۵۲﴾ فَاَرۡسَلَ فِرۡعَوۡنُ فِی الۡمَدَآئِنِ حٰشِرِیۡنَ ﴿۵۳﴾ اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَشِرۡذِمَۃٌ قَلِیۡلُوۡنَ ﴿۵۴﴾ وَاِنَّهُمۡ لَنَا لَغَآئِظُوۡنَ ﴿۵۵﴾ وَاِنَّا لَجَمِیۡعٌ حٰذِرُوۡنَ ﴿۵۶﴾

৪ রুকূ'

আমি ৪১ মূসার কাছে অহী পাঠিয়েছি এই মর্মে ঃ "রাতারাতি আমার বান্দাদের নিয়ে বের হয়ে যাও, তোমাদের পিছু নেয়া হবে।"৪২ এর ফলে ফেরাউন (সৈন্য একত্র করার জন্য) নগরে নগরে নকীব পাঠালো (এবং বলে পাঠালো ঃ) এরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক, এরা আমাদের নারাজ করেছে এবং আমরা একটি দল, সদা–সতর্ক থাকাই আমাদের রীতি।"৪৩

মুহূর্তের মধ্যে তাদের হিম্মত ও সংকল্পের বলিষ্ঠতা এমনি উন্নত পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যার ফলে সেই ফেরাউন তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল, তার সমগ্র রাজশক্তিকে তারা হেয় প্রতিপন্ন করেছিল এবং নিজেদের ঈমানের খাতিরে মৃত্যু ও নিকৃষ্টতম শারীরিক শাস্তি বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এ নাজুক মনস্তাত্বিক পরিবেশে মিসরীয়দের মুশরিকী ধর্মের লাঞ্ছনা এবং মূসা আলাইহিস সালাম প্রচারিত সত্য দীনের বলিষ্ঠ প্রচারণা সম্ভবত এর চাইতে বেশী আর হতে পারতো না।

৪১. ওপরে বর্ণিত ঘটনার পর হিজরতের কথা শুরু করার কারণে কারো মনে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যে, এর পরপরই হযরত মূসাকে বনী ইসরাঈলসহ মিসর থেকে বের হয়ে আসার হুকুম দেয়া হয়। আসলে এখানে মাঝখানে কয়েক বছরের ইতিহাস আলোচনা করা হয়নি। সূরা আ'রাফের ১৫-১৬ এবং সূরা ইউনুসের ৯ রুকূ'তে এ আলোচনা এসেছে। এর একটি অংশ সামনের দিকে সূরা মু'মিনের ২-৫ ও সূরা যুখরুফের ৫ রুকূ'তেও আসছে। এখানে যেহেতু বক্তব্য পরম্পরার সাথে সম্পর্ক রেখে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দেখে নেবার পরও যে ফেরাউন হঠকারিতার পথ অবলম্বন করেছিল তার পরিণতি কি হয়েছিল এবং যে দাওয়াতের পেছনে আল্লাহর শক্তি নিয়োজিত ছিল তা কিভাবে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেলো সেকথা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য, তাই ফেরাউন ও হযরত মূসার সংঘাতের প্রাথমিক পর্যায় বর্ণনা করার পর এখন ঘটনা সংক্ষেপ করে এর শুধুমাত্র শেষ দৃশ্য দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে।

৪২. উল্লেখ্য, বনী ইসরাঈলের জনবসতি মিসরের কোন এক জায়গায় একসাথে ছিল না। বরং দেশের সমস্ত শহরে ও পল্লীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বিশেষ করে মামফিস (MAMPHIS) থেকে রাম্‌সিস পর্যন্ত এলাকায় তাদের বৃহত্তর অংশ বসবাস করতো। এ এলাকা জুশান নামে পরিচিত ছিল। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আ'রাফ, বনী ইসরাঈলের নির্গমন পথের নকশা) কাজেই হযরত মূসাকে যখন হুকুম দেয়া হয়েছিল যে,

فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾

এভাবে আমি তাদেরকে বের করে এনেছি তাদের বাগ–বাগীচা, নদী–নির্ঝরিনী, ধন–ভাণ্ডার ও সুরম্য আবাসগৃহসমূহ থেকে।[৪৪] এসব ঘটেছে তাদের সাথে আর (অন্যদিকে) আমি বনী ইসরাঈলকে ঐ সব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি।[৪৫]

তোমাকে এবার বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে বের হয়ে যেতে হবে, তখন সম্ভবত তিনি দেশের সমস্ত বনী ইসরাঈলী বসতিতে সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে হিজরত করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য হয়তো একটি রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সে রাতে প্রত্যেক জনপদের মুহাজিরদের বের হয়ে পড়তে হবে। রাতের বেলা হিজরত করার জন্য বের হবার নির্দেশ কেন দেয়া হয়েছিল "তোমাদের পিছু নেয়া হবে" উক্তি থেকে তার ইংগিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ ফেরাউনের সেনাবাহিনী তোমাদের পিছনে ধাওয়া করার আগে রাতের মধ্যে তোমরা নিজেদের পথে অন্তত এত দূর অগ্রসর হয়ে যাওয়ার ফলে তারা অনেক পিছনে পড়ে যায়।

৪৩. একথাগুলো ফেরাউনের মনের গোপন ভীতি প্রকাশ করে। লোক দেখানো নির্ভীকতার মোড়কে সেই ভীতিকে সে ঢেকে রেখেছিল। একদিকে তাৎক্ষণিক সাহায্যের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে সে সৈন্য তলব করছিল। এ থেকে মনে হয় যে, সে বনী ইসরাঈলের দিক থেকে বিপদের আশংকা করছিল। অন্যদিকে আবার একথাটিও গোপন করতে চাচ্ছিল যে, একটি দীর্ঘকালের নিগৃহীত–নিষ্পেষিত এবং চরম লাঞ্ছনা ও দাসত্বের জীবন যাপনকারী জাতির দিক থেকে ফেরাউনের মতো মহাশক্তিধর শাসক কোন আশংকা অনুভব করছে, এমনকি ত্বরিত সাহায্যের জন্য সেনাবাহিনী তলব করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাই নিজের বার্তা সে এমনভাবে পাঠাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে, বেচারা বনী ইসরাঈল তো সামান্য ব্যাপার মাত্র, মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক, তারা আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না কিন্তু তারা এমন সব কাজ করেছে যা আমাদের ক্রোধ উৎপাদন করেছে। তাই আমরা তাদেরকে শাস্তি দিতে চাই। কোন আশংকার কারণে আমরা সেনা সমাবেশ করছি না। বরং এটি নিছক একটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ মাত্র। বিপদের কোন দূরতম সম্ভাবনা হলেও যথাসময়ে তার মূলোৎপাটনে প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

৪৪. অর্থাৎ ফেরাউনের মতে দূরতম এলাকা থেকে সেনাবাহিনী তলব করে বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করে সে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। কিন্তু আল্লাহ এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন যার ফলে তার নিজের কৌশলে সে নিজেই ফেঁসে গেলো। অর্থাৎ ফেরাউনী রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তারা নিজ নিজ জায়গা ছেড়ে এমন এক জায়গায়

সমবেত হলো যেখানে তাদের সবাইকে এক সাথে সলিলসমাধি লাভ করতে হবে। যদি তারা বনী ইসরাঈলের পিছু না নিতো, তাহলে এর ফল কেবল এতটুকুই হতো যে, একটি জাতি দেশ ত্যাগ করে চলে যেতো। এর চেয়ে বেশী তাদের আর কোন ক্ষতি হতো না, ফলে তারা আগের মতোই বিলাস কুঞ্জে বসে আয়েশী জীবন যাপন করতো। কিন্তু তারা বুদ্ধিমত্তার পরম পরাকাষ্ঠা দেখনোর জন্য বনী ইসরাঈলকে নিরাপদে চলে না যেতে দেবার ফায়সালা করলো। শুধু তাই নয়, মুহাজির কাফেলাগুলোর ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে চিরকালের জন্য তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলো। এ উদ্দেশ্যে তাদের শাহজাদাবৃন্দ, বড় বড় সরদার ও রাজকর্মচারীরা তাদের শক্তিমদমত্ত বাদশাহকে সংগে নিয়ে নিজেদের প্রাসাদসমূহ থেকে বের হয় পড়লো। তাদের এহেন বুদ্ধিমত্তার এ দ্বিবিধ ফলও দেখা গেলো যে, বনী ইসরাঈল মিসর থেকে বের হয়েও গেলো আবার মিসরের জালেম ফেরাউনী সাম্রাজ্যের প্রধান জনশক্তি (cream) সাগরে বিসর্জিত হলো।

৪৫. কোন কোন তাফসীরকার এ আয়াতের অর্থ এভাবে গ্রহণ করেছেন ঃ যেসব উদ্যান, নদী, ধনভাণ্ডার ও উন্নত আবাসগৃহ ত্যাগ করে এ জালেমরা বের হয়েছিল মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে সেগুলোরই ওয়ারিশ বানিয়ে দেন। এ অর্থ যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, ফেরাউনের ডুবে মরার পর বনী ইসরাঈল আবার মিসরে পৌঁছে যাবে এবং ফেরাউনের বংশধরদের সমস্ত ধন–দৌলত এবং শক্তি, পরাক্রম ও গৌরবের অধিকারী হবে। কিন্তু এ জিনিসটি প্রথমত ইতিহাস থেকেও প্রমাণিত নয় এবং দ্বিতীয়ত কুরআনের অন্যান্য জায়গার বিস্তারিত বিববরণও আয়াতের এ অর্থ গ্রহণের অনুকূল নয়। সূরা বাকারাহ, মায়েদাহ, আ'রাফ ও তা-হা-তে যে ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, ফেরাউনের ডুবে মরার পর বনী ইসরাঈল মিসরে ফিরে আসার পরিবর্তে নিজেদের অভীষ্ট মনজিলের (ফিলিস্তীন) দিকেই এগিয়ে যেতে থাকে। তারপর থেকে হযরত দাউদের আমল (খৃঃ পূঃ ১০৩-১০১৩) পর্যন্ত তাদের ইতিহাসের সব ঘটনাই আজকের পৃথিবীতে সিনাই উপদ্বীপ, উত্তর আরব, পূর্ব জর্দান (ট্রান্সজর্ডান) ও ফিলিস্তীন নামে পরিচিত এলাকায় ঘটেছে। তাই আমাদের মতে, যেসব উদ্যান, নদ-নদী, ধনভাণ্ডার ও সুরম্য অট্টালিকা থেকে ফেরাউনকে ও তার জাতির সরদারদেরকে বের করা হয়েছিল মহান আল্লাহ সেগুলোই বনী ইসরাঈলকে দান করেন, এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। বরং এর সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ একদিকে ফেরাউনের বংশধরদেরকে এসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন এবং অন্যদিকে বনী ইসলাঈলকে এসব নিয়ামতই দান করেন। অর্থাৎ তারা ফিলিস্তীন ভূখণ্ডে বাগ-বাগিচা, নদ-নদী, ধনভাণ্ডার ও উত্তম আবাসিক ভবন সমূহের অধিকারী হয়। সূরা আরাফের নিম্নোক্ত আয়াতে এ ব্যাখ্যার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○ وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ،

فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

সকাল হতেই তারা এদের পিছু নিয়ে বের হয়ে পড়লো। দু'দল যখন পরস্পরকে দেখতে পেলো তখন মূসার সাথিরা চিৎকার করে উঠলো, "আমরা তো পাকড়াও হয়ে গেলাম।" মূসা বললো, "কখ্খনো না, আমার সাথে আছেন আমার রব, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পথ দেখাবেন।"[৪৬] আমি মূসাকে অহীর মাধ্যমে হুকুম দিলাম, "মারো তোমার লাঠি সাগরের বুকে।" সহসাই সাগর দীর্ণ হয়ে গেলো এবং তার প্রত্যেকটি টুকরা হয়ে গেলো এক একটি বিশাল পাহাড়ের মতো।[৪৭] এ জায়গায়ই আমি দ্বিতীয় দলটিকেও নিকটে আনলাম।[৪৮] মূসা ও তার সমস্ত লোককে যারা তার সংগে ছিল আমি উদ্ধার করলাম এবং অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম।

এ ঘটনার মধ্যে আছে একটি নিদর্শন।[৪৯] কিন্তু এদের অধিকাংশ মান্যকারী নয়। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালীও আবার দয়াময়ও।

"তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছিল এবং তা থেকে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। আর তাদের পরিবর্তে আমি যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদেরকে এমন একটি দেশের পূর্ব ও পশ্চিমের ওয়ারিস বানিয়ে দিলাম যাকে আমি সমৃদ্ধিতে ভরে দিয়েছিলাম।" (১৩৬-১৩৭ আয়াত)

এ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ দেশের উপমা কুরআন মজীদে সাধারণত ফিলিস্তীনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যখন কোন এলাকার নাম না নিয়ে এ গুণটি বর্ণনা করা হয় তখন এ থেকে এ এলাকার কথা বলা হয়েছে বলে মনে করা হয়। যেমন সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে ঃ

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

এবং সূরা আম্বিয়ায়ে বলা হয়েছে ঃ

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا –

এভাবে সূরা সাবা—এ বলা হয়েছে اَلْقُرَى الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا এ সবগুলো আয়াতে বরকত শব্দ ফিলিস্তীনের জনপদগুলোর সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়েছে।

৪৬. অর্থাৎ এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার পথ আমাকে জানাবেন।

৪৭. মূলে كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় বড় পাহাড়কে طود (তওদ) বলা হয়। লিসানুল আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে الطود – الجبل العظيم অর্থাৎ 'তওদ' মানে বিশাল পাহাড়। কাজেই এর পরে আবার عظيم গুণবাচক শব্দটি ব্যবহার করার অর্থ দাঁড়ায়—পানি উভয় দিকে খুব উঁচু উঁচু পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর আমরা এ বিষয়টিও চিন্তা করি যে, হযরত মূসার লাঠির আঘাতে সমুদ্রে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল। এ কাজটি একদিকে বনী ইসরাঈলের সমগ্র কাফেলাটির সাগর অতিক্রম করার জন্য করা হয়েছিল এবং অন্যদিকে এর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সমস্ত সৈন্য সামন্তকে ডুবিয়ে দেয়া। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, লাঠির আঘাতে পানি বিশাল উঁচু পাহাড়ের আকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং এতটা সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল, যতটা সময় লেগেছিল হাজার হাজার লাখো লাখো বনী ইসরাঈল তার মধ্য দিয়ে সাগর অতিক্রম করতে। তারপর ফেরাউনের সমগ্র সেনাবাহিনী তার মাঝখানে পৌঁছে গিয়েছিল। একথা সুস্পষ্ট, সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে যে ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হয় তা যতই তীব্র ও বেগবান হোক না কেন তার প্রভাবে কখনো সাগরের পানি এভাবে বিশাল পাহাড়ের মতো এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না। এরপর আরো সূরা তা-হা-এ বলা হয়েছে ঃ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا "তাদের জন্য সমুদ্রের বুকে শুকনো পথ তৈরি করে দাও।"

এর অর্থ দাঁড়ায়, সাগরের ওপর লাঠির আঘাত করার কারণে কেবল সাগরের পানি ফাঁক হয়ে গিয়ে দু'দিকে পাহাড় সমান উঁচু হয়ে যায়নি বরং মাঝখানে যে পথ বের হয় তা শুকনো খটখটেও হয়ে যায় এবং কোথাও এমন কোন কাদা থাকেনি যার ওপর দিয়ে হেঁটে চলা সম্ভব নয়। এ সংগে সূরা দু'খানের ২৪ আয়াতের এ শব্দগুলোও প্রণিধানযোগ্য যেখানে আল্লাহ্.হযরত মূসাকে নির্দেশ দেন, সমুদ্র অতিক্রম করার পর "তাকে এ অবস্থার ওপরই ছেড়ে দাও, ফেরাউনের সেনাদল এখানে নিমজ্জিত হবে।" এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত মূসা সমুদ্রের অপর পারে উঠে যদি সমুদ্রের ওপর লাঠির আঘাত করতেন, তাহলে উভয় দিকে খাড়া পানির দেয়াল ভেংগে পড়তো এবং সাগর সমান হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ তাঁকে এরূপ করতে নিষেধ করেন, যাতে ফেরাউনের সেনাদল এ পথে নেমে আসে এবং তারপর পানি দু'দিক থেকে এসে তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়। এটি একটি সুস্পষ্ট ও

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴿٧١﴾

৫ রুকূ'

আর তাদেরকে ইবরাহীমের কাহিনী শুনিয়ে দাও,[৫০] যখন সে তার বাপ ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল, "তোমরা কিসের পূজা করো?"[৫১] তারা বললো, "আমরা কতিপয় মূর্তির পূজা করি এবং তাদের সেবায় আমরা নিমগ্ন থাকি।"[৫২]

দ্ব্যর্থহীন মু'জিযার বর্ণনা। যারা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের আওতায় এ ঘটনাটির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তাদের চিন্তার গলদ এ থেকে একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা তা-হা, ৫৩ টীকা)

৪৮. অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সেনাদলকে।

৪৯. অর্থাৎ কুরাইশদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে শিক্ষা। এ শিক্ষাটি হচ্ছে ঃ হঠকারী লোকেরা প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ দেখেও কিভাবে ঈমান আনতে অস্বীকার করে যেতে থাকে এবং তারপর এ হঠকারিতার ফল কেমন ভয়াবহ হয়। ফেরাউন ও তার জাতির সমস্ত সরদার ও হাজার হাজার সেনার চোখে এমন পট্টি বাঁধা ছিল যে, বছরের পর বছর ধরে যেসব নিদর্শন তাদেরকে দেখিয়ে আসা হয়েছে সেগুলো তারা উপেক্ষা করে এসেছে, সবশেষে পানিতে ডুবে যাবার সময়ও তারা একথা বুঝলো না যে, সমুদ্র ঐ কাফেলার জন্য ফাঁক হয়ে গেছে, পানি পাহাড়ের মতো দু'দিকে খাড়া হয়ে আছে এবং মাঝখানে শুকনা রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। এ সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও তাদের জ্ঞানোদয় হলো না যে, মূসা আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে এবং এহেন শক্তির সাথে তারা লড়াই করতে যাচ্ছে। তাদের চেতনা জাগ্রত হলো এমন এক সময় যখন পানি দু'দিক থেকে তাদেরকে চেপে ধরেছিল এবং তারা আল্লাহর গযবের মধ্যে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল। সে সময় ফেরাউন চিৎকার করে উঠলো ঃ

آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"আমি ঈমান আনলাম এই এই মর্মে যে, বনী ইসরাঈল যে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তরভুক্ত।" (ইউনুস ৯০ আয়াত)

অন্যদিকে ঈমানদারদের জন্যও এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন। সেটি হচ্ছে, জুলুম ও তার শক্তিগুলো বাহ্যত যতই সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিক না কেন শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য-সহায়তায় সত্য এভাবেই বিজয়ী এবং মিথ্যার শির এভাবেই নত হয়ে যায়।

৫০. এখানে হযরত ইবরাহীমের পবিত্র জীবনের এমন এক যুগের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যখন নবুওয়াত লাভ করার পর শিরক ও তাওহীদের বিষয় নিয়ে তাঁর নিজের পরিবার ও নিজের সম্প্রদায়ের সাথে সংঘাত শুরু হয়েছিল। সে যুগের ইতিহাসের বিভিন্ন

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾

সে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা যখন তাদেরকে ডাকো তখন কি তারা তোমাদের কথা শোনে? অথবা তোমাদের কি কিছু উপকার বা ক্ষতি করে?" তারা জবাব দিল, "না, বরং আমরা নিজেদের বাপ-দাদাকে এমনটিই করতে দেখেছি।"[৫৩]

ঘটনা কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত সূরাগুলোতে বর্ণিত হয়েছে ঃ আল বাকারাহ ৩৫ রুকূ', আল আন'আম ৯ রুক', মার্‌য়াম ৩ রুকূ', আল আম্বিয়া ৫ রুকূ', আস্ সাফ্‌ফাত ৩ রুকূ' এবং আল মুম্‌তাহিনাহ ১ রুকূ'।

হযরত ইবরাহীমের জীবনের এ যুগের ইতিহাস কুরআন মজীদ বিশেষভাবে বারবার সামনে এনেছে। এর কারণ হচ্ছে, আরবের লোকেরা সাধারণভাবে এবং কুরাইশরা বিশেষভাবে নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসারী মনে করতো। তারা বলতো এবং দাবী করতো, ইবরাহীমের ধর্মই তাদের ধর্ম। আরবের মুশরিকরা ছাড়াও ইহুদি ও খৃষ্টানরাও হযরত ইবরাহীমকে তাদের ধর্মীয় নেতা বলে দাবী করতো। এ জন্য কুরআন মজীদ বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করেছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে দীন নিয়ে এসেছিলেন তা ছিল সেই একই নির্ভেজাল দীন ইসলাম যা আরবীয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এনেছেন এবং যার সাথে তোমরা আজ সংঘাতে লিপ্ত হয়েছো। তিনি মুশরিক ছিলেন না। বরং শিরকের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর সংগ্রাম এবং এ সংগ্রামের কারণে তাকে নিজের বাপ, পরিবার, জাতি ও দেশ সবকিছু ত্যাগ করে সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও হিজাযে প্রবাসীর জীবন যাপন করতে হয়েছিল। অনুরূপভাবে তিনি ইহুদী ও খৃষ্টানও ছিলেন না। বরং ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদ তো তাঁর বহু শতাব্দী পরে জন্ম নিয়েছিল। এ ঐতিহাসিক যুক্তির কোন জবাব মুশরিক, ইহুদী ও খৃষ্টান কারো কাছে ছিল না। কারণ মুশরিকরাও স্বীকার করতো, আরবে মূর্তি পূজার প্রচলন হয়েছিল হযরত ইবরাহীমের কয়েক শত বছর পরে। অন্যদিকে ইহুদিবাদ ও খৃষ্টবাদের জন্মের বহু পূর্বে হযরত ইবরাহীমের যুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, একথা ইহুদী ও খৃষ্টানরা অস্বীকার করতো না। এর স্বতস্ফূর্ত ফল স্বরূপ বলা যায়, যেসব বিশেষ আকীদা বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের ওপর তারা নিজেদের দীনের ভিত্তি স্থাপন করে তা প্রথম থেকে প্রচলিত প্রাচীন দীনের অংশ নয় এবং এসব মিশ্রণ মুক্ত নির্ভেজাল আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত দীনই সঠিক দীন। এরি ভিত্তিতে কুরআন বলছে ঃ

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ط

قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧٧﴾ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾

একথায় ইবরাহীম বললো, "কখনো কি তোমরা (চোখ মেলে) সেই জিনিসগুলো দেখেছো যাদের বন্দেগী তোমরা ও তোমাদের অতীত পূর্বপুরুষেরা করতে অভ্যস্ত?[৫৪] এরা তো সবাই আমার দুশ্মন[৫৫] একমাত্র রব্বুল আলামীন ছাড়া,[৫৬] যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন,[৫৭] তারপর তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন।

"ইবরাহীম ইহুদিও ছিল না এবং খৃষ্টানও ছিল না বরং সে তো একজন একনিষ্ঠ মুসলিম ছিল। আর সে মুশরিকও ছিল না। আসলে ইবরাহীমের সাথে সম্পর্ক রাখার সবচেয়ে বেশী অধিকার তাদের, যারা তার পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং (এখন এ অধিকার) এ নবীর এবং এর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের।"

(আলে ইমরান ঃ ৬৭–৬৮)

৫১. তারা কিসের পূজা করছে তা জানা হযরত ইবরাহীমের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ সেখানে তারা যেসব মূর্তির পূজা করতো তা তিনি নিজে দেখতেন। কাজেই তাঁর প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তিনি তাদের দৃষ্টি ও চিন্তা এদিকে আকৃষ্ট করতে চাচ্ছিলেন যে, তোমরা যেসব উপাস্যের সামনে ষষ্ঠাংগে প্রণিপাত করছো তাদের স্বরূপ কি? সূরা আম্বিয়াতে এ প্রশ্নটিকে এভাবে করা হয়েছে ঃ

"এসব কেমন প্রতিমা যেগুলোর প্রতি ভক্তিতে তোমরা গদগদ হচ্ছো?"

৫২. আমরা কিছু মূর্তির পূজা করি, এ জবাবও নিছক একটা সংবাদ জানিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বলা হয়নি। কারণ প্রশ্নকর্তা ও জবাবদাতা উভয়ের সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিল। নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি তাদের অবিচলতাই ছিল এ জবাবের আসল প্রাণসত্তা। অর্থাৎ তারা আসলে বলতে চাচ্ছিল, হাঁ, আমরাও জানি এগুলো কাঠ ও পাথরের তৈরি প্রতিমা। আমরা এগুলোর পূজা করি। কিন্তু আমরা এ গুলোরই পূজা ও সেবা করে যাবো, এটিই আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাস।

৫৩. অর্থাৎ এরা আমাদের প্রার্থনা, মুনাজাত ও ফরিয়াদ শোনে অথবা আমাদের উপকার বা ক্ষতি করে মনে করে আমরা এদের পূজা করতে শুরু করেছি তা নয়। আমাদের এ পূজা-অর্চনার কারণ এটা নয়। বরং আমাদের এ পূজা–অর্চনার আসল কারণ হচ্ছে, আমাদের বাপ–দাদার আমল থেকে তা এভাবেই চলে আসছে। এভাবে তারা নিজেরাই একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, তাদের ধর্মের পেছনে তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই। অন্য কথায় তারা যেন বলছিল, তুমি আমাদের কি এমন নতুন কথা বলবে? আমরা নিজেরা দেখছি না এগুলো কাঠ ও পাথরের মূর্তি? আমরা কি জানি না, কাঠ শোনে না এবং পাথর কারো ইচ্ছা পূর্ণ করতে বা ব্যর্থ করে দিতে পারে না? কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষরা শত শত বছর ধরে বংশ পরম্পরায় এদের পূজা

করে আসছে। তোমার মতে তারা সবাই কি বোকা ছিল? তারা এসব নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলোর পূজা করতো, নিশ্চয়ই এর কোন কারণ থাকবে। কাজেই আমরাও তাদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে এ কাজ করছি।

৫৪. অর্থাৎ ব্যস, স্রেফ বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসছে বলেই তাকে সত্য ধর্ম বলে মেনে নিতে হবে, একটি ধর্মের সত্যতার জন্য শুধুমাত্র এতটুকু যুক্তিই কি যথেষ্ট? চোখ বন্ধ করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাবে এবং কেউ একবার চোখ খুলে দেখবেও না যাদের বন্দেগী-পূজা-অর্চনা করা হচ্ছে তাদের মধ্যে সত্যিই আল্লাহর গুণাবলী পাওয়া যায় কি না এবং আমাদের ভাগ্যের ভাংগা-গড়ার ক্ষেত্রে তারা কোন ক্ষমতা রাখে কি না?

৫৫. অর্থাৎ চিন্তা করলে আমি দেখতে পাই, যদি আমি এদের পূজা করি তাহলে আমার দুনিয়া ও আখেরাত দু'টোই বরবাদ হয়ে যাবে। আমি এদের ইবাদাত করাকে শুধুমাত্র অলাভজনক ও অক্ষতিকরই মনে করি না বরং উল্টা ক্ষতিকর মনে করি। তাই আমার মতে তাদেরকে পূজা করা এবং শত্রুকে পূজা করা এক কথা। তাছাড়া হযরত ইবরাহীমের এ উক্তির মধ্যে সূরা মারয়ামে যে কথা বলা হয়েছে সেদিকেও ইংগিত করা হয়েছে। সূরা মারয়ামে বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ○ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ
بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, যাতে তারা তাদের জন্য শক্তির মাধ্যম হয়। কখ্খনো না, শিগগির সে সময় আসবে যখন তারা তাদের পূজা-ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং উল্টা তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।" (৮১-৮২ আয়াত)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে এবং পরিষ্কার বলে দেবে, আমরা কখনো তাদেরকে আমাদের পূজা করতে বলিনি এবং তারা আমাদের পূজা করতো একথা আমরা জানিও না।

এখানে প্রচার কৌশলের একটি বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য। হযরত ইবরাহীম একথা বলেননি যে, এরা তোমাদের শত্রু বরং বলছেন এরা আমার শত্রু। যদি তিনি বলতেন এরা তোমাদের শত্রু, তাহলে প্রতিপক্ষের হঠকারী হয়ে ওঠার বেশী সুযোগ থাকতো। তারা তখন বিতর্ক শুরু করতো এরা কেমন করে আমাদের শত্রু হয় বলো। পক্ষান্তরে যখন তিনি বললেন তারা আমার শত্রু তখন প্রতিপক্ষের জন্যও চিন্তা করার সুযোগ হলো। তারাও ভাবতে পারলো, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেমন নিজের ভালো-মন্দের চিন্তা করছেন তেমনি আমাদেরও নিজেদের ভালো-মন্দের চিন্তা করা উচিত। এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ) যেন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাবজাত আবেগ-অনুভূতির কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যার ভিত্তিতে তারা নিজেরাই হয় নিজেদের শুভাকাংখী এবং জেনে শুনে কখনো নিজেদের মন্দ চায় না। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি তো এদের ইবাদাত করার মধ্যে আগাগোড়াই ক্ষতি দেখি এবং জেনে বুঝে আমি নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মারতে

তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।[৫৮] তিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন এবং পুনর্বার আমাকে জীবন দান করবেন। তাঁর কাছে আমি আশা করি, প্রতিদান দিবসে তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।[৫৯]

পারি না। কাজেই দেখে নাও আমি নিজে তাদের ইবাদাত-পূজা-অর্চনা থেকে পুরোপুরি দূরে থাকছি। এরপর প্রতিপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই একথা চিন্তা করতে বাধ্য ছিল যে, তাদের লাভ কিসে এবং জেনে বুঝে তারা নিজেদের অমংগল চাচ্ছে না তো।

৫৬. অর্থাৎ পৃথিবীতে যেসব উপাস্যের বন্দেগী ও পূজা করা হয় তাদের মধ্যে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনই আছেন যার বন্দেগীর মধ্যে আমি নিজের কল্যাণ দেখতে পাই এবং যাঁর ইবাদাত আমার কাছে শত্রুর নয় বরং একজন প্রকৃত পৃষ্ঠপোশকের ইবাদাত বলে বিবেচিত হয়। এরপর হযরত ইবরাহীম একমাত্র রব্বুল আলামীনই ইবাদাতের হকদার কেন, এর কারণগুলো কয়েকটি বাক্যে বর্ণনা করেছেন। এভাবে তিনি নিজের প্রতিপক্ষের মনে এ অনুভূতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন যে, তোমাদের কাছে তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য উপাস্যদের পূজা করার স্বপক্ষে বাপ-দাদার অনুকরণ ছাড়া বর্ণনা করার মতো আর কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই কিন্তু আমার কাছে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণ আছে, যা তোমরাও অস্বীকার করতে পারো না।

৫৭. এটি প্রথম কারণ, যার ভিত্তিতে আল্লাহ এবং একমাত্র আল্লাহই ইবাদাতের হকদার। প্রতিপক্ষও এ সত্যটি জানতো এবং মেনেও নিয়েছিল যে, আল্লাহ তাদের সৃষ্টিকর্তা। তাদের সৃষ্টিতে অন্য কারো কোন অংশ নেই, একথাও তারা স্বীকার করতো। এমন কি তাদের উপাস্যরা নিজেরাও যে আল্লাহর সৃষ্টি এ ব্যাপারে হযরত ইবরাহীমের জাতিসহ সকল মুশারিকদের বিশ্বাস ছিল। নাস্তিকরা ছাড়া বাকি দুনিয়ার আর কোথাও কেউ একথা অস্বীকার করেনি। আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা তাই হযরত ইবরাহীমের প্রথম যুক্তি ছিল, আমি একমাত্র তাঁর ইবাদাতকে সঠিক ও যথার্থ মনে করি যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অন্য কোন সত্তা কেমন করে আমার ইবাদাতের হকদার হতে পারে, যেহেতু আমাকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে তার কোন অংশ নেই। প্রত্যেক সৃষ্টি অবশ্যি তার নিজের স্রষ্টার বন্দেগী করবে। যে তার স্রষ্টা নয়, তার বন্দেগী করবে কেন?

৫৮. একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার স্বপক্ষে এটি হচ্ছে দ্বিতীয় যুক্তি। যদি তিনি মানুষকে কেবল সৃষ্টি করেই ছেড়ে দিতেন এবং সামনের দিকে তার দুনিয়ায় জীবন যাপনের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখতেন তাহলেও মানুষের তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো সহায়তা চাওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকতো। কিন্তু তিনি তো সৃষ্টি করার সাথে সাথে পথনির্দেশনা, প্রতিপালন, দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। যে মুহূর্তে মানুষ দুনিয়ায় পদার্পণ করে তখনই তার মায়ের বুকে দুধের ধারা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে স্তন চোযার ও গলা দিয়ে দুধ নিচের দিকে নামিয়ে নেবার কায়দা শিখিয়ে দেয়। তারপর এ প্রতিপালন, প্রশিক্ষণ ও পথ প্রদর্শনের কাজ প্রথম দিন থেকে শুরু হয়ে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বরাবর চালু থাকে। জীবনের প্রতি পর্যায়ে মানুষের নিজের অস্তিত্ব, বিকাশ, উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বের জন্য যেসব ধরনের সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় তা সবই তার স্রষ্টা পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সর্বত্রই সঠিকভাবে যোগান দিয়ে রেখেছেন। এ সাজ-সরঞ্জাম থেকে লাভবান হবার এবং একে কাজে লাগাবার জন্য তার যে ধরনের শক্তি ও যোগ্যতার প্রয়োজন তা সবও তার আপন সত্তায় সমাহিত রাখা হয়েছে। জীবনের প্রতিটি বিভাগে তার যে ধরনের পথনির্দেশনার প্রয়োজন হয় তা দেবার পূর্ণ ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন। এ সংগে তিনি মানবিক অস্তিত্বের সংরক্ষণের এবং তাকে বিপদ-আপদ, রোগ-শোক, ধ্বংসকর জীবাণু ও বিষাক্ত প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য তার নিজের শরীরের মধ্যে এমন শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন মানুষের জ্ঞান এখনো যার পুরোপুরি সন্ধান লাভ করতে পারেনি। আল্লাহর এ শক্তিশালী প্রাকৃতিক ব্যবস্থা যদি না থাকতো, তাহলে সামান্য একটি কাঁটা শরীরের কোন অংশে ফুটে যাওয়াও মানুষের জন্য ধ্বংসকর প্রমাণিত হতো এবং নিজের চিকিৎসার জন্য মানুষের কোন প্রচেষ্টাই সফল হতো না। স্রষ্টার এ সর্বব্যাপী অনুগ্রহ ও প্রতিপালন কর্মকাণ্ড যখন প্রতি মুহূর্তে সকল দিক থেকে মানুষকে সাহায্য করছে তখন মানুষ তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন সত্তার সামনে মাথা নত করবে এবং প্রয়োজন পূরণ ও সংকট উত্তরণের জন্য অন্য কারো আশ্রয় গ্রহণ করবে, এর চেয়ে বড় মূর্খতা ও বোকামী এবং এর চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা আর কী হতে পারে?

৫৯. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত যে ঠিক নয় এ হচ্ছে তার তৃতীয় কারণ। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক কেবলমাত্র এ দুনিয়া এবং এখানে সে যে জীবন যাপন করে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অস্তিত্বের সীমানায় পা রাখার পর থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথেই তা খতম হয়ে যায় না। বরং এরপর তার পরিণামও পুরোপুরি আল্লাহরই হাতে আছে। আল্লাহই তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। সবশেষে তিনি তাকে দুনিয়া থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যা মানুষের এ ফিরে যাওয়ার পথ রোধ করতে পারে। যে হাতটি মানুষকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যায় আজ পর্যন্ত কোন ঔষধ, চিকিৎসক দেব-দেবীর হস্তক্ষেপ তাকে পাকড়াও করতে পারেনি। এমন কি মানুষেরা যে একদল মানুষকে উপাস্য বানিয়ে পূজা-আরাধনা করেছে তারা নিজেরাও নিজেদের মৃত্যুকে এড়াতে পারেনি। একমাত্র আল্লাহই ফায়সালা করেন, কোন্ ব্যক্তিকে কখন এ দুনিয়া থেকে ফিরিয়ে নেবেন এবং যখন যার তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার সমন এসে যায় তখন ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাকে চলে যেতেই হয়। তারপর আল্লাহ একাই ফায়সালা করেন, দুনিয়ায় যেসব মানুষ জন্ম নিয়েছিল তাদের সবাইকে

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

(এরপর ইবরাহীম দোয়া করলো ঃ) "হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করো[৬০] এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করো।[৬১] আর পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আমার সত্যিকার খ্যাতি ছড়িয়ে দিও[৬২] এবং আমাকে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতের অধিকারীদের অন্তরভুক্ত করো। আর আমার বাপকে মাফ করে দাও, নিসন্দেহে তিনি পথভ্রষ্টদের দলভুক্ত[৬৩] ছিলেন এবং সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না যেদিন সবাইকে জীবিত করে উঠানো হবে,[৬৪] যেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে লাগবে না, তবে যে বিশুদ্ধ অন্তকরণ নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে।"[৬৫]

কখন পুনর্বার জীবন দান করবেন এবং তাদের পৃথিবীর জীবনের কাজ-কারবারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তখনো মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন থেকে কাউকে রেহাই দেয়া বা নিজে রেহাই পাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। প্রত্যেককে তাঁর হুকুমে উঠতেই হবে এবং তাঁর আদালতে হাজির হতেই হবে। তারপর সেই আল্লাহ একাই সেই আদালতের বিচারপতি হবেন। তাঁর ক্ষমতায় কেউ সামান্যতমও শরীক হবে না। শাস্তি দেয়া বা মাফ করা উভয়টিই হবে সম্পূর্ণ তাঁর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি যাকে শাস্তি দিতে চান কেউ তাকে ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখে না। অথবা তিনি কাউকে ক্ষমা করতে চাইলে কেউ তাকে শাস্তি দিতে পারবে না। দুনিয়ায় যাদেরকে ক্ষমা করিয়ে নেবার ইখতিয়ার আছে বলে মনে করা হয় তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষমার জন্য তাঁরই অনুগ্রহ ও দয়ার দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকবে। এসব জাজ্বল্যমান সত্যের উপস্থিতিতে যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী করে সে নিজেই নিজের অশুভ পরিণামের ব্যবস্থা করে। দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের ভাগ্য পুরোপুরি ন্যস্ত থাকে আল্লাহর হাতে। আর সেই ভাগ্য গড়ার জন্য মানুষ এমন সব সত্তার আশ্রয় নেবে যাদের হাতে কিছুই নেই, এরচেয়ে বড় ভাগ্য বিপর্যয় আর কী হতে পারে?

৬০. "হুকুম" অর্থ এখানে নবুওয়াত গ্রহণ করা সঠিক হবে না। কারণ এটা যে সময়ের দোয়া সে সময় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নবুওয়াত দান করা হয়ে গিয়েছিল। আর ধরে নেয়া যাক যদি এ দোয়া তার আগেরও হয়ে থাকে, তাহলে নবুওয়াত কেউ চাইলে তাকে দান করা হয় না বরং এটি এমন একটি দান যা আল্লাহ নিজেই যাকে চান

তাকে দান করেন। তাই এখানে 'হুকুম' অর্থ জ্ঞান, হিকমত, প্রজ্ঞা, সঠিক বুঝ-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত করার শক্তি গ্রহণ করাই সঠিক হবে। হযরত ইবরাহীমের (আ) এ দোয়াটি প্রায় সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে অর্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ দোয়া উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন أَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ অর্থাৎ আমাদের এমন যোগ্যতা দাও যাতে আমরা প্রত্যেকটি জিনিসকে তার যথার্থ স্বরূপে দেখতে পারি এবং প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যা তার প্রকৃত স্বরূপের প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা উচিত।

৬১. অর্থাৎ দুনিয়ায় আমাকে সৎ সমাজ-সংসর্গ দান করো এবং আখেরাতের ময়দানে সৎলোকদের সাথে আমাকে সমবেত করো। আখেরাত সম্পর্কে বলা যায়, আখেরাতের ময়দানে সৎলোকদের সাথে কারো সমবেত হওয়া তার মুক্তি লাভ করার সমার্থক হয়ে থাকে। তাই মৃত্যু পরের জীবন ও কিয়ামতের ময়দানে কর্মের প্রতিফল দানের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিরই এ দোয়া করা উচিত। কিন্তু দুনিয়াতেও পবিত্র জীবনের অধিকারী সৎকর্মশীল ব্যক্তির অন্তরের আকাংখাই এই হয়ে থাকে যে, আল্লাহ যেন তাকে একটি ফাসেক, নোংরা ও অসুস্থ সমাজে জীবন যাপন করার বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দেন এবং সৎলোকদের সাথে ওঠা-বসা ও চলা-ফেরা করার সুযোগ দান করেন। সামাজিক বিকৃতি ও অসুস্থতা যেখানে চারদিকে বিস্তার লাভ করে সেখানে কেবলমাত্র এটাই সর্বক্ষণ একজন লোককে মানসিক পীড়া দেয় না যে, তার চারদিকে সে কেবল নোংরামীই নোংরামী দেখছে বরং তার নিজের পবিত্র জীবন যাপন করা এবং দূষিত আবর্জনার ছিটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাও তার পক্ষে কঠিন হয়ে থাকে। তাই একজন সৎলোক ততক্ষণ পর্যন্ত অস্থির থাকে যতক্ষণ না তার নিজের সমাজ পবিত্র ও সুস্থ হয়ে যায় অথবা সে এ সমাজ থেকে বের হয়ে সত্য ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত অন্য একটি সমাজের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়।

৬২. অর্থাৎ ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন মর্যাদা ও শুভেচ্ছা সহকারে আমার নাম স্মরণ করে। দুনিয়ায় যেন আমি এমন কাজ না করে যাই যার ফলে ভবিষ্যত বংশধররা আমার পরে আমাকে এমন সব জালেমদের দলভুক্ত করে যারা নিজেরাও ছিল অসৎ ও বিকৃত চরিত্রের অধিকারী এবং দুনিয়াকেও অসৎ ও বিকৃতির পথে চালিয়ে গেছে। বরং আমি যেন এমন সব কাজ করে যাই যার ফলে কিয়ামত পর্যন্ত আমার জীবন মানুষের জন্য আলোক বর্তিকার কাজ করে এবং আমাকে মানব হিতৈষী ও মানব জাতির সেবক গণ্য করা হয়। এটি নিছক লোক দেখানো খ্যাতি ও সুনাম অর্জনের দোয়া নয় বরং প্রকৃত সুখ্যাতি ও যথার্থ সুনাম অর্জনের দোয়া। নিশ্চিত খাঁটি জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম ও সেবাকর্মের ফলে এ সুখ্যাতি অর্জিত হয়। কোন ব্যক্তির এ জিনিস অর্জিত হলে দু'টো লাভ ও উপকার হয়। দুনিয়ায় এর ফলে মানব জাতির ভবিষ্যত বংশধররা খারাপ আদর্শের পরিবর্তে একটি ভালো আদর্শ পেয়ে যায়। এ থেকে তারা ভালো দৃষ্টান্ত লাভ করে এবং ভালো দৃষ্টান্ত থেকে পায় ভালো হবার শিক্ষা। প্রত্যেক সৎব্যক্তি এর মাধ্যমে সত্য-সঠিক পথে চলার প্রেরণা লাভ করে। আর আখেরাতে এর ফলে এক ব্যক্তির ভালো কর্মকাণ্ড অনুসরণ করে যত জন লোকই সৎপথের সন্ধান লাভ করে তাদের সওয়াব সে ও লাভ করবে এবং কিয়ামতের দিন তার নিজের কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে কোটি কোটি মানুষের সাক্ষ্যও তার

সপক্ষে উপস্থিত থাকবে যাতে বলা হবে, সে দুনিয়ায় কল্যাণ ও সৎকর্মের এমন স্রোত ধারা প্রবাহিত করে এসেছিল যে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম যুগ যুগ ধরে সে ধারায় অবগাহন করেছে।

৬৩. কোন কোন মুফাস্সির হযরত ইবরাহীমের মাগফেরাতের দোয়ার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, তাঁর এ মাগফেরাত কামনা ছিল ইসলামের শর্তসাপেক্ষে। কাজেই তাঁর নিজের পিতার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করাটা ছিল যেন আল্লাহ তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দান করেন, এ ধরনের একটি দোয়া। কিন্তু কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা সংশ্লিষ্ট মুফাস্সিরগণের এ ব্যাখ্যার সাথে মেলে না। কুরআন বলছে, হযরত ইবরাহীম নিজের পিতার জুলুম সইতে না পেরে যখন ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন তখন বলেন ঃ

سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ۝

"আপনাকে সালাম, আমি আপনাকে ক্ষমা করার জন্য নিজের রবের কাছে দোয়া করবো। তিনি আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান।" (মার্‌য়াম, ৪৭ আয়াত)

এ প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তিনি এ মাগফেরাতের দোয়া করেন কেবলমাত্র নিজের পিতার জন্য নয় বরং অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে মাতা ও পিতা উভয়ের জন্য করেন ঃ رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ "হে আমাদের রব! আমার গোনাহ মাফ করো এবং আমার মাতা-পিতারও।" (ইবরাহীম, ৪১ আয়াত) কিন্তু পরে তিনি নিজেই অনুভব করেন, একজন সত্যের দুশমন একজন মু'মিনের পিতা হলেও মাগফেরাতের দোয়ার হকদার হয় না।

مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗۤ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ۭ

"ইবরাহীমের নিজের পিতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা নিছক তার প্রতিশ্রুতির কারণে ছিল, যা সে করেছিল। কিন্তু সে যে আল্লাহর দুশমন, একথা যখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল তখন সে তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করলো।"

(আত্ তাওবা, ১১৪ আয়াত)

৬৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমাকে এমন অপমানকর অবস্থার সম্মুখীন করো না যেখানে হাশরের ময়দানে পূর্বের ও পরের সমগ্র জনগোষ্ঠী একত্র হবে সেখানে তাদের সবার সামনে ইবরাহীমের পিতা শাস্তি পেতে থাকবে এবং ইবরাহীম তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে।

৬৫. এ বাক্যাংশ দু'টি কি হযরত ইবরাহীমের (আ) দোয়ার অংশ অথবা আল্লাহ তাঁর বক্তব্যের সাথে নিজে এটুকু বাড়িয়ে যোগ করে দিয়েছেন, একথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। যদি প্রথম কথাটি মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, হযরত ইবরাহীম (আ) নিজের পিতার জন্য এ দোয়া করার সময় নিজেই এ সত্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾

—(সেদিন[৬৬]) জান্নাত মুত্তাকীদের কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে এবং জাহান্নাম পথভ্রষ্টদের সামনে খুলে দেয়া হবে।[৬৭] আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদাত করতে তারা এখন কোথায়? তারা কি এখন তোমাদের কিছু সাহায্য করছে অথবা আত্মরক্ষা করতে পারে?" তারপর সেই উপাস্যদেরকে এবং এই পথভ্রষ্টদেরকে আর ইবলীসের বাহিনীর সবাইকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।[৬৮] সেখানে এরা সবাই পরস্পর ঝগড়া করবে এবং পথভ্রষ্টরা (নিজেদের উপাস্যদেরকে) বলবে, "আল্লাহর কসম আমরা তো স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিলাম, যখন তোমাদের দিচ্ছিলাম রব্বুল আলামীনের সমকক্ষের মর্যাদা। আর এ অপরাধীরাই আমাদের ভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে।[৬৯]

আর দ্বিতীয় কথাটি মেনে নেয়া হলে এর অর্থ হবে, তাঁর দোয়ার ওপর মন্তব্য প্রসংগে আল্লাহ একথা বলছেন যে, কিয়ামতের দিন যদি কোন জিনিস মানুষের কাজে লাগতে পারে, তাহলে তা তার ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি নয় বরং একমাত্র প্রশান্ত চিত্ত এমন একটি অন্তর যা কুফরী, শিরক, নাফরমানী, ফাসেকী ও অশ্লীল কার্যকলাপ মুক্ত। ধনসম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিও প্রশান্ত ও নির্মল অন্তরের সাথেই উপকারী হতে পারে। প্রশান্ত অন্তরকে বাদ দিয়ে এদের কোন উপকারিতা নেই। ধন সেখানে কেবলমাত্র এমন অবস্থায় উপকারী হবে যখন মানুষ দুনিয়ায় ঈমান ও অন্তরিকতা সহকারে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। নয়তো কোটিপতি ও বিলিয়ন বিলিয়ন সম্পদের মালিকরাও সেখানে পথের ভিখারীই হবে। সন্তানদেরও দুনিয়ায় মানুষ নিজের সামর্থ অনুযায়ী ঈমান ও সৎ-কর্মের শিক্ষা দিলে তবেই তারা সেখানে কাজে লাগতে পারে। অন্যথায় পুত্র যদি নবীও হয়ে থাকেন, তাহলে যে পিতা কুফরী ও গোনাহের মধ্যে নিজের জীবনকাল শেষ করেছে এবং সন্তানের সৎকাজে যার কোন অংশ নেই তার শাস্তি পাওয়া থেকে কোন নিষ্কৃতি নেই।

৬৬. এখান থেকে শেষ প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত সমস্ত বাক্য হযরত ইবরাহীমের (আ) উক্তির অংশ মনে হয় না বরং এর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার মনে হয় যে, এগুলো আল্লাহর উক্তি।

৬৭. অর্থাৎ একদিকে মুত্তাকিরা জান্নাতে প্রবেশ করার আগেই দেখতে থাকবে, আল্লাহর মেহেরবানীতে কেমন নিয়ামতে পরিপূর্ণ জায়গায় তারা যাবে। অন্যদিকে পথভ্রষ্টরা তখনো হাশরের ময়দানেই অবস্থান করবে। যে জাহান্নামে তাদের গিয়ে থাকতে হবে তার ভয়াবহ দৃশ্য তাদের সামনে উপস্থাপিত করা হবে।

৬৮. মূলে كُبْكِبُوْا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি অর্থ নিহিত। এক, একজনের ওপর অন্য একজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে। দুই, তারা জাহান্নামের গর্তের তলদেশ পর্যন্ত গড়িয়ে যেতে থাকবে।

৬৯. ভক্ত-অনুরক্তদের পক্ষ থেকে এভাবে তাদের খাতির তোয়াজ করা হবে। অথচ এ ভক্ত-অনুরক্তরাই দুনিয়ায় এদেরকে বুজর্গ, গুরু ও নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। এদের হাতে-পায়ে চুমো দেয়া হতো। এদের কথা ও কাজকে প্রামাণ্য ও আদর্শ বলে স্বীকার করা হতো। এদের সমীপে নজরানা ও মানত পেশ করা হতো। পরকালে গিয়ে যখন সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং অনুসারীবৃন্দ জানতে পারবে অগ্রবর্তীরা কোথায় চলে এসেছে এবং তাদেরকে কোথায় নিয়ে এসেছে তখন এ ভক্ত-অনুরক্তের দল তাদেরকে অপরাধী গণ্য করবে এবং অভিশাপ দেবে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে পরকালীন জগতের এ শিক্ষনীয় চিত্র অংকন করা হয়েছে, যাতে দুনিয়ায় অন্ধ অনুসারীদের চোখ খুলে যায় এবং কারো পেছনে চলার আগে তারা দেখে নিতে পারে অগ্রবর্তীরা সঠিক পথে যাচ্ছে কিনা। সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে ঃ

كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ط حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا لا قَالَتْ اُخْرٰهُمْ لِاُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰۤؤُلَاۤءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ط قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ○

"প্রত্যেকটি দল যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন তার নিজের সাথী দলের ওপর অভিশাপ দিতে দিতে যাবে। এমন কি যখন সবাই সেখানে একত্র হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের রব! এরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, এখন এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দাও। রব বলবেন, সবার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি কিন্তু তোমরা জানো না।" (৩৮ আয়াত)

সূরা হা-মীম আস্ সাজদায় বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَاۤ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ○

"আর কাফেররা সে সময় বলবে, হে আমাদের রব! জিন ও মানুষদের মধ্য থেকে তাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, যাতে আমরা তাদেরকে পায়ের তলায় পিষে ফেলতে পারি এবং তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।" (২৯ আয়াত)

এখন আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই[৭০] এবং কোন অন্তরংগ বন্ধুও নেই।[৭১] হায় যদি আমাদের আবার একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ মিলতো, তাহলে আমরা মু'মিন হয়ে যেতাম।"[৭২]

নিসন্দেহে এর মধ্যে একটি বড় নিদর্শন রয়েছে,[৭৩] কিন্তু এদের অধিকাংশ মু'মিন নয়। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালীও এবং করুণাময়ও।

এ বিষয়বস্তুটিই সূরা আহযাবে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَ نَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ ○ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ○

"আর তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছি এবং তারা আমাদের সোজা পথ থেকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের প্রতি কঠোর লানত বর্ষণ করো।" (৬৭–৬৮ আয়াত)

৭০. অর্থাৎ যাদেরকে আমরা দুনিয়ায় সুপারিশকারী মনে করতাম এবং যাদের সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, তাদের পক্ষপুটে যে আশ্রয় নিয়েছে, সে বেঁচে গেছে। তাদের কেউ সুপারিশ করার জন্য মুখ খুলবে না।

৭১. অর্থাৎ এমন কেউ নেই, যে আমাদের দুঃখে দুঃখ অনুভব করে এবং আমাদের ব্যথায় সমব্যথী হয়। অন্তত আমাদের ছাড়িয়ে নিতে না পারলেও আমাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করবে এমনও কেউ নেই। কুরআন মজীদ বলছে, আখেরাতে একমাত্র মুমিনদের মধ্যে বন্ধুত্ব অব্যাহত থাকবে। অন্যদিকে পথভ্রষ্টরা দুনিয়ায় যতই গভীর ও আন্তরিক বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ থেকে থাক না কেন সেখানে পৌঁছে তারা পরস্পরের প্রাণের শত্রুতে পরিণত হবে। তারা পরস্পরকে অপরাধী গণ্য করবে এবং পরস্পরকে পরস্পরের ধ্বংস ও সর্বনাশের জন্য দায়ী করে একে অন্যকে বেশী শাস্তি দান করাবার চেষ্টা করবে।

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ –

"বন্ধুরা সেদিন হবে একে অন্যের শত্রু কিন্তু মুত্তাকীদের বন্ধুত্ব অপরিবর্তিত থাকবে।" (আয্ যুখ্রুফঃ ৬৭ আয়াত)

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ ۣالْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾

৬ রুকূ'

নূহের[৭৪] সম্প্রদায় রসূলদেরকে মিথ্যুক বললো।[৭৫] স্মরণ করো যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিল, "তোমরা কি ভয় করো না?[৭৬]

৭২. এ আকাংখার জবাবও কুরআনে দেয়া হয়েছে ঃ

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ

"যদি তাদেরকে পূর্ববর্তী জীবনে ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা তাই করতে থাকবে যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।" (আন'আম ঃ ২৮ আয়াত)

যেসব কারণে তাদেরকে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হবে না তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তাফহীমুল কুরআন সূরা মু'মিনুনের ৯০ থেকে ৯২ টীকায়।

৭৩. হযরত ইবরাহীমের এ কাহিনীতে নিদর্শনের তথা শিক্ষার দু'টি দিক রয়েছে। একটি দিক হচ্ছে, আরবের মুশরিকরা একদিকে হযরত ইবরাহীমের (আ) অনুসারী হবার দাবী করতো এবং তাঁর সাথে নিজেদের সম্পর্ক দেখিয়ে গর্ব করতো। কিন্তু অন্যদিকে তারা সেই একই শিরকে লিপ্ত রয়েছে যার বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন এবং তিনি যে দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন আজ যে নবী তা পেশ করছেন তার বিরুদ্ধে তারা ঠিক তাই করছে যা হযরত ইবরাহীমের জাতি তাঁর সাথে করেছিল। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, হযরত ইবরাহীম তো ছিলেন শিরকের শত্রু ও তাওহীদের দাওয়াতের পতাকাবাহী। তোমরা নিজেরাও জানো, হযরত ইবরাহীম মুশরিক ছিলেন না। কিন্তু এরপরও তোমরা নিজেদের জিদ বজায় রেখে চলছো। এ কাহিনীতে নিদর্শনের দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে, ইবরাহীমের জাতি দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে, কোথাও তাদের নাম নিশানাও নেই। তাদের মধ্য থেকে যদি কারো বেঁচে থাকার সৌভাগ্য হয়ে থাকে তাহলে তারা হচ্ছেন কেবলমাত্র হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর দুই ছেলের (ইসমাঈল ও ইসহাক) বংশধরগণ। হযরত ইবরাহীম তাঁর জাতির মধ্য থেকে বের হয়ে যাবার পর তাদের ওপর যে আযাব আসে কুরআন মজীদে যদিও তার উল্লেখ নেই কিন্তু আযাব প্রাপ্ত জাতিদের মধ্যে তাদেরকে গণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَتِ – (التوبة : ٧٠)

৭৪. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন আল আরাফ ৫৯–৬৪, ইউনুস ৭১–৭৩, হূদ ২৫–৪৮, বনী ইসরাঈল ৩, আল আম্বিয়া ৭৬–৭৭, আল মু'মিনূন ২৩–৩০, আল ফুরকান ৩৭ আয়াত এবং এছাড়া নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রসূল।[৭৭] কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।[৭৮] একাজে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমাকে প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের।[৭৯]

নিম্নোক্ত স্থানগুলোও সামনে রাখুনঃ আল আনকাবূত ১৪–১৫, আস্ সাফ্‌ফাত ৭৫–৮২, আল কামার ৯–১৫ আয়াত এবং সূরা নূহ সম্পূর্ণ।

৭৫. যদিও তারা একজন মাত্র রসূলকে অস্বীকার করেছিল কিন্তু যেহেতু রসূলকে অস্বীকার করা আসলে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে পয়গাম নিয়ে এসেছেন তাকে অস্বীকার করা হয়, তাই যে ব্যক্তি বা দল কোন একজন রসূলকেও অস্বীকার করে সে আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল রসূলকে অস্বীকারকারীতে পরিণত হয়। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সত্য। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি তাদেরকেও কাফের গণ্য করা হয়েছে যারা কেবলমাত্র একজন নবীকে অস্বীকার করতো এবং অন্যান্য সকল নবীকে মানতো। এর কারণ হচ্ছে, যে ব্যক্তি রিসালাতের মূল পয়গাম মেনে নেয় সে অনিবার্যভাবে প্রত্যেক রসূলকে মেনে নেবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন একজন রসূলকে অস্বীকার করে সে যদি অন্য সকল রসূলকে মানেও তাহলে কোন গোত্র, দল বা সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতি অথবা পূর্ব পুরুষদের অনুসৃতির কারণেই মানে, রিসালাতের মূল পয়গামকে মানে না। অন্যথায় একই সত্য একজন পেশ করলে মেনে নেবে এবং অন্যজন পেশ করলে অস্বীকার করবে, এটা কখনো সম্ভব ছিল না।

৭৬. অন্যান্য স্থানে হযরত নূহ তাঁর নিজের জাতিকে যে প্রাথমিক সম্বোধন করেছিলেন তার শব্দাবলী নিম্নরূপ ঃ

اُعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

"আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই, তাহলে তোমরা কি ভয় করো না?" (আল মু'মিনূন ২৩ আয়াত)

اُعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

"আল্লাহর বন্দেগী করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।"
(নূহ ৩ আয়াত)

তাই এখানে হযরত নূহের এ উক্তির অর্থ নিছক ভীতি নয় বরং আল্লাহ ভীতি। অর্থাৎ তোমাদের কি আল্লাহর ভয় নেই? তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের বন্দেগী করার সময় তোমরা একটুও ভেবে দেখো না, এ বিদ্রোহাত্মক নীতির পরিণাম কি হবে?

দাওয়াতের সূচনায় ভয় দেখাবার কারণ হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি বা দলকে তার ভুল নীতির অশুভ পরিণামের ভীতি অনুভব করানো যায় ততক্ষণ সে সঠিক কথা ও তার যুক্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতে উদ্যোগী হয় না, মানুষের মনে সঠিক পথের অনুসন্ধিৎসা তখনই জন্ম নেয় যখন তার মনে এ চিন্তা জাগে যে, সে কোন বাঁকা পথে যাচ্ছে না তো, যেখানে ধ্বংসের কোন আশংকা আছে।

৭৭. এর দু'টি অর্থ হয়। এক, আমি নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বানিয়ে বা কমবেশী করে বলি না বরং যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার ওপর নাযিল হয় তাই হুবহু বর্ণনা করি। দুই, আমি এমন একজন রসূল যাকে তোমরা আগে থেকেই একজন সত্যবাদী ও আমানতদার হিসেবে জানো। মানুষের ব্যাপারে যখন আমি আমানতের খেয়ানত করি না তখন আল্লাহর ব্যাপারে কেমন করে আমানতের খেয়ানত করতে পারি। কাজেই তোমাদের জানা উচিত, আমি যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করছি সে ব্যাপারে আমি ঠিক তেমনিই আমানতদার যেমন দুনিয়ার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত তোমরা আমাকে পেয়েছো।

৭৮. অর্থাৎ আমার আমানতদার রসূল হবার অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই যে, তোমরা অন্য সবার আনুগত্য পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার আনুগত্য করবে এবং আমি তোমাদের যে বিধান দেবো তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেবে। কারণ আমি বিশ্ব–জাহানের প্রভুর ইচ্ছার প্রতিনিধি। আমার আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের সমান। আর আমার নাফরমানী করা নিছক আমার সত্তার নাফরমানী করা নয় বরং সরাসরি আল্লাহর নাফরমানীর নামান্তর। অন্য কথায় এর অর্থ দাঁড়ায়, রসূলের অধিকার শুধুমাত্র এতটুকুন নয় যে, যাদের কাছে তাঁকে রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে তারা তাঁর সত্যবাদিতা মেনে নেবে এবং তাঁকে সত্য রসূল হবার স্বীকৃতি দেবে। বরং তাঁকে আল্লাহর সত্য রসূল বলে মেনে নেবার সাথে সাথেই তাঁর আনুগত্য করা এবং অন্য সমস্ত আইন পরিহার করে একমাত্র তিনি যে আইন এনেছেন তার আনুগত্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। রসূলকে রসূল বলে স্বীকার না করা অথবা রসূল বলে স্বীকার করার পর তাঁর আনুগত্য না করা উভয় অবস্থাই আসলে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর এবং উভয়েরই ফল হয় আল্লাহর গযবের আওতায় চলে আসা। তাই ঈমান ও আনুগত্যের দাবীর আগে "আল্লাহকে ভয় করো" এর সতর্কতামূলক বাক্য উচ্চারণ করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি ভালোভাবে কান খুলে রসূলের রিসালাত স্বীকার না করা অথবা তাঁর আনুগত্য গ্রহণ না করার ফল কি হবে তা শুনে নিতে পারে।

৭৯. এটি হচ্ছে হযরত নূহের সত্যতার সপক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি। প্রথম যুক্তি ছিল, নবুওয়াত দাবীর পূর্বে আমার সমগ্র জীবন তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত তোমরা আমাকে একজন আমানতদার হিসেবেই জানো। আর দ্বিতীয় যুক্তিটি হচ্ছে, আমি একজন নিস্বার্থপর ব্যক্তি। একাজের মাধ্যমে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার হচ্ছে অথবা নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ করার জন্য আমি প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, এমন কোন ব্যক্তিগত লাভ বা স্বার্থ তোমরা চিহ্নিত করতে পারবে না। এহেন নিস্বার্থভাবে কোন ব্যক্তিগত লাভ ছাড়াই যখন আমি এ সত্যের দাওয়াতের কাজে দিনরাত প্রাণপাত করে যাচ্ছি, নিজের

সময় ও শ্রম নিয়োগ করছি এবং সকল প্রকার কষ্ট বরদাশ্ত করছি তখন তোমাদের জানা উচিত, আমি আন্তরিকতা সহকারে একাজ করে যাচ্ছি। ঈমানদারীর সাথে যে জিনিসকে সত্য মনে করি এবং যার আনুগত্যের মধ্যে আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ ও সাফল্য দেখি তাই পেশ করছি। আমার একাজের পেছনে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্যোগ নেই। এ স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য মিথ্যা বলে লোকদের ধোকা দেবার কোন প্রয়োজন আমার নেই।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ কুরআন মজীদ বারবার এ যুক্তি দু'টি পেশ করেছে এবং এ দু'টিকে নবুওয়াত যাচাই করার মানদণ্ড গণ্য করেছে। নবুওয়াত লাভ করার আগে যে ব্যক্তি একটি সমাজে বছরের পর বছর জীবনযাপন করেছেন এবং লোকেরা সবসময় সব ব্যাপারে তাঁকে সত্যবাদী, নিখাদ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছে তার সম্পর্কে কোন নিরপেক্ষ মানুষ এরূপ সন্দেহ করতে পারে না যে, তাঁকে নবী না করা সত্ত্বেও তিনি বলবেন, আল্লাহ আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন। সারা জীবনে একটিবারও যে ব্যক্তি মিথ্যা বলেনি। সে হঠাৎ আল্লাহর নামে এত বড় একটি মিথ্যা বলতে উদ্যত হবে, তা কোন নিরাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে ধারণা করা বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তারপর দ্বিতীয় কথাটা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ সে কথাটি হচ্ছে, কোন ব্যক্তি সদুদ্দেশ্যে এতবড় ডাহা মিথ্যা তৈরি করে না। নিশ্চিতভাবে কোন সংকীর্ণ স্বার্থই এরূপ শঠতা ও প্রতারণার প্ররোচনা দিয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যখন নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এহেন প্রতারণামূলক কাজ করে তখন গোপন করার যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজের কাজ কারবার বাড়াবার ও সম্প্রসারিত করার জন্য তাকে নানা ধরনের উপায় অবলম্বন করতে হয়। এসবের কুৎসিত দিকগুলো হাজার চেষ্টা করলেও আশপাশের সমাজে লুকিয়ে রাখা যায় না। তাছাড়া নিজের আধ্যাত্মবাদের ব্যবসায় ফেঁদে তার নিজের কিছু না কিছু লাভ হতে দেখা যায়। ভক্তদের থেকে নজরানা নেয়া হয়। লংগরখানা খোলা হয়। জমিজমা কেনা হয়। অলংকারাদি তৈরি করা হয়। ফকিরির আস্তানা দেখতে দেখতে বাদশাহের দরবারে পরিণত হয়। কিন্তু যেখানে এর বিপরীত নবুওয়াত দাবীকারীর ব্যক্তিগত জীবন এমন সব নৈতিক গুণাবলীতে পরিপূর্ণ দেখা যায়, যার মধ্যে প্রতারণামূলক উপায়ের নাম-নিশানাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না এবং এ কাজের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ তো দূরের কথা বরং এ সেবামূলক কাজের জন্য সে নিজের সবকিছু বিলিয়ে দেয়, সেখানে মিথ্যাচারের সন্দেহ করার কোন সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না। কোন বুদ্ধিমান ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি একথা কল্পনাও করতে পারে না যে, একজন নিশ্চিন্ত জীবন যাপনকারী ভালো লোক কেন বিনা কারণে একটি মিথ্যা দাবী নিয়ে দাঁড়াবেন, যখন এ দাবীর মাধ্যমে তার কোন স্বার্থোদ্ধার হচ্ছে না বরং উল্টো নিজের ধন-দৌলত, সময় ও শক্তিসামর্থ-শ্রম সবকিছু একাজে নিয়োগ করে এর বদলে সে সারা দুনিয়ার লোকদের শত্রুতা মাথা পেতে নিয়েছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া মানুষের আন্তরিক হবার সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট প্রমাণ। বছরের পর বছর ধরে যখন কোন ব্যক্তি এ ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে যেতে থাকে তখন যে ব্যক্তি নিজেই অসৎ সংকল্পকারী একমাত্র সে-ই তার প্রতি অসৎসংকল্পকারী বা স্বার্থপর হবার দোষারোপ করতে পারে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল মু'মিনূন ৭০ টীকা)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١١٠﴾ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ﴿١١١﴾

কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং (নির্দ্বিধায়) আমার আনুগত্য করো।[৮০] তারা জবাব দিল, "আমরা কি তোমাকে মেনে নেবো, অথচ নিকৃষ্টতম লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে?"[৮১]

৮০. অকারণে এ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। আগে এটি বলা হয়েছিল এক প্রেক্ষিতে, এখানে পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে ভিন্ন প্রেক্ষিতে। উপরে اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ এর সাথে فَاتَّقُوا اللّٰهَ বাক্যাংশের সম্পর্ক এ ছিল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ব্যক্তি হচ্ছেন একজন আমানতদার রসূল, যার আমানতদারীর গুণ সম্পর্কে তোমরা নিজেরাই অবগত, তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করতে গিয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর এখানে مَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ এর সাথে এ বাক্যের সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত লাভ ছাড়াই যে ব্যক্তি নিছক মানুষের সংস্কার সাধনের জন্য পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে কাজ করছে তার উদ্দেশ্যকে অসৎ আখ্যায়িত করতে গিয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। এ কথাটির ওপর এত বেশী জোর দেবার কারণ ছিল এই যে, জাতির সরদাররা হযরত নূহের আন্তরিকতাপূর্ণ সত্যের দাওয়াতের মধ্যে খুঁত বের করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে এ মর্মে অভিযোগ আনছিল যে, তিনি নিজের বড়াই করার জন্য এতসব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ঃ

يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ – (المؤمنون : ٢٤)

"সে তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়।"

৮১. হযরত নূহের দাওয়াতের এ জবাব যারা দিয়েছিল তারা ছিল তার সম্প্রদায়ের সরদার, মাতব্বর ও গণ্য মান্য ব্যক্তি। যেমন অন্যান্য জায়গায় এ কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ

"সে জাতির কাফের সরদাররা বললো, আমরা তো তোমাকে এ ছাড়া আর কিছুই দেখছি না যে, তুমি নিছক একজন মানুষ আমাদেরই মতো এবং আমরা দেখছি একমাত্র এমন সব লোকেরা না বুঝেই তোমার অনুসারী হয়েছে যারা আমাদের এখানে নিম্ন শ্রেণীর লোক। আর আমরা এমন কোন জিনিসই দেখি না যার বলে তোমরা আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ।" (হূদ ঃ ২৭ আয়াত)

এ থেকে জানা যায়, হযরত নূহের প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদের অধিকাংশ ছিল গরীব ও ক্ষুদ্র পেশাদার অথবা এমন পর্যায়ের যুবক জাতির মধ্যে যাদের কোন মর্যাদা ছিল না। অন্যদিকে ছিল উচ্চ শ্রেণীর বিত্তশালী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকেরা। তারা আদাপানি খেয়ে তাঁর বিরোধিতায় নেমেছিল এবং তারাই জাতির সাধারণ লোকদেরকে

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾

নূহ বললো, "তাদের কাজ কেমন, আমি কেমন করে জানবো। তাদের হিসেব গ্রহণ করা তো আমার প্রতিপালকের কাজ। হায়! যদি তোমরা একটু সচেতন হতে।[৮২] যে ঈমান আনে তাকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়। আমি তো মূলত একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।[৮৩] তারা বললো, "হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তাহলে তুমি অবশ্যই বিপর্যস্ত লোকদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।[৮৪] নূহ দোয়া করলো, "হে আমার রব! আমার জাতি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে।[৮৫]

নানাভাবে প্রতারিত করে নিজেদের দলভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এ প্রসংগে তারা হযরত নূহের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করছিল তার মধ্যে একটি যুক্তি ছিল নিম্নরূপ ঃ যদি নূহের দাওয়াতের কোন গুরুত্ব থাকতো, তাহলে জাতির প্রধানগণ, উলামায়ে কেরাম, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ তা গ্রহণ করতো। কিন্তু তাদের কেউ তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। জাতির হীনবল ও নিম্ন শ্রেণীর কিছু অবুঝ লোক তাঁর দলে ভিড়েছে। এ অবস্থায় আমাদের মতো উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা কি এসব অজ্ঞ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের দলে শামিল হয়ে যাবে?

এ একই কথা কুরাইশ বংশীয় কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলতো। তারা বলতো, দাস ও দরিদ্র লোকেরা অথবা কয়েকজন অবুঝ ছোক্‌রাই তো এঁর অনুসারী। জাতির প্রধান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কেউ এঁর সাথে নেই। আবু সুফিয়ান হিরাকলের প্রশ্নের জবাবেও একথাই বলেছিলেন ঃ تبعه منا الضعفاء والمساكين (আমাদের গরীব ও দুর্বল লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হয়েছে।) তাদের চিন্তাধারা যেন এধরনের ছিলঃ জাতির প্রধানরা যাকে সত্য বলে মনে করে তা–ই একমাত্র সত্য। কারণ একমাত্র তারাই বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী। আর ছোট লোকদের ব্যাপারে বলা যায়, তাদের ছোট হওয়াই একথা প্রমাণ করে যে, তারা বুদ্ধিহীন ও দুর্বল সিদ্ধান্তের অধিকারী। তাই তাদের কোন কথা মেনে নেয়া এবং বড় লোকদের কথা প্রত্যাখ্যান করার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, সেটি একটি গুরুত্বহীন কথা। বরং মক্কার কাফেররা তো এর চাইতেও অগ্রসর হয়ে এ মর্মে যুক্তি পেশ করতো যে, কোন মামুলী ও সাধারণ লোক নবী হতে পারে না। আল্লাহ যদি সত্যিই কোন নবী পাঠাতে চাইতেন তাহলে কোন বড় সমাজপতিকে নবী করে পাঠাতেন ঃ

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ○

"তারা বলে, এ কুরআন আমাদের দু'টি বড় নগরীর (মক্কা ও তায়েফ) কোন প্রভাবশালী লোকের প্রতি নাযিল করা হলো না কেন?" (আয্ যুখরুফঃ ৩১আয়াত)।

৮২. এটি তাদের আপত্তির প্রথম জবাব। যেমন উপরে বলা হয়েছে, তাদের আপত্তির ভিত্তি ছিল একটি কাল্পনিক সিদ্ধান্তের ওপর। সেটি ছিল ঃ গরীব, শ্রমজীবী এবং যারা নিম্নশ্রেণীর কাজ করে অথবা যারা সমাজের নিম্নশ্রেণীর সাথে যুক্ত। তাদের কোন বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা থাকে না। তারা জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক শূন্য হয়। তাই তাদের ঈমান কোন চিন্তা ও দূরদৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদের আকীদা বিশ্বাস নির্ভরযোগ্য নয়। তাদের কর্মকাণ্ডের কোন গুরুত্ব নেই। হযরত নূহ এর জবাবে বলেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে এসে ঈমান আনে এবং একটি আকীদা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী কাজ করতে থাকে তার একাজের পেছনে কোন্ ধরনের উদ্যোগ কাজ করছে এবং তা কতটুকু মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী তা জানার কোন মাধ্যম আমার কাছে নেই। এ বিষয়গুলো দেখা এবং এগুলোর হিসেব রাখা আল্লাহর কাজ, আমার ও তোমাদের নয়।

৮৩. এটি তাদের আপত্তির দ্বিতীয় জবাব। তাদের আপত্তির মধ্যে একথা প্রচ্ছন্ন ছিল যে, হযরত নূহের চারদিকে মু'মিনদের যে দলটি সমবেত হচ্ছে তারা যেহেতু আমাদের সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক, তাই উচ্চ শ্রেণীর কোন ব্যক্তি এ দলে শামিল হতে পারে না। অন্যকথায় তারা যেন একথা বলছিল, হে নূহ! তোমার প্রতি ঈমান এনে আমরা কি নিজেদেরকেও নিম্নশ্রেণীর নির্বোধদের দলভুক্ত করবো? আমরা কি দাস, চাকর-বাকর, শ্রমিক ও কায়িক পরিশ্রমকারীদের লাইনে এসে বসে যাবো? হযরত নূহ এর জবাব এভাবে দেন, যারা আমার কথা মানে না আমি তাদের পেছনে দৌড়াতে থাকবো এবং যারা আমার কথা মেনে নেয় তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবো, এ ধরনের অযৌক্তিক কর্মনীতি আমি কেমন করে অবলম্বন করতে পারি! আমার অবস্থা এমন এক ব্যক্তির মতো যে দাঁড়িয়ে সোচ্চার কণ্ঠে একথা ঘোষণা করে দিয়েছে যে, তোমরা মিথ্যা ও বাতিলের পথে চলছো। এ পথে চলার পরিণাম ধ্বংস। আমি তোমাদের যে পথ দেখাচ্ছি তার মধ্যেই রয়েছে তোমাদের সবার সাফল্য ও মুক্তি। এখন যে চাও আমার এ সতর্কবাণী গ্রহণ করে সোজা পথে চলে এসো এবং যে চাও চোখ বন্ধ করে ধ্বংসের পথে চলতে থাকো। আমি তো এমন কোন কর্মনীতি অবলম্বন করতে পারি না যার ফলে যে সমস্ত আল্লাহর বান্দা আমার এ সতর্কবাণী শুনে সঠিক সোজা পথ অবলম্বন করার জন্য আমার কাছে আসবে আমি তাদের জাতি, গোত্র, বংশ, পেশা জিজ্ঞেস করবো এবং যদি তারা তোমাদের দৃষ্টিতে "নিম্নশ্রেণীর" হয়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে "অভিজাত" লোকেরা কবে ধ্বংসের পথ ছেড়ে দিয়ে নাজাতের পথে এগিয়ে আসবে সে আশায় বসে থাকবো।

ঠিক এ একই ব্যাপার চলছিল এ আয়াতগুলো নাযিল হবার সময় মক্কার কাফের সমাজ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে। এ জিনিসটি সামনে রাখলে হযরত নূহ ও তাঁর জাতির সরদারদের এ কথোপকথন এখানে শুনানো হচ্ছে কেন তা বুঝা যেতে পারে। মক্কার কাফেরদের বড় বড় সরদার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, আমরা এই বেলাল, আম্মার, সুহাইবের মতো গোলাম এবং শ্রমজীবী মানুষদের সাথে

কেমন করে বসতে পারি। তাদের কথার অর্থ যেন এ ছিল যে, মুমিনদের দল থেকে যদি এ গরীবদেরকে বের করে দেয়া হয় তাহলেই না এ অভিজাতদের ওদিক মুখো হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। অন্যথায় সুলতান মাহমুদ ও তার ভৃত্য আয়াযের এক কাতারে দাঁড়ানো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ নির্দেশ দেয়া হয়, যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এমন সব অহংকারীদের জন্য ঈমান গ্রহণকারী গরীবদেরকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে নাঃ

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ○ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ○ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ○ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ○ وَهُوَ يَخْشَىٰ ○ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ○ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ○ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ○

"হে মুহাম্মাদ! যে বেপরোয়া ভাব দেখালো তুমি তার প্রতি মনোযোগী হলে? অথচ যদি সে সংশোধিত না হয়, তাহলে তোমার ওপর তার কি দায়িত্ব আছে? আর যে ব্যক্তি মনে আল্লাহর ভয় নিয়ে তোমার কাছে ছুটে আসে তুমি তাকে অবজ্ঞা করছো? কখ্খনো না, এতো একটি উপদেশ, যার মন চায় একে গ্রহণ করে নেবে।" (সূরা আবাসাঃ ৫–১২ আয়াত)

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ○ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ○

"যারা দিনরাত নিজেদের রবকে ডাকছে নিছক তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করো না। তোমার ওপর তাদের কোন দায়দায়িত্ব নেই এবং তাদের ওপরও তোমার কোন দায়দায়িত্ব নেই। এরপরও যদি তুমি তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করো তাহলে তুমি জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। আমি তো এভাবে তাদের মধ্য থেকে কতককে কতকের মাধ্যমে পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছি, যাতে তারা বলেঃ 'আমাদের মধ্যে কি কেবল এ লোকেরাই অবশিষ্ট ছিল, যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে?' হ্যাঁ, আল্লাহ নিজের কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে কি এরচেয়ে বেশী জানেন না?" (আল আন'আমঃ ৫২ আয়াত)

৮৪. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ –এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, তোমাকে 'রজম' করা হবে। অর্থাৎ পাথর মেরে তোমাকে মেরে ফেলা হবে।

এখন আমার ও তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ফায়সালা করে দাও এবং আমার সাথে যেসব মু'মিন আছে তাদেরকে রক্ষা করো।[৮৬] *শেষ পর্যন্ত আমি একটি বোঝাই করা নৌযানে তাকে ও তার সাথিদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম,*[৮৭] *তারপর অবশিষ্ট লোকদেরকে ডুবিয়ে দিলাম।*

নিশ্চিতভাবে এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। আর আসল ব্যাপার হচ্ছে, তোমার রব পরাক্রমশালী এবং করুণাময়ও।

আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, চারদিক থেকে তোমাকে গালাগালি করা হবে। যেখানেই যাবে, অভিশাপ দেয়া হবে এবং অপদস্ত করে তাড়িয়ে দেয়া হবে। আরবী বাগধারা অনুযায়ী এ শব্দগুলো থেকে এ দু'টি অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮৫. অর্থাৎ চূড়ান্ত ও শেষ পর্যায়ে মিথ্যা বলে দিয়েছে ও প্রত্যাখ্যান করেছে। এরপরে আর কোন প্রকার সত্যায়ন করার ও ঈমান আনার আশা থাকে না। আলোচনার বাইরের চেহারা দেখে কেউ যেন এ সন্দেহ পোষণ না করে যে, নবী ও তাঁর সম্প্রদায়ের সরদারদের মধ্যে উপরের কথোপকথন হয় এবং তাদের পক্ষ থেকে প্রথম প্রত্যাখ্যানের পর নবী আল্লাহর কাছে এ মর্মে রিপোর্ট পেশ করেন যে, তারা আমার নবুওয়াত মানছে না কাজেই এখন আপনি আমার ও তাদের সমস্যার ফায়সালা করে দিন। হযরত নূহের (আ) দাওয়াত এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কুফরীর ওপর অবিচল থাকার মধ্যে যে শত শত বছর ধরে সুদীর্ঘকালীন সংঘাত চলেছে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে তা আলোচিত হয়েছে। সূরা আনকাবূতে বলা হয়েছে, সাড়ে নয় শত বছর ধরে এ সংঘাত চলেঃ

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا -

"তারপর তিনি তাদের মধ্যে বসবাস করেন সাড়ে নয় শত বছর।" (১৪ আয়াত)

এ দীর্ঘ সময়ে হযরত নূহ বংশ পরম্পরায় তাদের সামাজিক কার্যক্রম দেখে বুঝতে পারেন যে, কেবল তাদের মধ্যেই সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা খতম হয়ে যায়নি। বরং তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যেও সৎ ও ঈমানদার মানুষের জন্ম হবার আশা নেই।

كَذَّبَتْ عَادُ ِۨ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٢٦﴾ وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٧﴾ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٢٩﴾ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾

৭ রুকূ'

আদ জাতি রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।৮৮ স্মরণ করো যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বলেছিল,৮৯ "তোমরা ভয় করছো না? আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি এ কাজে তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের। তোমাদের এ কি অবস্থা, প্রত্যেক উঁচু জায়গায় অনর্থক একটি ইমারত বানিয়ে ফেলছো৯০ এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছো, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে?৯১ আর যখন কারো ওপর হাত ওঠাও প্রবল একনায়ক হয়ে হাত ওঠাও।৯২ কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝

"হে পরওয়ারদিগার! যদি তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও, তাহলে তারা তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করবে এবং তাদের বংশে যে-ই জন্ম নেবে সে-ই হবে চরিত্রহীন ও কঠোর সত্য অস্বীকারকারী।" (নূহ, ২৭ আয়াত)

আল্লাহ নিজেও হযরত নূহের এ অভিমতকে সঠিক বলে স্বীকার করেন এবং নিজের পূর্ণ ও নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেনঃ

لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

"তোমার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া এখন আর ঈমান আনার মত কেউ নেই। কাজেই এখন তাদের কার্যকলাপের জন্য দুঃখ করা থেকে বিরত হও।" (হূদ, ৩৬ আয়াত)

৮৬. অর্থাৎ কেবল কে সত্য ও কে মিথ্যা এতটুকু ফায়সালা করে দিলে হবে না বরং এ ফায়সালাকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করো যাতে মিথ্যাপন্থীকে ধ্বংস করে দেয়া যায়

এবং সত্যপন্থীকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। "আমার ও আমার মুমিন সাথীদেরকে রক্ষা করো" এ শব্দগুলো স্বতস্ফূর্তভাবে এ অর্থ প্রকাশ করছে যে, অবশিষ্ট লোকদের প্রতি আযাব নাযিল করো এবং ধরার বুক থেকে তাদেরকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দাও।

৮৭. "বোঝাই করা নৌযান" অর্থ হচ্ছে, এ নৌকাটি সকল মু'মিন ও সকল প্রাণীতে পরিপূর্ণ ছিল। পূর্বেই এ প্রাণীদের এক একটি জোড়া সংগে নেবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা হূদ ৪০ আয়াত।

৮৮. তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য দেখুন আল আ'রাফ ৬৫-৭২ ও হূদ ৫০-৬০ আয়াত। এ ছাড়া এ কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত স্থানগুলো পড়ুন ঃ হা-মীম আস্ সাজ্দাহ ১৩-১৬, আল আহকাফ ২১-২৬, আয্ যারিয়াত ৪১-৪৫, আল কামার ১৮-২২, আল হাক্কাহ ৪-৮ এবং আল ফজর ৬-৮ আয়াত।

৮৯. হযরত হূদের এ ভাষণটি অনুধাবন করার জন্য এ জাতিটি সম্পর্কিত তথ্যাবলী আমাদের সামনে থাকা প্রয়োজন। কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে আমাদের কাছে এ তথ্য পরিবেশন করেছে। এতে বলা হয়েছে, নূহের জাতির ধ্বংসের পর দুনিয়ায় যে জাতির উত্থান ঘটানো হয়েছিল তারা ছিল এই আদ জাতি ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ –

"স্মরণ করো (আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানের কথা) তিনি নূহের জাতির পরে তোমাদেরকে খলীফা তথা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন।" (আল আ'রাফ ৬৯ আয়াত)

শারীরিক দিক দিয়ে তারা ছিল অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ জাতি।

وَزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً –

"আর শারীরিক গঠন শৈলীতে তোমাদেরকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করি।" (আল আ'রাফ ৬৯ আয়াত)

সেকালে তারা ছিল নজিরবিহীন জাতি। তাদের সমকক্ষ অন্য কোন জাতিই ছিল নাঃ

اَلَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ –

"তাদের সমকক্ষ কোন জাতি দেশে সৃষ্টি করা হয়নি।" (আল ফজর ৮ আয়াত)

তাদের সভ্যতা ছিল বড়ই উন্নত ও গৌরবোজ্জ্বল। সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করা ছিল তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট এবং এজন্য তদানীন্তন বিশ্বে তারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ – اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ –

"তুমি কি দেখোনি তোমাদের রব কি করেছেন সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী ইরমের আদদের সাথে?" (আল ফজর ৬-৭ আয়াত)

এ বস্তুগত উন্নতি ও শারীরিক শক্তি তাদেরকে অহংকারী করে দিয়েছিল এবং নিজেদের শক্তির গর্বে তারা মত্ত হয়ে উঠেছিলঃ

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً –

"আর আদ জাতি, তারা তো পৃথিবীতে সত্যের পথ থেকে সরে গিয়ে অহংকার করতে থাকে এবং বলতে থাকে, কে আছে আমাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী?" (হা–মীম আস্ সাজদাহ ১৫ আয়াত)

তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল কয়েকজন বড় বড় জালেম একনায়কের হাতে। তাদের সামনে কেউ টু শব্দটিও করতে পারতো নাঃ

وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ –

"আর তারা প্রত্যেক সত্যের দুশমন জালেম একনায়কের হুকুম পালন করে।" (হূদ ৫৯ আয়াত)

ধর্মীয় দিক থেকে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না বরং শির্কে লিপ্ত ছিল। বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত, একথা তারা অস্বীকার করতোঃ

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُنَا –

"তারা (হুদ আলাইহিস সালামকে) বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছো যে, আমরা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করবো এবং আমাদের বাপদাদারা যাদের ইবাদাত করতো তাদেরকে বাদ দেবো?" (আল আ'রাফ ৭০ আয়াত)

এ বৈশিষ্টগুলো সামনে রাখলে হযরত হূদের দাওয়াতের এ ভাষণ ভালোভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে।

৯০. অর্থাৎ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সমৃদ্ধির প্রদর্শনী করার উদ্দেশ্যে এমনসব বিশাল সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করছো; যেগুলোর কোন প্রয়োগ ক্ষেত্র ও প্রয়োজনীয়তা নেই এবং নিছক তোমাদের সম্পদশালিতা ও শানশওকতের প্রদর্শনীর নিদর্শন হিসেবে এগুলো টিকে থাকবে, এছাড়া যেগুলোর কোন উপযোগিতাও নেই।

৯১. অর্থাৎ তোমাদের অন্যান্য ইমারতগুলো ব্যবহারের জন্য নির্মিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেগুলোকে সুরম্য, কারুকার্যময় ও সুদৃঢ় করার ব্যাপারে তোমরা এতবেশী অর্থ, শ্রম ও যোগ্যতা নিয়োগ করছো যেন তোমরা এ দুনিয়ায় চিরকাল বসবাস করার ব্যবস্থা করছো, যেন শুধুমাত্র এখানকার আয়েশ আরামের ব্যবস্থা করাই তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ এবং এছাড়া আর কোন কথাই চিন্তা করার নেই।

এ প্রসংগে একথাও মনে রাখতে হবে যে, অপ্রয়োজনে বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করা এমন কোন বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড নয়, যার প্রকাশ কোন জাতির মধ্যে এভাবে হতে পারে যে, তার অন্য সমস্ত কাজ কারবার তো ভালোই শুধুমাত্র এ একটি খারাপ ও ভুল কাজ সে করেছে। এ অবস্থা একটি জাতির মধ্যে সৃষ্টিই হয় এমন এক সময় যখন একদিকে তার মধ্যে দেখা দেয় সম্পদের প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে প্রবৃত্তি পূজা ও

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾
وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا
سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

তাঁকে ভয় করো যিনি এমন কিছু তোমাদের দিয়েছেন যা তোমরা জানো। তোমাদের দিয়েছেন পশু, সন্তান–সন্ততি, উদ্যান ও পানির প্রস্রবনসমূহ। আমি ভয় করছি তোমাদের ওপর একটি বড়দিনের আযাবের।" তারা জবাব দিল, "তুমি উপদেশ দাও বা না দাও, আমাদের জন্য এ সবই সমান। এ ব্যাপারগুলো তো এমনিই ঘটে চলে আসছে[৯৩] এবং আমরা আযাবের শিকার হবো না।" শেষ পর্যন্ত তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম।[৯৪]

নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে আছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মেনে নেয়নি। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব যেমন পরাক্রমশালী তেমন করুণাময়ও।

বৈষয়িক স্বার্থপরতা প্রবল হতে হতে উন্মত্ততার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যখন কোন জাতির মধ্যে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন তার সভ্যতা–সংস্কৃতির সমগ্র ব্যবস্থাটিই পচে দুর্গন্ধময় হয়ে পড়ে। হযরত হূদ (আ) তাঁর জাতির ইমারত নির্মাণের যে সমালোচনা করেন তার উদ্দেশ্য এ ছিল না যে, তিনি শুধুমাত্র তাদের এ ইমারত নির্মাণকেই আপত্তিকর মনে করতেন বরং তিনি সামগ্রিকভাবে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকৃতির সমালোচনা করছিলেন এবং এ ইমারতগুলোর কথা তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করেছিলেন যেন সারা দেশে সর্বত্র এ বড় বড় ফোড়াগুলো সেই বিকৃতির সবচেয়ে সুস্পষ্ট আলামত হিসেবে পরিদৃষ্ট হচ্ছে।

৯২. অর্থাৎ নিজেদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে তোমরা এত বেশী সীমা–লংঘন করে গেছো যার ফলে মনে হয়েছে তোমাদের বাসগৃহ নয়, সুদৃশ্য মহল ও প্রাসাদের প্রয়োজন। আর এতেও পরিতৃপ্ত না হয়ে তোমরা অপ্রয়োজনে সুউচ্চ নয়নাভিরাম ইমারতসমূহ নির্মাণ করছো। শক্তি ও সম্পদের প্রদর্শনী ছাড়া এগুলোর আর কোন স্বার্থকতা নেই। কিন্তু তোমাদের মনুষ্যত্বের মানদণ্ড এত নিচে নেমে গেছে, যার ফলে দুর্বলদের জন্য তোমাদের অন্তরে একটুও দয়া মায়া নেই। গরীবদের জন্য তোমাদের দেশে কোন ইনসাফ নেই। আশপাশের দুর্বল জাতিগুলো হোক বা তোমাদের নিজেদের দেশের পশ্চাতপদ শ্রেণীগুলো, সবাই তোমাদের জুলুম নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং তোমাদের নির্মম নির্যাতনের হাত থেকে কেউ রেহাই পাচ্ছে না।

৮ রুকূ'

সামূদ জাতি রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।[৯৫] স্মরণ করো যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বললোঃ "তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রসূল।[৯৬] কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের। এখানে যেসব জিনিস আছে সেগুলোর মাঝখানে কি তোমাদের এমনিই নিশ্চিন্তে থাকতে দেয়া হবে?[৯৭] এসব উদ্যান ও প্রস্রবনের মধ্যে? এসব শস্যক্ষেত ও রসাল গুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানের মধ্যে?[৯৮] তোমরা পাহাড় কেটে তার মধ্যে সগর্বে ইমারত নির্মাণ করছো।[৯৯] আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

৯৩. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, যা কিছু আমরা করছি এগুলো কোন নতুন জিনিস নয়, শত শত বছর থেকে আমাদের বাপ–দাদারা এসব করে আসছে। এসবই ছিল তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, চরিত্রনীতি ও ব্যবহারিক জীবনধারা। তাদের ওপর এমন কি বিপদ নেমে এসেছিল যে, আজ আমাদের ওপর তা নেমে আসার আশংকা করবো? এ জীবন ধারায় যদি কোন অন্যায় ও দুষ্কৃতির অংশ থাকতো, তাহলে তুমি যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা আগেই নেমে আসতো। দুই, তুমি যেসব কথা বলছো এমনি ধারার কথা ইতিপূর্বেও বহু ধর্মীয় উন্মাদ এবং যারা নৈতিকতার বুলি আওড়ায় তারা আওড়িয়ে এসেছে। কিন্তু দুনিয়ার রীতি অপরিবর্তিত রয়েছে। তোমাদের মতো লোকদের কথা না মানার ফলে কখনো এক ধাক্কায় এ রীতির মধ্যে ওলট পালট হয়ে যায়নি।

৯৪. এ জাতির ধ্বংসের যে বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মজীদে এসেছে তা হচ্ছে এইঃ হঠাৎ প্রবল ঘূর্ণিঝড় ওঠে। লোকেরা দূর থেকে নিজেদের উপত্যকার দিকে, এ ঘূর্ণিঝড় আসতে দেখে মনে করে মেঘ ছেয়ে যাচ্ছে। তারা আনন্দে উতলা হয়ে ওঠে। কারণ জোর বৃষ্টিপাত হবে। কিন্তু তা ছিল আল্লাহর আযাব। আট দিন ও সাত রাত পর্যন্ত এমন ঝড়ো

হাওয়া অনবরত বইতে থাকে যার ফলে প্রত্যেকটি জিনিসই ধ্বংস হয়ে যায়। হাওয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে মানুষজনকে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে চতুরদিকে নিক্ষেপ করতে থাকে। বাতাস এত বেশী গরম ও শুকনা ছিল যে, যার ওপর দিয়ে তা একবার প্রবাহিত হয় তাকে নড়বড়ে ও অকেজো করে দিয়ে যায়। এ জালেম জাতির প্রত্যেকটি লোক খতম না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এ ঝড় থামেনি। তাদের জনপদের ধ্বংসাবশেষগুলোই শুধু তাদের পরিণামের কাহিনী শুনাবার জন্য টিকে আছে। আর আজ এ ধ্বংসাবশেষও নেই। আহকাফের সমগ্র এলাকা একটি ভয়াবহ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আহকাফ ২৫ টীকা)।

৯৫. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ ৭৩–৭৯ আয়াত, হূদ ৬১–৬৮ আয়াত, আল হিজর ৮০–৮৪ আয়াত এবং বনী ইসরাঈল ৫৯ আয়াত। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত স্থানগুলোঃ আন্ নমল ৪৫–৫৯, আয্ যারিয়াত ৪৩–৪৫, আল কামার ২৩–৩১, আল হাক্কাহ ৪–৫, আল ফজর ৯ এবং আশ্ শাম্‌স ১১ আয়াত।

এ জাতিটি সম্পর্কে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, আদ জাতির পরে দুনিয়ায় এ সামূদ জাতিই উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। (جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ – (الاعراف : ٧٤)। কিন্তু তাদের সভ্যতার অগ্রগতিও শেষ পর্যন্ত আদ জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির মতো একই রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ জীবন যাত্রার মান উন্নত থেকে উন্নততর এবং মনুষ্যত্বের মান নিম্নতর থেকে নিম্নতর হতে থাকে। এক দিকে সমতল এলাকায় সুউচ্চ ও সুরম্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং পার্বত্য এলাকায় অজন্তা–ইলোরার পর্বত গুহার মতো সুরম্য প্রাসাদ নির্মিত হতে থাকে। আর অন্যদিকে সমাজে শির্ক ও মূর্তি পূজার প্রবল জোয়ার চলতে থাকে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠ ভরে উঠতে থাকে জুলুম–নিপীড়নের প্রাবল্যে। জাতির সবচেয়ে অসৎ দুষ্কৃতিকারীরা তার নেতৃত্বের আসনে বসেছিল। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত ছিল। হযরত সালেহের সত্যের দাওয়াত কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীর দুর্বল লোকদেরকেই প্রভাবিত করছিল। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা শুধুমাত্র একারণেই তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল যে, إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ "যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছো তা আমরা মেনে নিতে পারি না।"

৯৬. হযরত সালেহের বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী এবং অসাধারণ যোগ্যতার সাক্ষ তাঁর জাতির লোকদের মুখ দিয়ে কুরআন মজীদের ভাষায় নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত হয়েছেঃ

قَالُوْا يٰصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا –

"তারা বললো, হে সালেহ! এর আগে তুমি আমাদের মধ্যে এমন লোক ছিলে যার ওপর আমাদের অনেক আশা ভরসা ছিল।" (হূদ ৬২ আয়াত)

৯৭. অর্থাৎ তোমরা কি মনে করো, তোমাদের এ আয়েশ আরাম স্থায়ী ও চিরন্তন? এসব কোনদিন বিনষ্ট হবে না? তোমাদের থেকে কখনো এসব নিয়ামতের হিসেব নেয়া হবে না? তোমরা যেসব কাজ কারবার করে যাচ্ছো কখনো এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না?

৯৮. মূলে هَضِيْمٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে খেজুরের এমন কাঁদি যা ফলভারে নূয়ে পড়েছে এবং যার ফল পেকে যাবার পর রসাল ও কোমল হবার কারণে ফেটে যায়।

৯৯. আদ জাতির সভ্যতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ছিল, তারা উঁচু উঁচু স্তম্ভ বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণ করতো। ঠিক তেমনি সামূদ জাতির সভ্যতা তার যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টের জন্য প্রাচীনকালের জাতিসমূহের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তা ছিল এই যে, তারা পাহাড় কেটে তার মধ্যে ইমারত নির্মাণ করতো। তাই সূরা 'আল ফজ্‌রে' যেভাবে আদকে 'যাতুল ইমাদ' (ذات العماد) অর্থাৎ স্তম্ভের অধিকারী পদবী দেয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি সামূদ জাতির বর্ণনা একথার মাধ্যমে করা হয়েছেঃ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ "এমনসব লোক যারা উপত্যকায় পাহাড় কেটেছে।" এ ছাড়া কুরআনে একথাও বলা হয়েছে যে, তারা নিজেদের দেশের সমতলভূমিতে বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করতোঃ

تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا – (الاعراف : ٧٤)

এসব গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিল? فَرِهِيْنَ শব্দের মাধ্যমে কুরআন–এর ওপর আলোকপাত করে। অর্থাৎ এসব কিছু ছিল তাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব, সম্পদ, শক্তি ও প্রযুক্তির নৈপুণ্যের প্রদর্শনী। কোন যথার্থ প্রয়োজনের তাগিদ এর পেছনে কার্যকর ছিল না। একটি বিকৃত ও ভ্রষ্ট সভ্যতার ধরন এমনিই হয়ে থাকে। একদিকে সমাজের গরীব লোকেরা মাথা গোঁজারও ঠাঁই পায় না আর অন্যদিকে ধনী নেতৃস্থানীয় লোকেরা থাকার জন্য যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাসাদ নির্মাণ করে ফেলে তখন প্রয়োজন ছাড়াই নিছক লোক দেখাবার জন্য স্মৃতিস্তম্ভসমূহ নির্মাণ করতে থাকে।

সামূদ জাতির এ ইমারতগুলোর কিছু সংখ্যক এখনো টিকে আছে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি নিজে এগুলো দেখেছি। পাশের পৃষ্ঠায় এগুলোর কিছু ছবি দেয়া হলো। এ জায়গাটি মদীনা তাইয়েবা ও তাবুকের মধ্যবর্তী হিজাযের বিখ্যাত আল'উলা নামক স্থান (যাকে নবীর জমানায় 'ওয়াদিউল কুরা' বলা হতো) থেকে কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা আজো এ জায়গাকে 'আল্ হিজ্‌র' ও 'মাদ্‌য়ানে সালেহ' নামে স্মরণ করে থাকে। এ এলাকায় 'আল্‌উলা' এখনো একটি শস্যশ্যামল উপত্যকা। এখানে রয়েছে বিপুল সংখ্যক পানির নহর ও বাগিচা। কিন্তু আল্ হিজ্‌রের আশেপাশে বড়ই নির্জন ও ভীতিকর পরিবেশ বিরাজমান। লোকবসতি নামমাত্র। সবুজের উপস্থিতি ক্ষীণ। কূয়া আছে কয়েকটি। এরই মধ্য থেকে একটি কূয়ার ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের মধ্যে একথা প্রচলিত আছে যে, হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের উটনী সেখান থেকে পানি পান করতো। বর্তমানে এটি তুর্কী আমলের একটি বিরান ক্ষুদ্র সামরিক চৌকির মধ্যে অবস্থিত। কূয়াটি একেবারেই শুকনা। (এর ছবিও পাশের পাতায় দেখানো হয়েছে)। এ এলাকায় প্রবেশ করে আলউলা'র কাছাকাছি পৌঁছুতেই আমরা সর্বত্র এমনসব পাহাড় দেখলাম যা একেবারেই ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। পরিষ্কার মনে হচ্ছিল, কোন ভয়াবহ ভূমিকম্প এগুলোকে নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত ঝাঁকানি দিয়ে ফালি ফালি করে দিয়ে গেছে। (এ পাহাড়গুলোরও কিছু ছবি পাশের পাতাগুলোয় দেয়া হয়েছে)। এ ধরনের

আল আলা পাহাড়

মাদয়ানে সালেহ (আ) পাহাড়

মাদয়ানে সালেহ (আ)-এর কিছু সংখ্যক সামূদীয় অট্টালিকা

মাদয়ানে সালেহ (আ)-এর সামুদীয় অট্টালিকা

পেট্টায় নিবতী পদ্ধতির একটি অট্টালিকা

মাদয়ানে সালেহ (আ)–এর কিছু সংখ্যক সামূদীয় অট্টালিকা
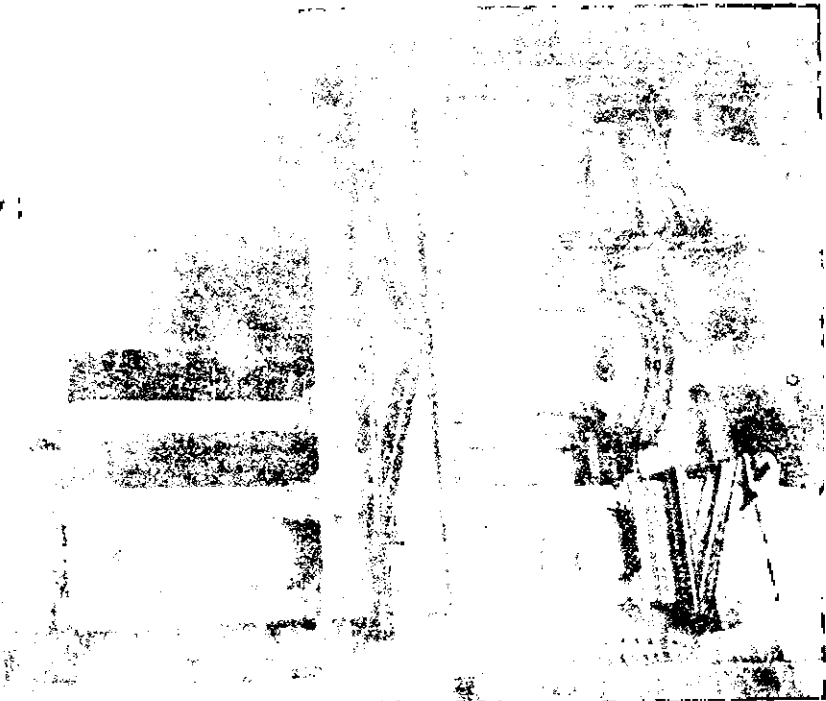
পেট্রোয় নিবতী পদ্ধতির একটি অট্টালিকা
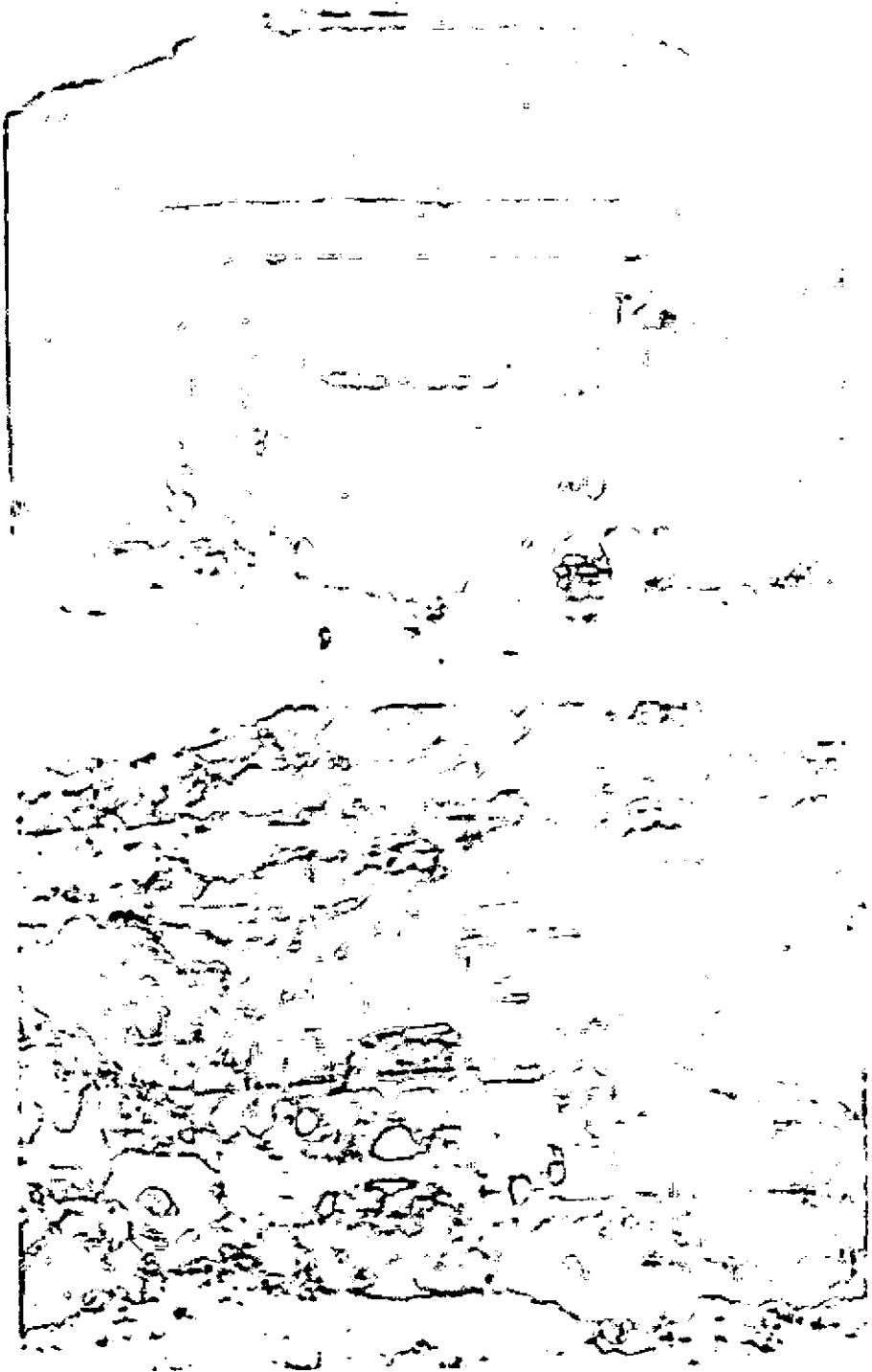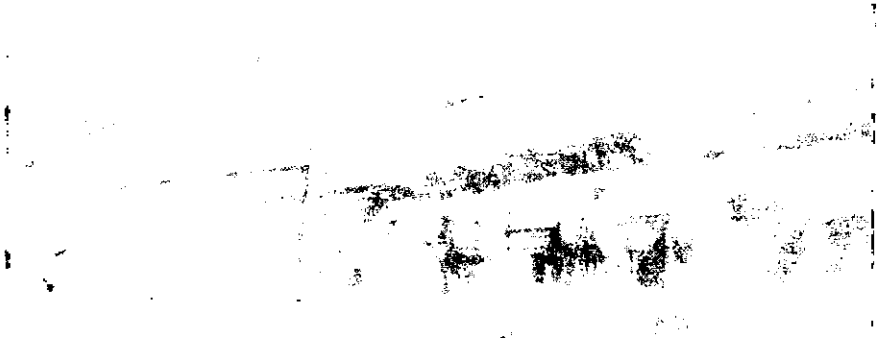
মাদয়ানে সামূদীয় পদ্ধতির একটি অট্টালিকা
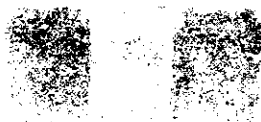
মাদয়ানে সালেহ (আ)–এর উষ্ট্রী যে কূপে পানি পান করত

যেসব লাগামহীন লোক পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং কোন সংস্কার সাধন করে না তাদের আনুগত্য করো না।"[১০০] তারা জবাব দিল, "তুমি নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।[১০১] তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কি? কোন নিদর্শন আনো, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।"[১০২] সালেহ বললো, "এ উটনীটি রইলো।[১০৩] এর পানি পান করার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট এবং তোমাদের সবার পানি পান করার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট রইলো।[১০৪] একে কখনো পীড়ন করো না, অন্যথায় একটি মহা দিবসের আযাব তোমাদের ওপর আপতিত হবে।" তারা তার পায়ের গিঁঠের রগ কেটে দিল[১০৫] এবং শেষে অনুতপ্ত হতে থাকলো। আযাব তাদেরকে গ্রাস করলো।[১০৬]

নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মান্যকারী নয়। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব হচ্ছেন পরাক্রমশালী এবং দয়াময়ও।

পাহাড় আমরা দেখতে দেখতে গিয়েছি পূর্বের দিকে আল'উলা থেকে খয়বর যাবার সময় প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত এবং উত্তর দিকে জর্দান রাজ্যের সীমানার মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত। এর অর্থ দাঁড়ায়, তিন চারশো মাইল দীর্ঘ ও একশো মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট একটি এলাকা ভূমিকম্পে একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

আল হিজ্‌রে আমরা সামূদ জাতির যেসব ইমারত দেখেছিলাম ঠিক একই ধরনের কতিপয় ইমারত আমরা পেলাম আকাবা উপসাগরের কিনারে মাদ্‌য়ানে এবং জর্দান রাজ্যের পেট্রা (PETRA) নামক স্থানেও। বিশেষ করে পেট্রায় সামূদী প্যাটার্নের ইমারত এবং নিবতীদের তৈরি করা অট্টালিকা পাশাপাশি দেখা গেছে। এগুলোর আকৃতি, কারুকাজ ও নির্মাণ পদ্ধতিতে এত সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক নজর

দেখার সাথে সাথেই বুঝতে পারবে এগুলো এক যুগেরও নয় এবং একই জাতির স্থাপত্যের নিদর্শনও নয়। (এগুলোরও আলাদা আলাদা ছবি আমি পাশের পৃষ্ঠায় দিয়েছি। ইংরেজ প্রাচ্যবিদ ডটি (Daughty) কুরআনকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আল হিজ্‌রের ইমারত সম্পর্কে দাবী করেছেন, এগুলো সামূদের নির্মিত নয় বরং নিবতীদের তৈরী ইমারত। কিন্তু উভয় জাতির স্থাপত্য পদ্ধতির মধ্যে বিস্তর ও সুস্পষ্ট ফারাক দেখা যায়। ফলে কেবলমাত্র একজন অন্ধই এগুলোকে একই জাতির নির্মিত বলে দাবী করতে পারে। আমার অনুমান, পাহাড় কেটে তার মধ্যে গৃহ নির্মাণ কৌশল সামূদই উদ্ভাবন করে এবং এর হাজার হাজার বছর পরে নিবৃতীরা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে একে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়ে দেয়। অতপর ইলোরায় (পেট্রার প্রায় সাতশো বছর পরে নির্মিত গুহা) এ শিল্পটির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

১০০. অর্থাৎ তোমাদের যেসব রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং শাসকদের নেতৃত্বে এ ভ্রান্ত বিকৃত জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তাদের আনুগত্য পরিহার করো। এরা সব লাগাম ছাড়া। নৈতিকতার সমস্ত সীমা-লংঘন করে এরা লাগামহীন পশুতে পরিণত হয়েছে। এদের দ্বারা সমাজ-সভ্যতার কোন সংস্কার হতে পারে না। এরা যে ব্যবস্থা পরিচালনা করবে তার মধ্যে বিকৃতিই ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের জন্য কল্যাণের কোন পথ যদি থাকে তাহলে তা কেবলমাত্র এই একটিই। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করো এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আনুগত্য পরিহার করে আমার আনুগত্য করো। কারণ আমি আল্লাহর রসূল। আমার আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তোমরা পূর্ব থেকেই অবগত আছো। আমি একজন নিস্বার্থ ব্যক্তি। নিজের কোন ব্যক্তিগত লাভের জন্য আমি এ সংস্কারমূলক কাজে হাত দেইনি-এ ছিল হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের ঘোষণাপত্রের সংক্ষিপ্তসার। নিজের জাতির সামনে তিনি এটি পেশ করেছিলেন। এর মধ্যে শুধু ধর্মীয় প্রচারণাই ছিল না বরং একই সঙ্গে তামাদ্দুনিক ও নৈতিক সংস্কার এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের দাওয়াতও ছিল।

১০১. "যাদুগ্রস্ত" অর্থাৎ দিওয়ানা ও পাগল তথা যার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। প্রাচীনকালের ধারণা অনুযায়ী জিনের বা যাদুর প্রভাবে পাগলামি দেখা দেয়। তাই তারা যাকে পাগল বলতে চাইতো তাকে বলতো "মাজ্‌নুন" (জিনগ্রস্ত) বা "মাস্‌হুর" (যাদুগ্রস্ত) ও মুসাহ্‌হার।

১০২. অর্থাৎ আমরা তোমাকে আল্লাহর প্রেরিত বলে মেনে নেব বাহ্যত তোমার ও আমাদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্যমূলক চিহ্ন তো আমরা দেখছি না। কিন্তু যদি তুমি নিজেকে আল্লাহর নিযুক্ত ও তাঁর প্রেরিত বলে দাবী কর এবং সেই দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে এমন কোন চাক্ষুস মু'জিযা পেশ করো, যা থেকে এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা এবং পৃথিবী ও আকাশের মালিক মহান আল্লাহ যে তোমাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন সে ব্যাপারে আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায়।

১০৩. মু'জিযার দাবীর জবাবে উটনী হাজির করার ফলে পরিষ্কার বুঝা যায়, সেটি নিছক সেখানে সাধারণ আরবদের কাছে যেমন উটনী পাওয়া যেতো সে ধরনের একটি সাধারণ উটনী ছিল না। বরং মু'জিযা দেখাবার দাবীর জবাবে পেশ করা যায় এমন কোন জিনিস নিশ্চয়ই তার জন্ম ও প্রকাশ বা সৃষ্টির মধ্যে ছিল। যদি হযরত সালেহ তাদের দাবীর জবাবে এমনই কোন একটি সাধারণ উটনী ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দিতেন তাহলে

এটা হতো অবশ্যই একটি অর্থহীন কাজ। কোন নবী তো দূরের কথা একজন সাধারণ বিবেকবান ব্যক্তির কাছ থেকেও এ ধরনের আচরণ আশা করা যেতে পারে না। এখানে তো একথা শুধুমাত্র বক্তব্যের প্রেক্ষাপট থেকেই অনুধাবন করা যায়। কিন্তু অন্যান্য স্থানে কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় এ উটনীর অস্তিত্বকে মু'জিযা গণ্য করা হয়েছে। সূরা আ'রাফ ও সূরা হূদে বলা হয়েছেঃ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً "এ হলো আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য রইলো নিদর্শন হিসেবে।" আর সূরা বনী ইসরাঈলে এর চাইতেও বেশী বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছেঃ

وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا –

"পূর্ববর্তী লোকদের নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন পাঠানো থেকে বিরত রাখে। সামূদদের সামনে আমি চোখে দেখা উটনী নিয়ে আসি। তবুও তারা তার ওপর জুলুম করে। নিদর্শন তো আমি পাঠাই ভয় দেখাবার জন্য (তামাসা দেখাবার জন্য পাঠাই না)।" (৫৯ আয়াত)

উটনীকে মাঠে ময়দানে ছেড়ে দেবার পর এ কাফের জাতিকে যে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয় তা ছিল এর অতিরিক্ত। কেবলমাত্র একটি মু'জিযা পেশ করেই এ ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ দেয়া যেতে পারে।

১০৪. অর্থাৎ পালাক্রমে একদিন এ উটনীটি একাই তোমাদের কূয়া ও প্রস্রবনগুলো থেকে পানি পান করবে এবং একদিন জাতির সমস্ত লোকজন ও জন্তু-জানোয়ার পানি পান করবে। সাবধান, তার পানি পান করার দিন যেন কোন ব্যক্তি পানি নেবার জায়গায় না যায়। এটি ছিল একটি অত্যন্ত কঠিন চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আরবের বিশেষ অবস্থায় কোন ব্যক্তির জন্য এর চেয়ে বড় আর কোন চ্যালেঞ্জ হতে পারতো না। সেখানে তো পানিই ছিল জীবনের মুখ্য বিষয় এবং এ বিষয়টি নিয়ে ঝগড়া ঝাঁটি করে খুনাখুনি হয়ে যেতো। গোত্রগুলো পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত হতো। তারপর প্রাণের বিনিময়ে কেউ কোন ঝরণা বা কূয়া থেকে পানি নেবার অধিকার লাভ করতো। সেখানে জাতির এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে দিলেন, একদিন শুধুমাত্র আমার উটনী একাই সমস্ত কূয়া ও ঝরণা থেকে পানি পান করবে এবং জাতির সমস্ত লোক ও জন্তু-জানোয়াররা কেবলমাত্র দ্বিতীয় দিনেই পানি নিতে পারবে। তাঁর একথা বলার ছিল এই যে, তিনি যেন সমগ্র জাতিকে যুদ্ধ করার জন্য চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন। একটি বিরাট ও পরাক্রমশালী সেনাবাহিনী ছাড়া আরবে কোন ব্যক্তি এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারতো না। অন্যদিকে কোন জাতি যতক্ষণ না স্বচক্ষে দেখতে পেতো, চ্যালেঞ্জদানকারীর পেছনে এত বিপুল সংখ্যক তরবারিধারী ও এতবড় তীরন্দাজ বাহিনী রয়েছে যারা প্রতিপক্ষের যে কোন পদক্ষেপকে পিষে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। ততক্ষণ তারা একথা শুনতে প্রস্তুত হতো না। কিন্তু হযরত সালেহ (আ) কোন সেনাবাহিনীর শক্তি ছাড়াই একাকী দাঁড়িয়ে নিজের জাতিকে এ চ্যালেঞ্জ দিলেন এবং জাতি কেবল কান পেতে তা শুনলই না বরং বহুদিন পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে তা পালনও করতে থাকলো।

সূরা আ'রাফ ও সূরা হূদে এর ওপর আরো এতটুকু বাড়ানো হয়েছেঃ

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ –

"এ হচ্ছে আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। একে আল্লাহর যমীনে চরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দাও। কখনো খারাপ মতলবে এর গায়ে হাত দিয়ো না।"

অর্থাৎ চ্যালেঞ্জ কেবল এতটুকুই ছিল না যে, কেবল একদিন পর পর উটনীটি একাই হবে সারাদিন সমস্ত এলাকার পানির ইজারাদার বরং এর ওপর বাড়তি চ্যালেঞ্জ ছিল এই যে, সে সারাদিন তোমাদের ক্ষেতে–খামারে, ফলের বাগানে, খেজুর উদ্যানে ও চারণক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াবে, যেখানে চাইবে যাবে, যা ইচ্ছা খাবে, খবরদার! তোমরা কেউ তার গায়ে হাত দিতে পারবে না।

১০৫. এর অর্থ এ নয় যে, হযরত সালেহের এ চ্যালেঞ্জ শোনার সাথে সাথেই তারা উটনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার পায়ের রগ কেটে দেয়। বরং দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ উটনীটি সমগ্র জাতির জন্য একটি সমস্যা হয়ে থাকে। লোকেরা মনে মনে এর বিরুদ্ধে ফুঁসতে থাকে। পরামর্শ করতে থাকে। শেষমেষ জাতিকে এ আপদমুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন সরদার। সূরা আশ্ শামসে এ ব্যক্তির উল্লেখ এভাবে করা হয়েছেঃ اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا "যখন এ জাতির সবচেয়ে বড় পাপিষ্ঠ লোকটি উদ্যোগী হলো" এবং সূরা আল কামারে বলা হয়েছেঃ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ "তারা নিজেদের সাথীকে আহবান জানালো, শেষ পর্যন্ত সে একাজটি নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিল এবং সে গিঁঠের রগ কেটে দিল।"

১০৬. কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে তা হচ্ছে এই যে, উটনীকে মেরে ফেলার পর হযরত সালেহ ঘোষণা করেনঃ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ "তিনদিন নিজেদের গৃহে আয়েশ আরাম করে নাও।" (হূদ ৬৫ আয়াত) এ বিজ্ঞপ্তির মিয়াদ শেষ হবার পর রাতের শেষ প্রহরে ভোরের কাছাকাছি সময়ে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। এ সংগে সংঘটিত হয় ভয়াবহ ভূমিকম্প। ফলে মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। সকাল হবার পর চারদিকে লাশের পর লাশ এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল যেন মনে হচ্ছিল, শুকনো লতাগুল্ম জন্তু–জানোয়ারের পদদলনে বিধ্বস্ত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তাদের সুরম্য প্রাসাদ এবং পার্বত্য গুহাগুলো তাদেরকে এ ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ (القمر: ٣١)

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ (اعراف : ٧٨)

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ – فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (الحجر : ٨٣ – ٨٤)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ۝١٦٠ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝١٦١
اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝١٦٢ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝١٦٣ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٦٤ اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ
الْعٰلَمِيْنَ ۝١٦٥ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ
قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۝١٦٦

৯ রুকূ'

লূতের জাতি রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।[১০৭] স্মরণ করো যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো আমার রব্বুল আলামীনের। তোমরা কি গোটা দুনিয়ার মধ্যে পুরুষদের কাছে যাও[১০৮] এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে তোমাদের রব তোমাদের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা পরিহার করে থাকো?[১০৯] বরং তোমরা তো সীমা-ই অতিক্রম করে গেছো।"[১১০]

১০৭. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আল আ'রাফ ৮০-৮৪, হূদ ৭৪-৮৩, আল হিজ্‌র ৫৭-৭৭, আল আম্বিয়া ৭১-৭৫, আন্ নামল ৫৪-৫৮, আল আনকাবুত ২৮-৩৫, আস্ সাফ্‌ফাত ১৩৩-১৩৮ এবং আল কামার ৩৩-৩৯ আয়াত।

১০৮. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে তোমরা শুধুমাত্র পুরুষদেরকে বাছাই করে নিয়েছো নিজেদের যৌন ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য, অথচ দুনিয়ায় বিপুল সংখ্যক মেয়ে রয়েছে। দুই, সারা দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র তোমরাই যৌন ক্ষুধা মেটাবার জন্য পুরুষদের কাছে যাও। নয়তো মানব জাতির মধ্যে এমন দল দ্বিতীয়টি নেই। বরং পশুদের মধ্যেও কেউ এ কাজ করে না। সূরা আ'রাফ ও সূরা আনকাবুতে এ দ্বিতীয় অর্থটিকে আরো সুস্পষ্ট করে এভাবে তুলে ধরা হয়েছেঃ

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ –

"তোমরা কি এমন নির্লজ্জতার কাজ কর, যা দুনিয়ার সৃষ্টিকুলের মধ্যে তোমাদের আগে কেউ করেনি?"

১০৯. এরও দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এ ক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য আল্লাহ যে স্ত্রী জাতির সৃষ্টি করেছিলেন তাদেরকে বাদ দিয়ে তোমরা অস্বাভাবিক উপায়ে অর্থাৎ পুরুষদেরকে এ

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

তারা বললো, "হে লূত! যদি তুমি এসব কথা থেকে বিরত না হও, তাহলে আমাদের জনপদগুলো থেকে যেসব লোককে বের করে দেয়া হয়েছে তুমিও নির্ঘাত তাদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।"[১১১] সে বললো, "তোমাদের এসব কৃতকর্মের জন্য যারা দুঃখবোধ করে আমি তাদের অন্তরভুক্ত। হে আমার রব! আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনকে এদের কুকর্ম থেকে মুক্তি দাও।"[১১২] শেষে আমি তাকে ও তার সমস্ত পরিবার পরিজনকে রক্ষা করলাম, এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে পেছনে অবস্থানকারীদের দলভুক্ত ছিল।[১১৩] তারপর অবশিষ্ট লোকদেরকে আমি ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের ওপর বর্ষণ করলাম একটি বৃষ্টিধারা, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের ওপর বর্ষিত এ বৃষ্টি ছিল বড়ই নিকৃষ্ট।[১১৪]

নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই মান্যকারী নয়। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালী এবং করুণাময়ও।

উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছো। দুই, আল্লাহ এ স্ত্রীদের মধ্যে এ ক্ষুধা পরিতৃপ্তির যে স্বাভাবিক পথ রেখেছিলেন তা বাদ দিয়ে তোমরা অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করছো। এই দ্বিতীয় অর্থটি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, এ জালেমরা নিজেদের স্ত্রীদেরকেও প্রকৃতি বিরোধী পথে ব্যবহার করতো। হতে পারে পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এ কাজ করেছে।

১১০. অর্থাৎ তোমাদের কেবলমাত্র এ একটিই অপরাধ নয়। তোমাদের জীবনের সমস্ত রীতিই সীমাতিরিক্ত ভাবে বিগড়ে গেছে। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে তাদের এ সাধারণ অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ –

"তোমাদের অবস্থা কি এমন হয়ে গেছে যে, চোখে দেখে অশ্লীল কাজ করছো? (আন্ নামল ঃ ৫৪)

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ

"তোমরা কি এমনই বিকৃত হয়ে গেছো যে, পুরুষদের সাথে সংগম করছো, রাজপথে দস্যুতা করছো এবং নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে খারাপ কাজ করছো?"

(আল আনকাবুত ঃ ২৯ আয়াত)

[আরো বেশী বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল হিজর ৩৯ টীকা]।

১১১. অর্থাৎ তুমি জানো এর আগে যে ব্যক্তিই আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে অথবা আমাদের কাজের প্রতিবাদ করেছে কিংবা আমাদের ইচ্ছা বিরোধী কাজ করেছে তাকেই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। এখন যদি তুমি এসব কথা বলতে থাকো, তাহলে তোমার পরিণামও অনুরূপই হবে। সূরা আ'রাফ ও সূরা নাম্‌লে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত লূতকে (আ) এ নোটিশ দেবার আগে এ পাপাচারী জাতির লোকেরা নিজেদের মধ্যে ফায়সালা করে নিয়েছিল ঃ

أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

"লূত ও তার পরিবারের লোকদের এবং সাথীদেরকে নিজেদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা বড়ই পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। এ 'নেককারদের'কে বাইরের পথ দেখিয়ে দাও।"

১১২. এর এ অর্থও হতে পারে, তাদের খারাপ কাজের খারাপ পরিণাম থেকে আমাদের বাঁচাও। আবার এ অর্থও হতে পারে, এই অসৎ লোকদের জনপদে যেসব নৈতিক আবর্জনা ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের সন্তান সন্ততিদের গায়ে যেন সেগুলোর স্পর্শ লেগে না যায়। ঈমানদারদের নিজেদের বংশধররা যেন নোংরা পরিবেশে প্রভাবিত না হয়ে পড়ে। কাজেই হে আমাদের রব! এ কলুষিত সমাজে জীবন যাপন করার ফলে আমরা যে সার্বক্ষণিক আযাবে লিপ্ত হচ্ছি তার হাত থেকে আমাদের বাঁচাও।

১১৩. এখানে হযরত লূতের (আ) স্ত্রীর কথা বলা হচ্ছে। সূরা তাহরীমে হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূতের (আ) স্ত্রীদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا -

"এ মহিলা দু'টি আমার দু'জন সৎ বান্দার গৃহে ছিল। কিন্তু তারা তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।" (১০ আয়াত)

অর্থাৎ তারা উভয়ই ছিল ঈমান শূন্য এবং নিজেদের সৎ স্বামীদের সাথে সহযোগিতা করার পরিবর্তে তারা তাদের কাফের জাতির সহযোগী হয়। এজন্য আল্লাহ যখন লূতের জাতির ওপর আযাব নাযিল করার ফায়সালা করলেন এবং হযরত লূতকে নিজের পরিবার পরিজনদের নিয়ে এ এলাকা ত্যাগ করার হুকুম দিলেন তখন সাথে সাথে নিজের স্ত্রীকে সংগে না নেবার হুকুমও দিলেনঃ

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ -

"কাজেই কিছু রাত থাকতেই তুমি নিজের পরিবার–পরিজনদেরকে সাথে নিয়ে বের হয়ে যাও এবং তোমাদের কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে সংগে করে নিয়ে যাবে না। তাদের ভাগ্যে যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে।"

(হূদ ঃ ৮১ আয়াত)

১১৪. এ বৃষ্টি বলতে এখানে পানির বৃষ্টি নয় বরং পাথর বৃষ্টির কথা বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ আযাবের যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত লূত যখন রাতের শেষ প্রহরে নিজের সন্তান–পরিজনদের নিয়ে বের হয়ে গেলেন তখন ভোরের আলো ফুটতেই সহসা একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ) একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প তাদের জনপদকে ওলট পালট করে দিয়ে গেলো। (جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا) একটি ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির অগ্নোৎপাতের মাধ্যমে তাদের ওপর পোড়ামাটির পাথর বর্ষণ করা হলোঃ (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ) এবং একটি ঝড়ো হাওয়ার মাধ্যমেও তাদের ওপর পাথর বর্ষণ করা হয়েছে ঃ (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا)

বাইবেলের বর্ণনাসমূহ, প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন রচনাবলী, আধুনিক ভূমিস্তর গবেষণা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ থেকে এ আযাবের বিস্তারিত বিবরণের ওপর যে আলোকপাত হয় তার সংক্ষিপ্ত সার নিচে বর্ণনা করছি ঃ

মরু সাগরের (Dead sea) দক্ষিণ ও পশ্চিমে যে এলাকাটি বর্তমানে একেবারেই বিরান ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে বিপুল সংখ্যক পুরাতন জনপদের ঘর বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো প্রমাণ করে যে, এটি এক সময় ছিল অত্যন্ত জনবহুল এলাকা। আজ সেখানে শত শত ধ্বংস প্রাপ্ত পল্লীর চিহ্ন পাওয়া যায়। অথচ বর্তমানে এ এলাকাটি আর তেমন শস্যশ্যামল নয়। ফলে এ পরিমাণ জনবসতি লালন করার ক্ষমতা তার নেই। প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণের ধারণা, খৃষ্টপূর্ব ২৩০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১৯০০ সাল পর্যন্ত এটি ছিল বিপুল জনবসতি ও প্রাচুর্যপূর্ণ এলাকা। আর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আমল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের অনুমান, সেটি ছিল খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার সালের কাছাকাছি সময়। এদিক দিয়ে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সাক্ষ একথা সমর্থন করে যে, এ এলাকাটি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর ভাতিজা হযরত লূতের সময় ধ্বংস হয়েছিল।

বাইবেলে যে এলাকাটিকে বলা হয়েছে 'সিদ্দিমের উপত্যকা' সেটিই ছিল এখানকার সবচেয়ে জনবহুল ও শস্য–শ্যামল এলাকা। এ এলাকাটি সম্পর্কে বাইবেলে বলা হয়েছেঃ যর্দ্দনের সমস্ত অঞ্চল সোয়র পর্যন্ত সর্বত্র সজল, সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায়, মিসর দেশের ন্যায়, কেননা তৎকালে সদাপ্রভু সদোম ও ঘমোরা বিনষ্ট করেন নাই।" (আদিপুস্তক ১৩ঃ১০) বর্তমান কালের গবেষকদের অধিকাংশের মত হচ্ছে, সে উপত্যকাটি বর্তমানে মরুসাগরের বুকে জলমগ্ন আছে। বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষের সাক্ষ–প্রমাণ থেকে এ মত গঠন

করা হয়েছে। প্রাচীনকালে মরুসাগর দক্ষিণ দিকে আজকের মতো এতটা বিস্তৃত ছিল না। ট্রান্স জর্দানের বর্তমান শহর 'আল করক'–এর সামনে পশ্চিম দিকে এ হ্রদের মধ্যে 'আল লিসান' নামক একটি ব–দ্বীপ দেখা যায়। প্রাচীনকালে এখানেই ছিল পানির শেষ প্রান্ত। এর নিম্নাঞ্চলে বর্তমানে পানি ছড়িয়ে গেছে (সংশ্লিষ্ট নকশায় পার্শ্বরেখা দিয়ে একে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি)। পূর্বে এটি উর্বর শস্যশ্যামল এলাকা হিসেবে জনবসতিপূর্ণ ছিল। এটিই ছিল সিদ্দিম উপত্যকা এবং এখানেই ছিল লূতের জাতির সদোম, ঘমোরা, অদমা, সবোয়ীম ও সুগার–এর মতো বড় বড় শহরগুলো। খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বছরের কাছাকাছি এক সময় একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পে এ উপত্যকাটি ফেটে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে যায় এবং মরুসাগরের পানি একে নির্মজ্জিত করে ফেলে। আজো এটি হ্রদের সবচেয়ে অগভীর অংশ। কিন্তু বাইজানটাইন শাসকদের যুগে এ অংশটি এত বেশী অগভীর ছিল যে, লোকেরা আল লিসান থেকে পশ্চিম তীর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে পানি পার হয়ে যেতো। তখনো দক্ষিণ তীরের লাগোয়া এলাকায় পানির মধ্যে ডুবন্ত বনাঞ্চল পরিষ্কার দেখা যেতো। বরং পানির মধ্যে কিছু দালান কোঠা ডুবে আছে বলে সন্দেহ করা হতো।

বাইবেল ও পুরাতন গ্রীক ও ল্যাটিন রচনাবলী থেকে জানা যায়, এ এলাকায় বিভিন্ন স্থানে নাফাত (পেট্রোল) ও স্ফল্টের কূয়া ছিল। অনেক জায়গায় ভূগর্ভ থেকে অগ্নিউদ্দীপক গ্যাসও বের হতো। এখনো সেখানে ভূগর্ভে পেট্রোল ও গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ভূ–স্তর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমান করা হয়েছে, ভূমিকম্পের প্রচণ্ড ঝাকুনীর সাথে পেট্রোল, গ্যাস ও স্ফল্ট ভূ–গর্ভ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে জ্বলে ওঠে এবং সমগ্র এলাকা ভস্মীভূত হয়ে যায়। বাইবেলের বর্ণনা মতে, এ ধ্বংসের খবর পেয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হিব্রোন থেকে এ উপত্যকার অবস্থা দেখতে আসেন। তখন মাটির মধ্য থেকে কামারের ভাটির ধোঁয়ার মতো ধোঁয়া উঠছিল। (আদিপুস্তক ১৯ ঃ ২৮)।

১০ রুকু'

আইকাবাসীরা রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো।[১১৫] যখন শো'আইব তাদেরকে বলেছিল, "তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আমি এ কাজে তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশী নই। আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো রব্বুল আলামীনের। তোমরা মাপ পূর্ণ করে দাও এবং কাউকে কম দিয়ো না। সঠিক পাল্লায় ওজন করো এবং লোকদেরকে তাদের জিনিস কম দিয়ো না। যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িও না এবং সেই সত্ত্বাকে ভয় করো যিনি তোমাদের ও অতীতের প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছেন।"

১১৫. আইকাবাসীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে সূরা আল হিজ্‌রের ৭৮–৮৪ আয়াতে করা হয়েছে। এখানে করা হচ্ছে তার বিস্তারিত আলোচনা। মাদ্‌য়ান ও আইকাবাসীরা দু'টি আলাদা জাতি অথবা একটি জাতির দু'টি পৃথক নাম, এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। একদল মনে করেন, তারা দু'টি পৃথক জাতি। এজন্য তাদের সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে, সূরা আ'রাফে হযরত শো'আইবকে মাদ্‌য়ানবাসীদের ভাই বলা হয়েছেঃ (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا) আর এখানে আইকাবাসীদের উল্লেখ করতে গিয়ে শুধুমাত্র বলা হয়েছে إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ (যখন শু'আইব তাদেরকে বললো)। এখানে তাদের ভাই (أَخُوهُمْ) শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। পক্ষান্তরে কোন কোন মুফাস্‌সির উভয়কে একই জাতি গণ্য করেছেন। কারণ সূরা আ'রাফ ও সূরা হূদে মাদ্‌য়ানবাসীদের যেসব রোগ ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে এখানে আইকাবাসীদের সে একই রোগ ও গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। হযরত শো'আইবের দাওয়াত ও উপদেশও একই এবং শেষে তাদের পরিণতির মধ্যেও কোন ফারাক নেই।
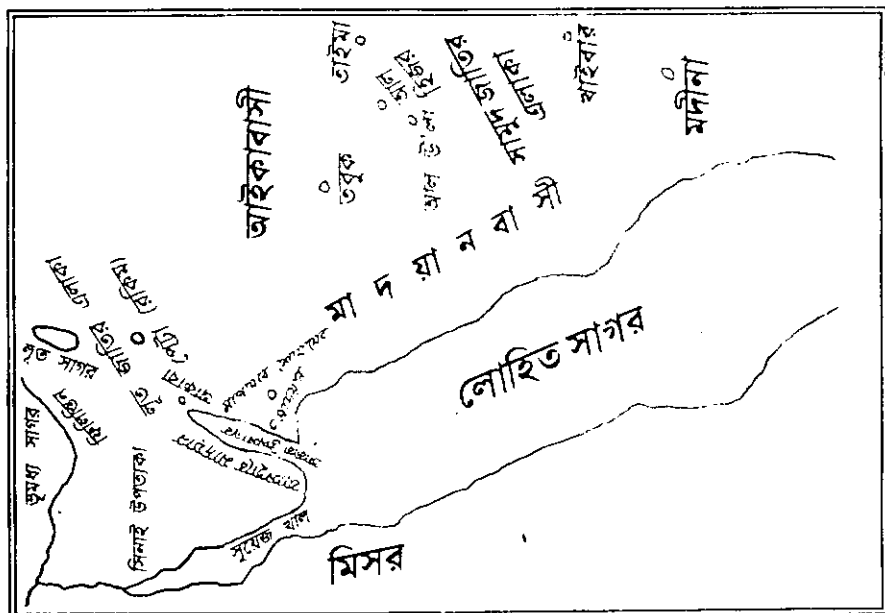
গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায়, এ দু'টি উক্তি মূলতঃ সঠিক। সন্দেহাতীতভাবে মাদ্‌য়ানবাসী ও আইকাবাসীরা দু'টি আলাদা গোত্র। কিন্তু মূলত তারা একই বংশধারার দু'টি পৃথক শাখা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী বা দাসী কাতুরার গর্ভজাত সন্তানরা আরব ও ইসরাঈলী ইতিহাসে বনী কাতুরা নামে পরিচিত। এদের একটি গোত্র সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করে। মাদ্‌য়ান ইবনে ইবরাহীমের বংশোদ্ভূত হবার ফলে তাদেরকে মাদ্‌য়ানী বা মাদ্‌য়ান বাসী বলা হয়। এদের বসতি উত্তর হেজায থেকে ফিলিস্তীনের দক্ষিণ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সিনাই বদ্বীপের শেষ কিনারা পর্যন্ত লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূল এলাকায় বিস্তৃত হয়। এর কেন্দ্রস্থল ছিল মাদ্‌য়ান শহর। আবুল ফিদার মতে এটি আকাবা উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে আইলা (বর্তমান আকাবা) থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। বনী কাতুরার অন্যান্য গোত্রের মধ্যে বনী দীদান (Dedanties) তুলনামূলকভাবে বেশী পরিচিত। উত্তর আরবে তাইমা, তাবুক ও আল'উলার মাঝামাঝি স্থানে তারা বসতি গড়ে। তাদের কেন্দ্রীয় স্থান ছিল তাবুক। প্রাচীনকালে একে আইকা বলা হতো। (মু'জামুল বুলদান গ্রন্থে ইয়াকূত আইকা শব্দের আলোচনায় বলেছেন, এটি তাবুকের পুরাতন নাম এবং তাবুকবাসীদের মধ্যে একথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, এ স্থানটিই এক সময় আইকা নামে পরিচিত ছিল।)

মাদ্‌য়ানবাসী ও আইকাবাসীদের জন্য একজন রসূল পাঠাবার কারণ সম্ভবত এছিল যে, তারা একই বংশধারার সাথে সম্পর্কিত ছিল, একই ভাষায় কথা বলতো এবং তাদের এলাকাও পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ছিল। বরং বিচিত্র নয়, কোন কোন এলাকায় তাদের বসতি একই সংগে গড়ে উঠেছিল এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়ে সমাজে তারা মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বনী কাতুরার এ দু'শাখার লোকদের পেশাও ছিল ব্যবসায়। তাদের মধ্যে একই ধরনের ব্যবসায়িক অসততা

قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

তারা বললো, "তুমি নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি এবং তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও। আর আমরা তো তোমাকে একেবারেই মিথ্যুক মনে করি। যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি টুকরা ভেংগে আমাদের ওপর ফেলে দাও।" শো'আইব বললো, আমার রব জানেন তোমরা যা কিছু করছো।"[১১৬] তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। শেষ পর্যন্ত ছাতার দিনের আযাব তাদের ওপর এসে পড়লো[১১৭] এবং তা ছিল বড়ই ভয়াবহ দিনের আযাব।

নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে রয়েছে একটি নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশ মান্যকারী নয়। আর প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালী এবং দয়াময়ও।

এবং ধর্মীয় ও চারিত্রিক দোষ পাওয়া যেতো। বাইবেলের প্রথম দিকের পুস্তকগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় এ আলোচনা পাওয়া যায় যে, এরা বা'লে ফুগূরের পূজা করতো। বনী ইসরাঈল যখন মিসর থেকে বের হয়ে এদের এলাকায় আসে তখন তাদের মধ্যেও এরা শিরক ও ব্যভিচারের রোগ ছড়িয়ে দেয়। (গণনা পুস্তক ২৫ঃ ১-৫ এবং ৩১ঃ ১৬-১৭) তাছাড়া দু'টি বড় বড় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের ওপর এদের বসতি গড়ে উঠেছিল। এপথ দু'টি ইয়ামন থেকে সিরিয়া এবং পারস্য উপসাগর থেকে মিসরের দিকে চলে গিয়েছিল। এ দু'টি রাজপথের ধারে বসতি হবার কারণে এদের লূটতরাজ ও রাহাজানির কারবার ছিল খুবই রমরমা। অন্যসব জাতির বাণিজ্য কাফেলাকে বিপুল পরিমাণ কর না দিয়ে তারা এ এলাকা অতিক্রম করতে দিতো না। নিজেরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ দখল করে রাখার ফলে পথের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে রেখেছিল। কুরআন মজীদে তাদের এ অবস্থানকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ إِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ এ জাতি দু'টি (লূতের জাতি ও আইকাবাসী) প্রকাশ্য রাজপথের ওপর বসবাস করতো।" এদের রাহাজানির কথা সূরা আ'রাফে এভাবে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ "আর প্রত্যেক পথের ওপর লোকদেরকে ভয় দেখাবার জন্য বসে যেয়ো না।" এ সমস্ত কারণে আল্লাহ এ উভয় সম্প্রদায়ের জন্য একই নবী পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে একই ধরনের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হযরত শো'আইব ও মাদ্‌য়ানবাসীদের কাহিনী বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন আল আ'রাফের ৮৫-৯৩, হূদের ৮৪-৯৫ এবং আল আনকাবুতের ৩৬-৩৭ আয়াত।

১১৬. অর্থাৎ আযাব নাযিল করা আমার কাজ নয়। এটা তো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতার অন্তরভুক্ত এবং তিনি তোমাদের কার্যকলাপ দেখছেন। যদি তিনি তোমাদেরকে এ আযাবের উপযুক্ত মনে করেন তাহলে তিনি নিজেই আযাব পাঠাবেন। আইকাবাসীদের এ দাবী ও হযরত শো'আইবের এ জবাবের মধ্যে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের জন্য একটি সতর্কবাণী ছিল। অর্থাৎ তারাও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ একই দাবী করছিলঃ

اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا

"অথবা ফেলে দাও আমাদের ওপর আকাশের একটি টুক্‌রা যেমন তুমি দাবী করছো" (বনী ইসরাঈলঃ ৯২)

তাই তাদেরকে বলা হচ্ছে, এ ধরনের দাবী আইকাবাসীরাও তাদের নবীর কাছে করেছিল, তার যে জবাব তারা পেয়েছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে তোমাদের দাবীর জন্যও রয়েছে সেই একই জবাব।

১১৭. এ আযাবের কোন বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মজীদে বা কোন সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়নি। শব্দের বাহ্যিক অর্থ থেকে যা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, তারা যেহেতু আসমানী আযাব চেয়েছিল তাই আল্লাহ তাদের ওপর পাঠিয়ে দিলেন একটি মেঘমালা। এ মেঘমালাটি আযাবের বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে না দেয়া পর্যন্ত ছাতার মতো তাদের ওপর ছেয়ে রইলো। কুরআন থেকে একথা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, মাদ্‌য়ানবাসীদের আযাবের ধরন আইকাবাসীদের আযাব থেকে আলাদা ছিল। যেমন এখানে বলা হয়েছে এরা ছাতার দিনের আযাবে ধ্বংস হয়েছিল। আর তাদের ওপর আযাব এসেছিল একটি বিস্ফোরণ ও ভূমিকম্পের মাধ্যমে।

(فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ) এবং

(وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ)

তাই এদের উভয় সম্প্রদায়কে মিলিয়ে একটি কাহিনী বানিয়ে দেবার চেষ্টা করা ঠিক নয়। কোন কোন তাফসীরকার "ছাতার দিনের আযাব"-এর কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাদের এসব তথ্যের উৎস আমাদের জানা নেই। ইবনে জারীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ

مَنْ حَدَّثَكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَا عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ فَكَذِّبْهُ -

"আলেমদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই ছাতার দিনের আযাব কি ছিল সে সম্পর্কে তোমাকে কোন তথ্য জানাবে, তা সঠিক বলে মেনে নিয়ো না।"

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾

১১ রুকূ'

এটি[১১৮] রব্বুল আলামীনের নাযিল করা জিনিস।[১১৯] একে নিয়ে আমানতদার রূহ[১২০] অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি তাদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাও যারা (আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর সৃষ্টির জন্য) সতর্ককারী হয়, পরিষ্কার আরবী ভাষায়।[১২১] আর আগের লোকদের কিতাবেও একথা আছে।[১২২] এটা কি এদের (মক্কাবাসীদের) জন্য কোন নিদর্শন নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলেম সমাজ একে জানে?[১২৩]

১১৮. ঐতিহাসিক বর্ণনা শেষ করে এবার আলোচনার ধারা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এমন এক বিষয়ের দিকে যার মাধ্যমে সূরার সূচনা করা হয়েছিল। এ বিষয়টি বুঝতে হলে আর একবার পেছন ফিরে প্রথম রুকু'টি দেখে নেয়া উচিত।

১১৯ . অর্থাৎ এ "সুস্পষ্ট কিতাব" টি যার আয়াত এখানে শোনানো হচ্ছে এবং এ "কথা" যা থেকে লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এটা কোন মানুষের মনগড়া জিনিস নয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রচনা করেননি। বরং রব্বুল আলামীন নাযিল করেছেন।

১২০. অর্থাৎ জিব্রীল আলাইহিস সালাম, যেমন কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ –

"বলে দাও, যে ব্যক্তি জিব্রীলের সাথে শত্রুতা রাখে তার জানা উচিত, সে–ই এ কুরআন আল্লাহর হুকুমে তোমার অন্তরে নাযিল করেছে।" (আল বাকারাহ ঃ ৯৭)

এখানে তাঁর নাম না নিয়ে তাঁর জন্য "রূহুল আমীন" (আমানতদার বা বিশ্বস্ত রূহ) পদবী ব্যবহার করে একথা ব্যক্ত করতে চাওয়া হয়েছে যে, রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এ নাযিলকৃত জিনিসটি নিয়ে কোন বস্তুগত শক্তি আসেনি, যার মধ্যে পরিবর্তন ও অবক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে বরং এসেছে একটি নির্ভেজাল রূহ। তার মধ্যে বস্তুবাদিতার কোন গন্ধ নেই। তিনি পুরোপুরি আমাতনদার। আল্লাহর বাণী যেভাবে তাঁকে সোপর্দ করে দেয়া হয় ঠিক তেমনি হুবহু তিনি তা পৌঁছিয়ে দেন। নিজের পক্ষ থেকে কিছু বাড়ানো বা কমানো অথবা নিজেই কিছু রচনা করে নেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

১২১. এ বাক্যটির সম্পর্ক "আমানতদার রূহ অবতরণ করেছে" এর সাথেও হতে পারে আবার "যারা সতর্ককারী হয়" এর সাথেও হতে পারে। প্রথম অবস্থায় এর অর্থ হবে, সেই আমানতদার রূহ তাকে এনেছেন পরিষ্কার আরবী ভাষায় এবং দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনসব নবীদের অন্তরভুক্ত যাদেরকে আরবী ভাষার মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। এ নবীগণ ছিলেন হূদ, সালেহ, ইসমাঈল ও শো'আইব আলাইহিমুস সালাম। উভয় অবস্থায় বক্তব্যের উদ্দেশ্য একই এবং তা হচ্ছে রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এ শিক্ষা কোন মৃত ভাষায় বা জিনদের ভাষায় আসেনি এবং এর মধ্যে ধাঁধা বা হেঁয়ালি মার্কা কোন গোলমেলে ভাষা ব্যবহার করা হয়নি। বরং এটা এমন প্রাঞ্জল, পরিষ্কার ও উন্নত বাগধারা সম্পন্ন আরবী ভাষায় রচিত, যার অর্থ ও বক্তব্য প্রত্যেক আরবী ভাষাভাষী ও আরবী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অতি সহজে ও স্বাভাবিকভাবে অনুধাবন করতে পারে। তাই যারা এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তারা এর শিক্ষা বুঝতে পারেনি তাদের দিক থেকে এ ধরনের ওজর পেশ করার কোন সুযোগ নেই। বরং তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া ও অস্বীকার করার কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র এই যে, তারা মিসরের ফেরাউন, ইবরাহীমের জাতি, নূহের জাতি, লূতের জাতি, আদ ও সামূদ জাতি এবং আইকাবাসীদের মতো একই রোগে ভূগছিল।

১২২. অর্থাৎ একথা, এ অবতীর্ণ বিষয় এবং এ আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা ইতিপূর্বেকার আসমানী কিতাবগুলোতে রয়েছে। এক আল্লাহর বন্দেগীর একই আহবান, পরকালের জীবনের এই একই বিশ্বাস, নবীদের পথ অনুসরণের একই পদ্ধতি সেসব কিতাবেও পেশ করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব কিতাব এসেছে সেগুলো শিরকের নিন্দাই করে। সেগুলো বস্তুবাদী জীবনাদর্শ ত্যাগ করে এমন সত্য জীবনাদর্শ গ্রহণের আহবান জানায় যেগুলোর ভিত্তি আল্লাহর সামনে মানুষের জবাবদিহির ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে সকল কিতাবের অভিন্ন দাবী এই যে, মানুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ও ক্ষমতা পরিত্যাগ করে নবীদের আনীত আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চলুক। এসব কথার মধ্যে কোনটাই নতুন নয়। দুনিয়ায় কুরআনই প্রথমবার একথাগুলো পেশ করছেনা। কোন ব্যক্তি বলতে পারবে না, তোমরা এমনসব কথা বলছো যা পূর্বের ও পরের কেউ কখনো বলেনি।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি পুরাতন অভিমতের সপক্ষে যেসব যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে এ আয়াতটি তার অন্যতম। ইমাম সাহেবের মতটি হচ্ছে ঃ

যদি কোন ব্যক্তি নামাযে কুরআনের অনুবাদ পড়ে নেয় সে আরবীতে কুরআন পড়তে সক্ষম হলেও বা না হলেও, তার নামায হয়ে যায়। আল্লামা আবু বকর জাস্‌সাসের ভাষায় এ যুক্তির ভিত্তি হলো, আল্লাহ এখানে বলছেন, এ কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যেও ছিল। আর একথা সুস্পষ্ঠ, সে কিতাবগুলোতে কুরআন আরবী ভাষার শব্দ সমন্বয়ে ছিল না। অন্য ভাষায় কুরআনের বিষয়বস্তু উদ্ধৃত করে দেয়া সত্ত্বেও তা কুরআনই থাকে। কুরআন হওয়াকে বাতিল করে দেয় না। (আহকামুল কুরআন, তৃতীয় খণ্ড, ৪২৯ পৃষ্ঠা) কিন্তু এ যুক্তির দুর্বলতা একেবারেই সুস্পষ্ট। কুরআন মজীদ বা অন্য কোন আসমানী কিতাবের কোনটিরও নাযিল হবার ধরন এমন ছিল না যে, আল্লাহ নবীর

অন্তরে কেবল অর্থই সঞ্চার করে দিয়েছেন এবং তারপর নবী তাকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বরং প্রত্যেকটি কিতাব যে ভাষায় এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে শব্দ ও বিষয়বস্তু উভয়টি সহকারেই এসেছে। পূর্ববর্তী যেসব কিতাবে কুরআনের শিক্ষা ছিল মানবিক ভাষা সহকারে নয় বরং আল্লাহর ভাষা সহকারেই ছিল এবং সেগুলোর কোনটির অনুবাদকেও আল্লাহর কিতাব বলা যেতে পারে না এবং তাকে আসলের স্থলাভিষিক্ত করাও সম্ভব নয়। আর কুরআন সম্পর্কে বার বার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, তার প্রতিটি শব্দ আরবী ভাষায় হুবহু নাযিল হয়েছে ঃ (يوسف : ٢) اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا "নিশ্চিতভাবেই আমি তা নাযিল করেছি কুরআন আকারে আরবী ভাষায়।" وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا "আর এভাবে আমি তা নাযিল করেছি একটি নির্দেশ আরবী ভাষায়।" (আর্ রা'দ ঃ ৩৭) (الزمر : ٢٨) قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ "আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত" (আয্ যুমার ঃ ২৮) তারপর আলোচ্য আয়াতের সাথে সংযুক্ত পূর্ববর্তী আয়াতেই বলা হয়েছে, রুহুল আমীন আরবী ভাষায় একে নিয়ে নাযিল হয়েছেন। এখন তার সম্পর্কে কেমন করে একথা বলা যেতে পারে যে, কোন মানুষ অন্য ভাষায় তার যে অনুবাদ করেছে তাও কুরআনই হবে এবং তার শব্দাবলী আল্লাহর শব্দাবলীর স্থলাভিষিক্ত হবে? মনে হচ্ছে যুক্তির এ দুর্বলতাটি মহান ইমাম পরবর্তী সময়ে উপলব্ধি করে থাকতে পারেন। তাই নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, এ বিষয়ে নিজের অভিমত পরিবর্তন করে তিনি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি আরবী ভাষায় কিরাআত তথা কুরআন পড়তে সক্ষম নয় সে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযে কুরআনের অনুবাদ পড়তে পারে যতক্ষণ সে আরবী শব্দ উচ্চারণ করার যোগ্যতা অর্জন না করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আরবীতে কুরআন পড়তে পারে সে যদি কুরআনের অনুবাদ পড়ে তাহলে তার নামায হবে না। আসলে ইমামদ্বয় এমন সব আজমী তথা অনারব নওমুসলিমদেরকে এ সুযোগটি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই আরবী ভাষায় নামায পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারতো না। এ ব্যাপারে কুরআনের অনুবাদও কুরআন এটা তাদের যুক্তির ভিত্তি ছিল না। বরং তাদের যুক্তি ছিল, ইশারায় রুকূ সিজদা করা যেমন রুকূ–সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য জায়েয ঠিক তেমনি আরবী ছাড়া অন্যভাষায় নামায পড়াও এমন ব্যক্তির জন্য জায়েয যে আরবী হরফ উচ্চারণ করতে অক্ষম। অনুরূপভাবে যেমন অক্ষমতা দূর হবার পর ইশারায় রুকূ–সিজদাকারীর নামায হবে না ঠিক তেমনি কুরআন পড়ার ক্ষমতা অর্জন করার পর অনুবাদ পাঠকারীর নামাযও হবে না। (এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সারখ্সী লিখিত মাবসূত, প্রথম খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা এবং ফাতহুল কাদীর ও শারহে ইনায়াহ আলাল হিদায়াহ প্রথম খণ্ড, ১৯০–২০১ পৃষ্ঠা)

১২৩. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের আলেমরা একথা জানে যে, কুরআন মজীদে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা ঠিক সেই একই শিক্ষা যা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোতে দেয়া হয়েছিল। মক্কাবাসীরা কিতাবের জ্ঞান না রাখলেও আশেপাশের এলাকায় বনী ইসরাঈলের বিপুল সংখ্যক আলেম ও বিদ্বান রয়েছে। তারা জানে, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আজ প্রথমবার তাদের সামনে কোন অভিনব ও অদ্ভুত "কথা" রাখেননি বরং হাজার হাজার

বছর থেকে আল্লাহর নবীগণ এই একই কথা বারবার এনেছেন। এ নাযিলকৃত বিষয়ও সেই একই রবুল আলামীনের পক্ষ থেকে এসেছে যিনি পূর্ববর্তী কিতাবগুলো নাযিল করেছিলেন, এ কথাটি কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ততা অর্জন করার জন্য যথেষ্ট নয়?

সীরাতে ইবনে হিশাম থেকে জানা যায়, এ আয়াতগুলো নাযিল হবার কাছাকাছি সময়ে হাবৃশা (বর্তমানে ইথিয়োপিয়া) থেকে হযরত জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাওয়াত শুনে ২০ জনের একটি প্রতিনিধিদল মক্কায় আসে। তারা মসজিদে হারামে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের সামনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মোলাকাত করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন আপনি কি শিক্ষা নিয়ে এসেছেন? তিনি জবাবে কুরআনের কিছু আয়াত শুনান। এগুলো শুনে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে এবং তারা তখনই তাঁকে সত্য রসূল হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনে। তারপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে উঠে যায় তখন আবু জেহেল কয়েকজন কুরাইশীকে সাথে নিয়ে তাদের সাথে দেখা করে এবং তাদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে। সে বলে, "তোমাদের চেয়ে বেশী নির্বোধ কোন কাফেলা কখনো এখানে আসেনি। হে হতভাগার দল! তোমাদের দেশের লোকেরা তোমাদের এখানে পাঠিয়েছিল এ ব্যক্তির অবস্থা অনুসন্ধান করে তাদের কাছে সঠিক তথ্য নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু তোমরা তো তার সাক্ষাত করার সাথে সাথেই নিজেদের ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বসলে।" তারা ছিল ভদ্র ও শরীফ লোক। আবু জেহেলের এ নিন্দাবাদ ও ভর্ৎসনায় বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে তারা সালাম দিয়ে সরে গেলো এবং বলতে থাকলো : আমরা আপনার সাথে বিতর্ক করতে চাই না। আপনার ধর্ম আপনার ইচ্ছা ও ক্ষমতার আওতাধীন এবং আমাদের ধর্মও আমাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার আওতাধীন। যে জিনিসের মধ্যে নিজেদের কল্যাণ দেখেছি সেটিই আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি। (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা) সূরা কাসাসে এ ঘটনার আলোচনা এভাবে এসেছে :

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ○ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ .... وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ز سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ز لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ -

"এর আগে যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনে এবং যখন তাদেরকে তা শুনানো হয় তখন বলে, আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। এ হচ্ছে আমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য। আমরা এর আগেও এই দীন ইসলামের ওপর ছিলাম। .... আর যখন তারা অর্থহীন কথাবার্তা শুনলো তখন বিতর্ক এড়িয়ে গেলো এবং বললো আমাদের কাজ আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। তোমাদের সালাম জানাই। আমরা মূর্খদের পদ্ধতি পছন্দ করিনা। (অর্থাৎ তোমরা আমাদের দু'টি কথা শোনালে জবাবে আমরাও তোমাদের দু'টি কথা শুনালাম)

وَلَوْ نَزَّلْنَٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَٰهُ فِى قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا۟ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

(কিন্তু এদের হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমি এতদূর গড়িয়েছে যে) যদি আমি এটা কোন অনারব ব্যক্তির ওপর নাযিল করে দিতাম এবং সে এই (প্রাঞ্জল আরবীয় বাণী) তাদেরকে পড়ে শোনাতো তবুও এরা মেনে নিতো না।[১২৪] অনুরূপভাবে একে (কথা) আমি অপরাধীদের হৃদয়ে বিদ্ধ করে দিয়েছি।[১২৫] তারা এর প্রতি ঈমান আনে না যতক্ষণ না কঠিন শাস্তি দেখে নেয়।[১২৬] তারপর যখন তা অসচেতন অবস্থায় তাদের ওপর এসে পড়ে তখন তারা বলে, "এখন আমরা কি অবকাশ পেতে পারি"?[১২৭]

১২৪. অর্থাৎ এখন তাদেরই জাতির এক ব্যক্তি পরিষ্কার আরবী ভাষায় এ কালাম পড়ে শুনাচ্ছেন। এতে তারা বলছে, এ ব্যক্তি নিজেই এ কালাম রচনা করেছে। আরবী ভাষীর মুখ থেকে আরবী ভাষণ উচ্চারিত হবার মধ্যে অলৌকিকতার কি আছে যে, তাকে আল্লাহর কালাম বলে মেনে নিতে হবে? কিন্তু এ উচ্চাংগের আরবী কালাম যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অনারব ব্যক্তির ওপর অলৌকিক কার্যক্রম হিসেবে নাযিল করা হতো এবং সে এসে আরবদের কাছে অত্যন্ত নির্ভুল আরবীয় কায়দায় তা পড়ে শোনাতো তাহলে তারা ঈমান না আনার জন্য অন্য কোন বাহানা তালাশ করতো। তখন তারা বলতো, এর ওপর কোন জিন ভর করেছে, সে আজমীর কণ্ঠে আরবী বলে যাচ্ছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস্‌ সাজ্‌দাহ, ৫৪-৫৮ টীকা) আসল জিনিস হচ্ছে, সত্য প্রিয় ব্যক্তির সামনে যে কথা পেশ করা হয় সে তার ওপর চিন্তা করে এবং ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে কথাটা ন্যায় সংগত কিনা সে ব্যাপারে অভিমত প্রতিষ্ঠিত করে। আর যে ব্যক্তি হঠকারী হয়, না মেনে নেয়ার ইচ্ছাই যে প্রথম থেকে লালন করে রেখেছে সে আসল বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দেয়না বরং তা প্রত্যাখান করার জন্য নানান টালবাহানা তালাশ করতে থাকে। তার সামনে কথা যেভাবেই পেশ করা হোক না কেন সে প্রত্যাখ্যান করার জন্য কোন না কোন ওজুহাত বা ছুতো তৈরি করে নেবেই। কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের এই হঠকারিতার পরদা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উন্মোচন করা হয়েছে এবং তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, তোমরা কোন্‌ মুখে ঈমান আনার জন্য মুজি'যা দেখাবার শর্ত আরোপ করছো? তোমরা তো এমন লোক যাদেরকে যে কোন জিনিস দেখিয়ে দেয়া হলেও তারা তা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য কোন না কোন বাহানা তালাশ করে নেবেই। কারণ তোমাদের মধ্যে সত্য কথা মেনে নেবার প্রবণতা নেই ঃ

এরা কি আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছে? তুমি কি কিছু ভেবে দেখেছো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ বিলাস করার অবকাশও দিই এবং তারপর আবার সেই একই জিনিস তাদের ওপর এসে পড়ে যার ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে, তাহলে জীবন যাপনের এ উপকরণগুলো যা তারা এ যাবত পেয়ে আসছে এগুলো তাদের কোন্ কাজে লাগবে?[১২৮]

(দেখো) আমি কখনো কোন জনপদকে তার জন্য উপদেশ দেয়ার যোগ্য সতর্ককারী না পাঠিয়ে ধ্বংস করিনি এবং আমি জালেম ছিলাম না।[১২৯]

এ (সুস্পষ্ট কিতাবটি) নিয়ে শয়তানরা অবতীর্ণ হয়নি।[১৩০] এ কাজটি তাদের শোভাও পায় না।[১৩১] এবং তারা এমনটি করতেই পারে না।[১৩২] তাদেরকে তো এর শ্রবন থেকেও দূরে রাখা হয়েছে।[১৩৩]

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ –

"যদি আমি তোমাদের ওপর কোন কাগজে লেখা কিতাব নাযিল করে দিতাম এবং এরা হাত দিয়ে তা ছুঁয়েও দেখে নিতো, তাহলেও যাদের না মানার তারা বলতো, এতো পরিষ্কার যাদু। (আল আনআম ঃ ৭)

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ –

"আর যদি আমি তাদের ওপর আকাশের কোন দরজাও খুলে দিতাম এবং তারা তার মধ্যে চড়তে থাকতো, তাহলে তারা বলতো আমাদের চোখ প্রতারিত হচ্ছে বরং আমাদের ওপর যাদু করা হয়েছে।" (আল হিজর ঃ ১৪-১৫)

১২৫. অর্থাৎ এটা সত্যপন্থীদের দিলে যেমন আত্মিক প্রশান্তি ও হৃদয়ের সান্তনা হয়ে দেখা দেয় তাদের দিলে এর প্রতিক্রিয়া ঠিক সেভাবে হয় না। বরং একটি গরম লোহার

শলাকা হয়ে এটা তাদের হৃদয়ে এমনভাবে বিদ্ধ হয় যে, তারা অস্থির হয়ে ওঠে এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করার পরিবর্তে তার প্রতিবাদ করার উপায় খুঁজতে থাকে।

১২৬. ঠিক তেমনি আযাব যেমন বিভিন্ন জাতি দেখেছে বলে এ সূরায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২৭. অর্থাৎ আযাব সামনে দেখেই অপরাধীরা বিশ্বাস করতে থাকে যে, নবী যা বলেছিলেন তা ছিল যথার্থই সত্য। তখন তারা আক্ষেপ সহকারে হাত কচলাতে থাকে এবং বলতে থাকে, হায় যদি আমরা এখন কিছু অবকাশ পাই। অথচ অবকাশের সময় পার হয়ে গেছে।

১২৮. এ বাক্যটি ও এর আগের বাক্যটির মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম শূন্যতা রয়ে গেছে। শ্রোতা একটু চিন্তা ভাবনা করলে নিজেই এ শূন্যতা ভরে ফেলতে পারে। আযাব আসার কোন আশংকা তারা করতো না, তাই তারা তাড়াতাড়ি আযাব আসার জন্য হৈ চৈ করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, যেমন সুখের বাঁশি এ পর্যন্ত তারা বাজিয়ে এসেছে তেমনি চিরকাল বাজাতে থাকবে। এ ভরসায় তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চ্যালেঞ্জ দিতো এ মর্মে যে, যদি সত্যি আপনি আল্লাহর রসূল হন এবং আমরা আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে আল্লাহর আযাবের হকদার হয়ে থাকি, তাহলে নিন আমরা তো আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলাম, এবার নিয়ে আসুন সেই আযাব যার ভয় আমাদের দেখিয়ে আসছেন। এ কথায় বলা হচ্ছে, ঠিক আছে, যদি ধরে নেয়া যায় তাদের এ ভরসা সঠিকই হয়ে থাকে, যদি তাদের ওপর তাৎক্ষণিকভাবে আযাব না আসে, যদি দুনিয়ায় আয়েশী জীবন যাপন করার জন্য তারা একটি সুদীর্ঘ অবকাশই পেয়ে যায়, যার আশায় তারা বুক বেঁধেছে, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, যখনই তাদের ওপর আদ, সামূদ বা লূতের জাতি অথবা আইকাবাসীদের মতো কোন আকস্মিক বিপর্যয় আপতিত হবে, যার হাত থেকে, নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তা কারো কাছে নেই অথবা অন্য কিছু না হলেও অন্তত মৃত্যুর শেষ মুহূর্তই এসে পৌঁছুবে, যার বেষ্টনী ভেদ করে পালাবার সাধ্য কারোর নেই, তাহলে সে সময় দুনিয়ার আয়েশ আরাম করার এ কয়েকটি বছর তাদের জন্য কি লাভজনক প্রমাণিত হবে?

১২৯. অর্থাৎ যখন তারা সতর্ককারীদের সতর্কবাণী এবং উপদেশ দাতাদের উপদেশ গ্রহণ করেনি এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম তখন একথা সুস্পষ্ট যে, এটা আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কোন জুলুম ছিল না। ধ্বংস করার আগে তাদেরকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা না করা হলে অবশ্য তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে একথা বলা যেতো।

১৩০. প্রথমে এ বিষয়টির ইতিবাচক দিকের কথা বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এটি রব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত কিতাব এবং রুহুল আমীন এটি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। এখন নেতিবাচক দিক বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হয়েছে, শয়তানরা একে নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি, যেমন সত্যের দুশমনরা দোষারোপ করছে। কুরাইশ বংশীয় কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যে মিথ্যার

অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল সেখানে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল এই যে, কুরআনের আকারে যে বিস্ময়কর বাণী মানুষের সামনে আসছিল এবং তাদের হৃদয়ের গভীরে অনুপ্রবেশ করে চলছিল তার কি ব্যাখ্যা করা যায়। এ বাণী মানুষের কাছে পৌঁছাবার পথ বন্ধ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। লোকদের মনে এ সম্পর্কে কুধারণার সৃষ্টি করা এবং এর প্রভাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, এটাই ছিল এখন তাদের জন্য একটি পেরেশানীর ব্যাপার। এ পেরেশানীর অবস্থার মধ্যে তারা জনগণের মধ্যে যেসব অপবাদ ছড়িয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাউযুবিল্লাহ একজন গণৎকার এবং সধারণ গণৎকারদের মতো তাঁর মনের মধ্যেও এ বাণী শয়তানরা সঞ্চার করে দেয়। এ অপবাদটিকে তারা নিজেদের সবচেয়ে বেশী কার্যকর হাতিয়ার মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল, এ বাণী কোন ফেরেশতা নিয়ে আসে না শয়তান, কারো কাছে একথা যাচাই করার কি মাধ্যমই বা থাকতে পারে এবং শয়তান মনের মধ্যে সঞ্চার করে দেয়, এ অভিযোগের প্রতিবাদ যদি কেউ করতে চায় তাহলে কিভাবে করবে?

১৩১. অর্থাৎ এ বাণী এবং এ বিষয়বস্তু শয়তানের মুখে তো সাজেই না। যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারে, কুরআনে যেসব কথা বর্ণনা করা হচ্ছে সেগুলো কি শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে? তোমাদের জনপদগুলোতে কি গণৎকার নেই এবং শয়তানদের সাথে যোগসাজস করে যেসব কথা এ ব্যক্তি বলছেন তা কখনো তোমরা কোথাও শুনেছো? তোমরা কি কখনো শুনেছো, কোন শয়তান কোন গণৎকারের মাধ্যমে লোকদেরকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আল্লাহকে ভয় করার শিক্ষা দিয়েছে? শির্ক ও মূর্তিপূজা থেকে বিরত রেখেছে? পরকালে জিজ্ঞাসাবাদ করার ভয় দেখিয়েছে? জুলুম-নিপীড়ন, অসৎ-অশ্লীল কাজ ও নৈতিকতা বিগর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে? সৎপথে চলা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন এবং আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সদাচার করার উপদেশ দিয়েছে? শয়তানরা এ প্রকৃতি কোথায় পাবে? তাদের স্বভাব হচ্ছে, তারা মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে অসৎকাজে উৎসাহিত করে। তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী গণকদের কাছে লোকেরা যে কথা জিজ্ঞেস করতে যায় তা হচ্ছে এই যে, প্রেমিক তার প্রেমিকাকে পাবে কি না? জুয়ায় কোন্ দাঁওটা মারলে লাভ হবে? শত্রুকে হেয় করার জন্য কোন্ চালটা চালতে হবে? অমুক ব্যক্তির উট কে চুরি করেছে? এসব সমস্যা ও বিষয় বাদ দিয়ে গণক ও তার পৃষ্ঠপোষক শয়তানরা আবার কবে থেকে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণ ও সংস্কারের শিক্ষা এবং অসৎ কাজে বাধা দেবার ও সেগুলো উৎখাত করার চিন্তা-ভাবনা করেছে?

১৩২. অর্থাৎ শয়তানরা করতে চাইলেও একাজ করার ক্ষমতাই তাদের নেই। সামান্য সময়ের জন্যও নিজেদেরকে মানুষের যথার্থ শিক্ষক ও প্রকৃত অত্মশুদ্ধিকারীর স্থানে বসিয়ে কুরআন যে নির্ভেজাল সত্য ও নির্ভেজাল কল্যাণের শিক্ষা দিচ্ছে সে শিক্ষা দিতে তারা সক্ষম নয়। প্রতারণা করার জন্যও যদি তারা এ কৃত্রিম রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তাদের কাজ এমন মিশ্রনমুক্ত হতে পারে না, যাতে তাদের মূর্খতা ও তাদের মধ্যে লুকানো শয়তানী স্বভাবের প্রকাশ হবে না। যে ব্যক্তি শয়তানদের 'ইল্হাম' তথা আসমানী প্রেরণা লাভ করে নেতা হয়ে বসে তার জীবনেও তার শিক্ষার মধ্যে অনিবার্যভাবে নিয়তের

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٣﴾ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٥﴾ فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٦﴾

কাজেই হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদকে ডেকো না, নয়তো তুমিও শাস্তি লাভকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবে।[১৩৪] নিজের নিকটতম আত্মীয়–পরিজনদেরকে ভয় দেখাও[১৩৫] এবং মু'মিনদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করো। কিন্তু যদি তারা তোমার নাফরমানী করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যাকিছু করো আমি তা থেকে দায়মুক্ত।[১৩৬]

ত্রুটি, সংকল্পের অপবিত্রতা ও উদ্দেশ্যের মালিন্য দেখা দেবেই। নির্ভেজাল সততা ও নির্ভেজাল সৎকর্মশীলতা কোন শয়তান মানুষের মনে সঞ্চার করতে পারে না এবং শয়তানের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী কখনো এর ধারক হতে পারে না। এরপর আছে শিক্ষার উন্নত মান ও পবিত্রতা এবং এর ওপর বাড়তি সুনিপুন বাগধারা ও সাহিত্য–অলংকার এবং গভীর তত্বজ্ঞান, যা কুরআনে পাওয়া যায়। এরি ভিত্তিতে কুরআনে বারবার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, মানুষ ও জিনেরা মিলে চেষ্টা করলেও এ কিতাবের মতো কিছু একটা রচনা করে আনতে পারবে না ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا (بنى اسرائيل : ٨٨)

قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (يونس : ٣٨)

১৩৩. অর্থাৎ কুরআনের বাণী হৃদয়ে সঞ্চার করার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে রুহুল আমীন তা নিয়ে চলতে থাকেন এবং যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোরাজ্যে তিনি তা নাযিল করেন তখন এ সমগ্র ধারাবাহিক কার্যক্রমের কোন এক জায়গায়ও শয়তানদের কান লাগিয়ে শোনারও কোন সুযোগ মেলে না। আশেপাশে কোথাও তাদের ঘুরে বেড়াবার কোন অবকাশই দেয়া হয়না। কোথাও থেকে কোনভাবে কিছু শুনে টুনে দু'একটি কথা চুরি করে নিয়ে গিয়ে তারা নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের বলতে পারতো না যে, আজ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বাণী শুনাবেন অথবা তাঁর ভাষণে অমুক কথা বলা হবে। (আরো বেশী

জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল হিজ্‌র ৮–১২ ও আস্ সাফ্‌ফাত ৫–৭ টীকা এবং সূরা আল জিন ৮– ৯ ও ২৭ আয়াত)

১৩৪. এর অর্থ এ নয়, নাউযুবিল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শিরকের অপরাধ সংঘটিত হবার ভয় ছিল এবং এজন্য তাঁকে ধমক দিয়ে এ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। আসলে কাফের ও মুশরিকদেরকে সতর্ক করাই এর উদ্দেশ্য। বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, কুরআন মজীদে যে শিক্ষা পেশ করা হচ্ছে। তা যেহেতু বিশ্ব–জাহানের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ভেজাল সত্য এবং তার মধ্যে শয়তানী মিশ্রণের সামান্যও দখল নেই, তাই এখানে সত্যের ব্যাপারে কাউকে কোন প্রকার সুযোগ–সুবিধা দেবার কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় যদি কেউ হতে পারেন তবে তিনি হচ্ছেন তাঁর রসূল। কিন্তু ধরে নেয়া যাক যদি তিনিও বন্দেগীর পথ থেকে এক তিল পরিমাণ সরে যান এবং এক আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ হিসেবে ডাকেন তাহলে পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবেন না। এক্ষেত্রে অন্যেরা তো ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই যখন কোন সুবিধা দেয়া হয়নি তখন আর কোন্ ব্যক্তি আছে যে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় কাউকে শরীক করার পর আবার এ আশা করতে পারে যে, সে রক্ষা পেয়ে যাবে অথবা কেউ তাকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে।

১৩৫. অর্থাৎ আল্লাহর এ পবিত্র পরিচ্ছন্ন দীনের মধ্যে যেমন নবীকে কোন সুবিধা দেয়া হয়নি ঠিক তেমনি নবীর পরিবার ও তাঁর নিকটতম আত্মীয়–বান্ধবদের জন্যও কোন সুবিধার অবকাশ রাখা হয়নি। এখানে যার সাথেই কিছু করা হয়েছে তার গুণাগুণের (Merits) প্রেক্ষিতেই করা হয়েছে। কারো বংশ মর্যাদা বা কারো সাথে কোন ব্যক্তির সম্পর্ক কোন উপকার করতে পারে না। পথ ভ্রষ্টতা ও অসৎকর্মের জন্য আল্লাহর আযাবের ভয় সবার জন্য সমান। এমন নয় যে, অন্য সবাই তো এসব জিনিসের জন্য পাকড়াও হবে কিন্তু নবীর আত্মীয়রা রক্ষা পেয়ে যাবে। তাই হুকুম দেয়া হয়েছে, নিজের নিকটতম আত্মীয়দেরকেও পরিষ্কার ভাষায় সতর্ক করে দাও। যদি তারা নিজেদের আকীদা–বিশ্বাস ও কার্যকলাপ পরিচ্ছন্ন না রাখে তাহলে তারা যে নবীর আত্মীয় একথা তাদের কোন কাজে লাগবেনা।

নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে, এ আয়াত নাযিল হবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার আগে নিজের দাদার সন্তানদের ডাকলেন এবং তাদের একেকজনকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

يَابَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، يَا عَبَّاسُ ، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ، اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، فَاِنِّىْ لاَ اَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ، سَلُوْنِىْ مِنْ مَالِىْ مَا شِئْتُمْ –

"হে বনী আবদুল মুত্তালিব, হে আব্বাস, হে আল্লাহর রসূলের ফুফী সফীয়াহ, হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা, তোমরা আগুনের আযাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার

চিন্তা করো। আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারবো না। তবে হাঁ, আমার ধন-সম্পত্তি থেকে তোমরা যা চাও চাইতে পারো।"

তারপর তিনি অতি প্রত্যুষে সাফা পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় উঠে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন ঃ يَا صَبَاحَاهُ (হায়, সকালের বিপদ!) হে কুরাইশের লোকেরা! হে বনী কা'ব ইবনে লুআই! হে বনী মুররা! হে কুসাইর সন্তান সন্ততিরা! হে বনী আবদে মান্নাফ! হে বনী আব্দে শাম্স! হে বনী হাশেম, হে বনী আবদুল মুত্তালিব! এভাবে কুরাইশদের প্রত্যেকটি গোত্র ও পরিবারের নাম ধরে ধরে তিনি আওয়াজ দেন। আরবে একটি প্রচলিত নিয়ম ছিল, অতি প্রত্যুষে যখন কোন বহিশত্রুর হামলার আশংকা দেখা দিতো, ওয়াকিফহাল ব্যক্তি এভাবেই সবাইকে ডাকতো এবং লোকেরা তার আওয়াজ শুনতেই চারদিক থেকে দৌড়ে যেতো। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আওয়াজ শুনে লোকেরা যার যার ঘর থেকে বের হয়ে এলো। তখন তিনি বললেন ঃ "হে লোকেরা! যদি আমি বলি, এ পাহাড়ের পেছনে একটি বিশাল সেনাবাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য ওৎ পেতে আছে। তাহলে কি তোমরা আমার কথা সত্য বলে মেনে নেবে?" সবাই বললো, হ্যাঁ আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তুমি কখনো মিথ্যা বলনি। তিনি বললেন, "বেশ, তাহলে আমি আল্লাহর কঠিন আযাব আসার আগে তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। তাঁর পাকড়াও থেকে নিজেদের বাঁচাবার চিন্তা করো। আল্লাহর মোকাবিলায় আমি তোমাদের কোন কাজে লাগতে পারবোনা। কিয়ামতের দিন কেবলমাত্র মুত্তাকীরাই হবে আমার আত্মীয়। এমন যেন না হয়, অন্য লোকেরা সৎকাজ নিয়ে আসবে এবং তোমরা দুনিয়ার জঞ্জাল মাথায় করে নিয়ে উপস্থিত হবে। সে সময় তোমরা ডাকবে, হে মুহাম্মাদ! কিন্তু আমি তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবো। তবে দুনিয়ায় আমার সাথে তোমাদের রক্তের সম্পর্ক এবং এখানে আমি তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবো।" এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অনেকগুলো হাদীস বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত আয়েশা, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত যুহাইর ইবনে আমর ও হযরত কুবাইসাহ ইবনে মাহারিক থেকে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনে وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ -এর হুকুম হলো এবং নবী (সা) তাঁর আত্মীয়দেরকে একত্র করে একথা জানিয়ে দিয়ে সে হুকুম তামিল করলেন, ব্যাপারটির এখানেই শেষ নয়। আসলে এর মধ্যে যে মূলনীতি সুস্পষ্ট করা হয়েছিল তা ছিল এই যে, দীনের মধ্যে নবী ও তাঁর বংশের জন্য এমন কোন বিশেষ সুবিধা নেই যা থেকে অন্যরা বঞ্চিত। যে জিনিসটি প্রাণ সংহারক বিষ সেটি সবারই জন্য প্রাণ সংহারক। নবীর কাজ হচ্ছে সবার আগে নিজে তা থেকে বাঁচবেন এবং নিজের নিকবর্তী লোকদেরকে তার ভয় দেখাবেন। তারপর সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে এ মর্মে সতর্ক করে দেবেন যে, এটি যে-ই খাবে সে-ই মারা পড়বে। আর যে জিনিসটি লাভজনক তা সবার জন্য লাভজনক। নবীর দায়িত্ব হচ্ছে, সবার আগে তিনি নিজে সেটি অবলম্বন করবেন এবং নিজের আত্মীয়দেরকে সেটি অবলম্বন করার উপদেশ দেবেন। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি দেখে নেবে এ ওয়াজ-নসিহত শুধুমাত্র অন্যের জন্য নয় বরং নিজের

দাওয়াতের ব্যাপারে নবী আন্তরিক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবন এ পদ্ধতি অবলম্বন করে গেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন যখন তিনি শহরে প্রবেশ করলেন তখন ঘোষণা করে দিলেন ঃ

كُلُّ رِبَافِى الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ تَحْتَ قَدَمِىَّ هَاتَيْنِ وَاَوَّلُ مَا اَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ -

"লোকদের কাছে অনাদায়কৃত জাহেলী যুগের প্রত্যেকটি সুদ আমার এ দু'পায়ের তলে পিষ্ট করা হয়েছে। আর সবার আগে যে সূদকে আমি রহিত করে দিচ্ছি তা হচ্ছে আমার চাচা আব্বাসের পাওনা সূদ।"

(উল্লেখ্য, সূদ হারাম হবার আগে হযরত আব্বাস (রা) সূদে টাকা খাটাতেন এবং সে সময় পর্যন্ত লোকদের কাছে তাঁর বহু টাকার সূদ পাওনা ছিল) একবার চুরির অভিযোগে তিনি কুরাইশদের ফাতিমা নামের একটি মেয়ের হাত কাটার হুকুম দিলেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) তার পক্ষে সুপারিশ করলেন। এতে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করতো তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম।

১৩৬. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তোমার আত্মীয় পরিজনদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনে তোমার অনুসরণ করবে তাদের সাথে কোমল, স্নেহপূর্ণ ও বিনম্র ব্যবহার করো। আর যারা তোমার কথা মানবে না তাদের দায়মুক্ত হবার কথা ঘোষণা করে দাও। দুই, যেসব আত্মীয়কে সতর্ক করার হুকুম দেয়া হয়েছিল এ উক্তি কেবলমাত্র তাদের সাথে সম্পর্কিত নয় বরং এটি ব্যাপকভাবে সবার জন্য। অর্থাৎ যারা ঈমান এনে তোমার আনুগত্য করে তাদের সাথে বিনম্র আচরণ করো এবং যারাই তোমার নাফরমানি করে তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দাও যে, তোমাদের কার্যকলাপের সমস্ত দায় দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।

এ আয়াত থেকে জানা যায়, সে সময় কুরাইশ ও তার আশেপাশের আরববাসীদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছিল কিন্তু কার্যত তারা তাঁর আনুগত্য করছিল না বরং তারা যথারীতি তাঁদের ভ্রষ্ঠ ও বিভ্রান্ত সমাজ কাঠামোর মধ্যে ঠিক তেমনিভাবে জীবন যাপন করে যাচ্ছিল যেমন অন্যান্য কাফেররা করছিল। আল্লাহ এ ধরনের স্বীকৃতি দানকারীদেরকে এমন সব মু'মিনদের থেকে আলাদা গণ্য করেছিলেন যাঁরা নবীর (সা) স্বীকৃতি দান করার পর তাঁর আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করেছিল। বিনম্র ব্যবহার করার হুকুম শুধুমাত্র এ শেষোক্ত দলটির জন্য দেয়া হয়েছিল। আর যারা নবীর (সা) আনুগত্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিল, যার মধ্যে তাঁর সত্যতা স্বীকারকারীও এবং তাঁকে অস্বীকারকারীও ছিল, তাদের সম্পর্কে নবীকে (সা) নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা প্রকাশ করে দাও এবং পরিষ্কার বলে দাও, নিজেদের কর্মকাণ্ডের ফলাফলে তোমরা নিজেরাই ভুগবে এবং তোমাদের সতর্ক করে দেবার পর এখন আর তোমাদের কোন কাজের দায়-দায়িত্ব আমার ওপর নেই।

আর সেই পরাক্রান্ত ও দয়াময়ের ওপর নির্ভর করো[১৩৭] যিনি তোমাকে দেখতে থাকেন যখন তুমি ওঠো[১৩৮] এবং সিজ্‌দাকারীদের মধ্যে তোমার ওঠা–বসা ও নড়া চড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।[১৩৯] তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

১৩৭. অর্থাৎ দুনিয়ার বৃহত্তম শক্তিরও পরোয়া করো না এবং মহাপরাক্রমশালী ও দয়াময় সত্তার ওপর নির্ভর করে কাজ করে যাও। তাঁর পরাক্রমশালী হওয়াই একথার নিশ্চয়তা বিধান করে যে, যার পেছনে তাঁর সমর্থন আছে তাকে দুনিয়ায় কেউ হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে না। আর তাঁর দয়াময় হওয়া এ নিশ্চিন্ততার জন্য যথেষ্ট যে, তাঁর জন্য যে ব্যক্তি সত্যের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার কাজে জীবন উৎসর্গ করবে তার প্রচেষ্টাকে তিনি কখনো নিষ্ফল হতে দেবেন না।

১৩৮. ওঠার অর্থ রাতে নামাযের জন্য ওঠাও হতে পারে, আবার রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য ওঠাও হতে পারে।

১৩৯. এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, আপনি যখন জামায়াতের সাথে নামায পড়ার সময় নিজের মুকতাদীদের সাথে ওঠা–বসা ও রুকূ'–সিজ্‌দা করেন তখন আল্লাহ আপনাকে দেখতে থাকেন। দুই, রাতের বেলা উঠে যখন নিজের সাথিরা (যাদের বৈশিষ্টসূচক গুণ হিসেবে "সিজ্‌দাকারী" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে) তাদের পরকাল গড়ার জন্য কেমন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তা দেখার উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকেন তখন আপনি আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকেন না। তিন, আপনি নিজের সিজ্‌দাকারী সাথিদেরকে সংগে নিয়ে আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন করার জন্য যেসব প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ তা অবগত আছেন। চার, সিজ্‌দাকারী লোকদের দলে আপনার যাবতীয় তৎপরতা আল্লাহর নজরে আছে। তিনি জানেন আপনি কিভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, কিভাবে ও কেমন পর্যায়ে তাদের আত্মশুদ্ধি করছেন এবং কিভাবে ভেজাল সোনাকে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের এসব গুণের উল্লেখ এখানে যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তার সম্পর্ক ওপরের বিষয়বস্তুর সাথেও এবং সামনের বিষয়বস্তুর সাথেও আছে। ওপরের বিষয়বস্তুর সাথে তার সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রহমত ও তাঁর শক্তিশালী সমর্থনলাভের যোগ্য। কারণ আল্লাহ কোন অন্ধ ও বধির মাবুদ নন বরং একজন চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন শাসক। তাঁর পথে আপনার সংগ্রাম–সাধনা এবং সিজদাকারী সাথিদের মধ্যে আপনার তৎপরতা সবকিছু তাঁর দৃষ্টিতে আছে। পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে এর সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো যে ব্যক্তির জীবন এবং যার সাথিদের গুণাবলী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথিদের মতো, তার ওপর শয়তান অবতীর্ণ

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُوْنَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٦﴾

হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের জানাবো শয়তানরা কার ওপর অবতীর্ণ হয়? তারা তো প্রত্যেক জালিয়াত বদকারের ওপর অবতীর্ণ হয়।[১৪০] শোনা কথা কানে ঢুকিয়ে দেয় এবং এর বেশীর ভাগই হয় মিথ্যা।[১৪১]

আর কবিরা! তাদের পেছনে চলে পথভ্রান্ত যারা।[১৪২] তুমি কি দেখো না তারা উপত্যকায় উপত্যকায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়[১৪৩] এবং এমনসব কথা বলে যা তারা করে না?[১৪৪]

হয় অথবা সে কবি—একথা কেবলমাত্র একজন বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তিই বলতে পারে। শয়তান যেসব গণকের কাছে আসে তাদের এবং কবি ও তাদের সাথি সহযোগীদের আচার আচরণ কেমন হয়ে থাকে তা কি কারো অজানা? তোমাদের নিজেদের সমাজে এ ধরনের লোক বিপুল সংখ্যায় পাওয়া যায়। কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি ঈমানদারীর সাথে একথা বলতে পারে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিদের জীবন এবং কবি ও গণকদের জীবনের মধ্যে কোন ফারাক দেখে না? এখন এর চেয়ে বড় বেহায়াপনা আর কি হতে পারে যে, আল্লাহর এ বান্দাদেরকে প্রকাশ্যে কবি ও গণৎকার বলে পরিহাস করা হচ্ছে অথচ কেউ একটু লজ্জাও অনুভব করছে না।

১৪০. এখানে গণৎকার, জ্যোতিষী, ভবিষ্যত বক্তা, "আমলকারী" ইত্যাদি লোক, যারা ভবিষ্যতের খবর জানে বলে ভণ্ড প্রতারকের অভিনয় করে অথবা যারা দ্ব্যর্থবোধক শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করে মানুষের ভাগ্য গণনা করে কিংবা ধড়িবাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জিন, আত্মা ও মক্কেলদের সহায়তায় মানুষের সংকট নিরসনের ব্যবসায় করে থাকে তাদের কথা বলা হয়েছে।

১৪১. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, শয়তানরা কিছু শুনেটুনে নিয়ে নিজেদের চেলাদেরকে জানিয়ে দেয় এবং তাতে সামান্যতম সত্যের সাথে বিপুল পরিমাণ মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায়। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, মিথ্যুক–প্রতারক গণৎকাররা শয়তানের কাছ থেকে কিছু শুনে নেয় এবং তারপর তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে অনেকটা মিথ্যা মিশিয়ে মানুষের কানে ফুঁকে দিতে থাকে। একটি হাদীসে এর আলোচনা এসেছে। হাদীসটি বুখারী শরীফে হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ কোন কোন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গণকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। জবাবে তিনি বলেন, ওসব কিছুই নয়। তারা বলে, হে আল্লাহর রসূল! কখনো কখনো তারা তো আবার ঠিক সত্যি কথাই বলে দেয়। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সত্যি

কথাটা কখনো কখনো জিনেরা নিয়ে আসে এবং তাদের বন্ধুদের কানে ফুঁকে দেয় তারপর তারা তার সাথে নানা রকম মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি কাহিনী তৈরি করে।

১৪২. অর্থাৎ কবিদের সাথে যারা থাকে ও চলাফেরা করে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাদেরকে চলাফেরা করতে তোমরা দেখছো তাদের থেকে স্বভাবে-চরিত্রে, চলনে-বলনে, অভ্যাসে-মেজাজে সম্পূর্ণ আলাদা। উভয় দলের ফারাকটা এতই সুস্পষ্ট যে, এক নজর দেখার পর যে কোন ব্যক্তি উভয় দলের কোন্‌টি কেমন তা চিহ্নিত করতে পারে। একদিকে আছে একান্ত ধীর-স্থির ও শান্ত শিষ্ঠ আচরণ, ভদ্র ও মার্জিত রুচি এবং সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহভীতি। প্রতিটি কথায় ও কাজে আছে দায়িত্বশীলতার অনুভূতি। আচার-ব্যবহারে মানুষের অধিকারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি। লেনদেনে চূড়ান্ত পর্যায়ের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা। কথা যখনই বলা হয় শুধুমাত্র কল্যাণ ও ন্যায়ের জন্যই বলা হয়, অকল্যাণ বা অন্যায়ের একটি শব্দও কখনো উচ্চারিত হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, এদেরকে দেখে পরিষ্কার জানা যায়, এদের সামনে রয়েছে একটি উন্নত ও পবিত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ, এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জনের নেশায় এরা রাতদিন সংগ্রাম করে চলছে এবং এদের সমগ্র জীবন একটি উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হয়েছে। অন্যদিকে অবস্থা হচ্ছে এই যে, সেখানে কোথাও প্রেম চর্চা ও শরাব পানের বিষয় আলোচিত হচ্ছে এবং শ্রোতৃবর্গ লাফিয়ে লাফিয়ে তাতে বাহবা দিচ্ছে। কোথাও কোন দেহপশারিণী অথবা কোন পুরনারী বা গৃহ-ললনার সৌন্দর্যের আলোচনা চলছে এবং শ্রোতারা খুব স্বাদ নিয়ে নিয়ে তা শুনছে "কোথাও অশ্লীল কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে এবং সমগ্র সমাবেশের ওপর যৌন কামনার প্রেত চড়াও হয়ে বসেছে। কোথাও মিথ্যা ও ভাঁড়ামির আসর বসেছে এবং সমগ্র মাহফিল ঠাট্টা-তামাশায় মশগুল হয়ে গেছে। কোথাও কারো দুর্নাম গাওয়া ও নিন্দাবাদ করা হচ্ছে এবং লোকেরা তাতে বেশ মজা পাচ্ছে। কোথাও কারো অযথা প্রশংসা করা হচ্ছে এবং শাবাশ ও বাহবা দিয়ে তাকে আরো উসকিয়ে দেয়া হচ্ছে। আবার কোথাও কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তা শুনে মানুষের মনে আগুন লেগে যাচ্ছে। এসব মজলিসে কবির কবিতা শোনার জন্য যে বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েত হয় এবং বড় বড় কবিদের পেছনে যেসব লোক ঘুরে বেড়ায় তাদেরকে দেখে কোন ব্যক্তি একথা অনুভব না করে থাকতে পারে না যে, এরা হচ্ছে নৈতিকতার বন্ধনমুক্ত, আবেগ ও কামনার স্রোতে ভেসে চলা এবং ভোগ ও পাপ-পংকিলতার পূজারী অর্ধ-পাশবিক একটি নরগোষ্ঠী দুনিয়ায় মানুষের যে কোন উন্নত জীবনাদর্শ ও লক্ষও থাকতে পারে—এ চিন্তা কখনো এদের মন-মগজ স্পর্শও করতে পারে না। এ দু'দলের সুস্পষ্ট পার্থক্য ও ফারাক যদি কারো নজরে না পড়ে তাহলে সে অন্ধ। আর যদি সবকিছু দেখার পরও কোন ব্যক্তি নিছক সত্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ঈমানকে বেমালুম হজম করে একথা বলতে থাকে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর আশেপাশে যারা সমবেত হয়েছে তারা কবি ও কবিদের সাংগোপাংগদের মতো, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তারা মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে নির্লজ্জতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেছে।

১৪৩. অর্থাৎ তাদের নিজস্ব চিন্তার ও বাকশক্তি ব্যবহার করার কোন একটি নির্ধারিত পথ নেই। বরং তাদের চিন্তার পাগলা ঘোড়া বল্গাহারা অশ্বের মতো পথে বিপথে মাঠে

ঘাটে সর্বত্র উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়ায়। আবেগ, কামনা–বাসনা বা স্বার্থের প্রতিটি নতুন ধারা তাদের কন্ঠ থেকে একটি নতুন বিষয়ের রূপে আবির্ভূত হয়। চিন্তা ও বর্ণনা করার সময় এগুলো সত্য ও ন্যায়সংগত কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখার কোন প্রয়োজনই অনুভব করা হয় না। কখনো একটি তরংগ জাগে, তখন তার স্বপক্ষে জ্ঞান ও নীতিকথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে দেয়া হয়। আবার কখনো দ্বিতীয় তরংগ জাগে, সেই একই কণ্ঠ থেকে এবার একেবারেই পূতিগন্ধময় নীচ, হীন ও নিম্নমুখী আবেগ উৎসারিত হতে থাকে। কখনো কারোর প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাকে আকাশে চড়িয়ে দেয়া হয় আবার কখনো নারাজ হলে সেই একই ব্যক্তিকেই পাতালের গভীর গর্তে ঠেলে দেয়া হয়। কোন কুঞ্জুশকে হাতেম এবং কোন কাপুরুষকে বীর রুস্তম গণ্য করতে তাদের বিবেকে একটুও বাধে না যদি তার সাথে তাদের কোন স্বার্থ জড়িত থাকে। পক্ষান্তরে কেউ যদি তাদেরকে কোন দুঃখ দিয়ে থাকে তাহলে তার পবিত্র জীবনকে কলংকিত করার এবং তার ইজ্জত–আবরু ধূলায় মিশিয়ে দেবার বরং তার বংশধারার নিন্দা করার ব্যাপারে তারা একটুও লজ্জা অনুভব করে না। আল্লাহ বিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদ, বস্তুবাদিতা ও আধ্যাত্মিকতা, সদাচার ও অসদাচার, পবিত্রতা–পরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতা–অপরিচ্ছন্নতা, গাম্ভীর্য ও হাস্য–কৌতুক এবং প্রশংসা ও নিন্দাবাদ সবকিছু একই কবির একই কাব্যে পাশাপাশি দেখা যাবে। কবিদের এ পরিচিত বৈশিষ্ট যারা জানে তারা কেমন করে এ কুরআনের বাহককে কবিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারে? কারণ তাঁর ভাষণ মাপাজোকা, তাঁর বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন, তাঁর পথ একেবারে সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত এবং সত্য, সততা, ন্যায় ও কল্যাণের দিকে আহবান করা ছাড়া তাঁর কণ্ঠ থেকে অন্য কোন কথাই বের হয়নি।

কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, কবিত্বের সাথে তাঁর প্রকৃতি ও মেজাজের আদৌ কোন সম্পর্কই নেই ঃ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ –

"আমি তাকে কবিতা শিখাইনি এবং এটা তার করার মতো কাজও নয়।"

(ইয়াসীন, ৬৯)

এটি এমন একটি সত্য ছিল, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন তাঁরা সবাই একথা জানতেন। নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ কোন একটি কবিতাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুরোপুরি মুখস্ত ছিল না। কথাবার্তার মাঝখানে কোন কবির ভালো কবিতার চরণ তাঁর মুখে এলেও তা অনুপযোগীভাবে পড়ে যেতেন অথবা তার মধ্যে শব্দের হেরফের হয়ে যেতো। হযরত হাসান বাসরী বলেন, একবার ভাষণের মাঝখানে তিনি এক কবির কবিতার চরণ এভাবে পড়লেন ঃ

كفى بالاسلام والشيب للمرء ناهيا –

হযরত আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! চরণটি হবে এ রকম,

كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا –

একবার তিনি আব্বাস ইবনে মিরদাস সুলামীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কবিতাটা কি তোমার ঃ

اَتَجْعَلُ نَهْبِى وَنَهْبَ الْعَبِيْدِ وَبَيْنَ الْاَقْرَعِ وَعَيَيْنَه –

আব্বাস বললেন, শেষ বাক্যাংশটি ওভাবে নয় বরং এভাবে হবে ঃ بين عيينة والاقرع একথায় রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কিন্তু অর্থ তো উভয়ের এক।

হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করা হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কখনো নিজের ভাষণের মধ্যে কবিতা ব্যবহার করতেন? তিনি বলেন, কবিতার চেয়ে বেশী তিনি কোন জিনিসকে ঘৃণা করতেন না। তবে কখনো কখনো তিনি বনী কায়েসের কবিতা পড়তেন। কিন্তু প্রথমটা শেষে এবং শেষেরটা প্রথম দিকে পড়ে ফেলতেন। হযরত আবু বকর (রা) বলতেন, হে আল্লাহর রসূল! এভাবে নয় বরং এভাবে। তখন তিনি বলতেন, "আমি কবি নই এবং কবিতা পাঠ করা আমার কাজ নয়।" আরবের কবিতা অংগনে যে ধরনের বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছিল তা ছিল যৌন আবেদন ও অবৈধ প্রেমচর্চা অথবা শরাব পান কিংবা গোত্রীয় ঘৃণা, বিদ্বেষ ও যুদ্ধবিগ্রহ বা বংশীয় ও বর্ণগত অহংকার। কল্যাণ ও সুকৃতির কথার স্থান সেখানে অতি অল্পই ছিল। এ ছাড়া মিথ্যা, অতিরঞ্জন, অপবাদ, নিন্দাবাদ, অযথা প্রশংসা, আত্মগর্ব, তিরস্কার, দোষারোপ, পরিহাস ও মুশরিকী অশ্লীল পৌরানিকতা তো এ কাব্যধারার শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল। তাই এ কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রায় ছিল ঃ

لَاَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا

"তোমাদের কারো পেট পুঁজে ভরা থাকা কবিতায় ভরা থাকার চেয়ে ভালো। তবুও যে কবিতায় কোন ভালো কথা থাকতো তিনি তার প্রশংসা করতেন। তাঁর উক্তি ছিল ঃ امن شعره وكفر قلبه "তার কবিতা মু'মিন কিন্তু অন্তর কাফের।" একবার একজন সাহাবী একশোটা ভালো ভালো কবিতা তাঁকে শুনান এবং তিনি বলে যেতে থাকলে বলেন ঃ هيه অর্থাৎ "আরো শুনাও।"

১৪৪. এটি হচ্ছে কবিদের আরেকটি বৈশিষ্ট। এটি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের কর্মধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। নবী (সা) সম্পর্কে তাঁর প্রত্যেক পরিচিত জন জানতেন, তিনি যা বলতেন তাই করতেন এবং যা করতেন তাই বলতেন। তাঁর কথা ও কর্মের সামঞ্জস্য এমনই একটি জাজ্বল্যমান সত্য ছিল যা তাঁর আশেপাশের সমাজের কেউ অস্বীকার করতে পারতো না। অথচ সাধারণ কবিদের সম্পর্কে সবাই জানতো যে, তারা বলতেন এক কথা এবং করতেন অন্য কিছু। তাদের কবিতায় দানশীলতার মাহাত্ম এমন উচ্চ কণ্ঠে প্রচারিত হবে যেন মনে হবে তাদের চেয়ে বড় আর কোন দাতা নেই। কিন্তু তাদের কাজ দেখলে বুঝা যাবে তারা বড়ই কৃপণ। বীরত্বের কথা তারা বলবেন কিন্তু নিজেরা হবেন কাপুরুষ। অমুখাপেক্ষিতা, অল্পে তুষ্টি ও আত্মমর্যাদাবোধ হবে তাদের কবিতার বিষয়বস্তু কিন্তু নিজেরা লোভ, লালসা ও আত্ম বিক্রয়ের শেষ সীমানাও পার হয়ে যাবেন। অন্যের সামান্যতম দুর্বলতাকেও কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন কিন্তু নিজেরা চরম দুর্বলতার মধ্যে হাবুডুবু খাবেন।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (٢٢٧)

তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে আর তাদের প্রতি জুলুম করা হলে শুধুমাত্র প্রতিশোধ নেয়।[১৪৫]— আর জুলুমকারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের পরিণাম কি।[১৪৬]

১৪৫. ওপরে সাধারণভাবে কবিদের প্রতি যে নিন্দাবাদ উচ্চারিত হয়েছে তা থেকে এমন সব কবিদেরকে এখানে আলাদা করা হয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে চারটি বৈশিষ্ট।

এক ঃ যারা মু'মিন অর্থাৎ আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবগুলো যারা মানেন এবং আখেরাত বিশ্বাস করেন।

দুই ঃ নিজেদের কর্মজীবনে যারা সৎ, যারা ফাসেক, দুষ্কৃতকারী ও বদকার নন। নৈতিকতার বাঁধন মুক্ত হয়ে যারা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দেন।

তিন ঃ আল্লাহকে যারা বেশী বেশী করে স্মরণ করেন নিজেদের সাধারণ অবস্থায়, সাধারণ সময়ে এবং নিজেদের রচনায়ও। তাদের ব্যক্তি জীবনে আল্লাহভীতি ও আল্লাহর আনুগত্য রয়েছে কিন্তু তাদের কবিতা পাপ-পংকিলতা, লালসা ও কামনা রসে পরিপূর্ণ, এমন যেন না হয়। আবার এমনও যেন না হয়, কবিতায় বড়ই প্রজ্ঞা ও গভীর তত্ত্বকথা আওড়ানো হচ্ছে কিন্তু ব্যক্তি জীবনে আল্লাহর স্মরণের কোন চিহ্নই নেই। আসলে এ দু'টি অবস্থা সমানভাবে নিন্দনীয়। তিনিই একজন পছন্দনীয় কবি যার ব্যক্তিজীবন যেমন আল্লাহর স্মরণে পরিপূর্ণ তেমনি নিজের সমগ্র কাব্য প্রতিভাও এমন পথে উৎসর্গীকৃত যা আল্লাহ থেকে গাফিল লোকদের নয় বরং যারা আল্লাহকে জানে, আল্লাহকে ভালোবাসে ও আল্লাহর আনুগত্য করে তাদের পথ।

চতুর্থ বৈশিষ্টটি বর্ণনা করা হয়েছে এমন সব ব্যতিক্রমধর্মী কবিদের যারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কারোর নিন্দা করে না এবং ব্যক্তিগত, বংশীয় বা গোত্রীয় বিদ্বেষে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বালায় না। কিন্তু যখন জালেমের মোকাবিলায় সত্যের প্রতি সমর্থন দানের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন তার কন্ঠকে সেই একই কাজে ব্যবহার করে যে কাজে একজন মুজাহিদ তার তীর ও তরবারিকে ব্যবহার করে। সবসময় আবেদন নিবেদন করতেই থাকা এবং বিনীতভাবে আর্জি পেশ করেই যাওয়া মু'মিনের রীতি নয়। এ সম্পর্কেই হাদীসে বলা হয়েছে, কাফের ও মুশরিক কবিরা ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযোগ, দোষারোপ ও অপবাদের যে তাণ্ডব সৃষ্টি করতো এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষের যে বিষ ছড়াতো তার জবাব দেবার জন্য নবী (সা) নিজে ইসলামী কবিদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন ও সাহস যোগাতেন। তাই তিনি কা'ব ইবনে মালেককে (রা) বলেন ঃ

اهْجُهُمْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبْلِ –

"ওদের নিন্দা করো, কারণ সেই আল্লাহর কসম, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ আবদ্ধ, তোমার কবিতা ওদের জন্য তীরের চেয়েও বেশী তীক্ষ্ণ ও ধারালো।"

হযরত হাস্সান ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন ঃ

اهجهم وجبريل معك এবং قل وروح القدس معك

"তাদের মিথ্যাচারের জবাব দাও এবং জিব্রীল তোমার সঙ্গে আছে।" এবং "বলো এবং পবিত্র আত্মা তোমার সংগে আছে।"

তাঁর উক্তি ছিল ঃ

ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه –

"মু'মিন তলোয়ার দিয়েও লড়াই করে এবং কণ্ঠ দিয়েও।"

১৪৬. জুলুমকারী বলতে এখানে এমনসব লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে যারা সত্যকে খাটো ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সম্পূর্ণ হঠকারিতার পথ অবলম্বন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কবি, গণক, যাদুকর ও পাগল হবার অপবাদ দিয়ে বেড়াতো। এ ধরনের অপবাদ দেবার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যারা তাঁর সম্পর্কে জানে না তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে তাদের মনে কু–ধারণা সৃষ্টি করা এবং তাঁর শিক্ষার প্রতি যাতে তারা আকৃষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা করা।

আন নাম্‌ল

২৭

নামকরণ

দ্বিতীয় রুকূ'র চতুর্থ আয়াতে وادِ النمل –এর কথা বলা হয়েছে। সূরার নাম এখান থেকেই গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এমন সূরা যাতে নাম্‌ল এর কথা বলা হয়েছে। অথবা যার মধ্যে নাম্‌ল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগীর দিক দিয়ে এ সূরা মক্কার মধ্যযুগের সূরাগুলোর সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে। হাদীস থেকেও এর সমর্থন মেলে। ইবনে আব্বাস (রা) ও জাবের ইবনে যায়েদের (রা) বর্ণনা হচ্ছে, "প্রথমে নাযিল হয় সূরা আশ্ শু'আরা তারপর আন নাম্‌ল এবং তারপর আল কাসাস।"

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় দু'টি ভাষণ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম ভাষণটি শুরু হয়েছে সূরার সূচনা থেকে চতুর্থ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় ভাষণটি পঞ্চম রুকূ'র শুরু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম ভাষণটিতে বলা হয়েছে, কুরআনের প্রথম নির্দেশনা থেকে একমাত্র তারাই লাভবান হতে পারে এবং তার সুসংবাদসমূহ লাভের যোগ্যতা একমাত্র তারাই অর্জন করতে পারে যারা এ কিতাব যে সত্যসমূহ উপস্থাপন করে সেগুলোকে এ বিশ্ব–জাহানের মৌলিক সত্য হিসেবে স্বীকার করে নেয়। তারপর এগুলো মেনে নিয়ে নিজেদের বাস্তব জীবনেও আনুগত্য ও অনুসরণের নীতি অবলম্বন করে। কিন্তু এ পথে আসার ও চলার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে আখেরাত অস্বীকৃতি। কারণ এটি মানুষকে দায়িত্বহীন, প্রবৃত্তির দাস ও দুনিয়াবী জীবনের প্রেমে পাগল করে তোলে। এরপর মানুষের পক্ষে আল্লাহর সামনে নত হওয়া এবং নিজের প্রবৃত্তির কামনার ওপর নৈতিকতার বাঁধন মেনে নেয়া আর সম্ভব থাকে না। এ ভূমিকার পর তিন ধরনের চারিত্রিক আদর্শ পেশ করা হয়েছে।

একটি আদর্শ ফেরাউন, সামূদ জাতির সরদারবৃন্দ ও লূতের জাতির বিদ্রোহীদের। তাদের চরিত্র গঠিত হয়েছিল পরকাল চিন্তা থেকে বেপরোয়া মনোভাব এবং এর ফলে সৃষ্ট প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে। তারা কোন নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়নি।

পক্ষান্তরে যারা তাদেরকে কল্যাণ ও সুকৃতির প্রতি আহবান জানিয়েছে তাদেরই তারা শত্রু হয়ে গেছে। যেসব অসৎকাজের জঘন্যতা ও কদর্যতা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে প্রচ্ছন্ন নয় সেগুলোকেও তারা আকড়ে ধরেছে। আল্লাহর আযাবে পাকড়াও হবার এক মুহূর্ত আগেও তাদের চেতনা হয়নি।

দ্বিতীয় আদর্শটি হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের। আল্লাহ তাঁকে অর্থ–সম্পদ, রাষ্ট্র–ক্ষমতা, পরাক্রম, মর্যাদা ও গৌরব এত বেশী দান করেছিলেন যে মক্কার কাফেররা তার কল্পনাও করতে পারতো না। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও যেহেতু তিনি আল্লাহর সামনে নিজকে জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করতেন এবং তাঁর মধ্যে এ অনুভূতিও ছিল যে, তিনি যা কিছুই লাভ করেছেন সবই আল্লাহর দান তাই তাঁর মাথা সবসময় প্রকৃত নিয়ামত দানকারীর সামনে নত হয়ে থাকতো এবং আত্ম অহমিকার সামান্যতম গন্ধও তাঁর চরিত্র ও কার্যকলাপে পাওয়া যেতো না।

তৃতীয় আদর্শ সাবার রানীর। তিনি ছিলেন আরবের ইতিহাসের বিপুল খ্যাতিমান ধনাঢ্য জাতির শাসক। একজন মানুষকে অহংকার মদমত্ত করার জন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন তা সবই তাঁর ছিল। যেসব জিনিসের জোরে একজন মানুষ আত্মম্ভরী হতে পারে তা কুরাইশ সরদারদের তুলনায় হাজার লক্ষগুণ বেশী তাঁর আয়ত্বাধীন ছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন একটি মুশরিক জাতির অন্তরভুক্ত। পিতৃপুরুষের অনুসরণের জন্যও এবং নিজের জাতির মধ্যে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যেও তাঁর পক্ষে শিরক ত্যাগ করে তাওহীদের পথ অবলম্বন করা সাধারণ একজন মুশরিকের জন্য যতটা কঠিন হতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন ছিল। কিন্তু যখনই তাঁর সামনে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে তখনই তিনি সত্যকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এ পথে কেউ বাধা দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। কারণ তাঁর মধ্যে যে ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি ছিল নিছক একটি মুশরিকী পরিবেশে চোখ মেলার ফলেই তা সৃষ্টি হয়েছিল। প্রবৃত্তির উপাসনা ও কামনার দাসত্ব করার রোগ তাঁকে পেয়ে বসেনি। তাঁর বিবেক আল্লাহর সামনে জবাবদিহির অনুভূতি শূন্য ছিল না।

দ্বিতীয় ভাষণে প্রথমে বিশ্ব–জাহানের কয়েকটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য সত্যের প্রতি ইংগিত করে মক্কার কাফেরদেরকে একের পর এক প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ বলো, যে শিরকে তোমরা লিপ্ত হয়েছো এ সত্যগুলো কি তার সাক্ষ দেয় অথবা এ কুরআনে যে তাওহীদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তার সাক্ষ দেয়? এরপর কাফেরদের আসল রোগের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে জিনিসটি তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে, যে কারণে তারা সবকিছু দেখেও কিছুই দেখে না এবং সবকিছু শুনেও কিছুই শোনে না সেটি হচ্ছে আসলে আখেরাত অস্বীকৃতি। এ জিনিসটিই তাদের জন্য জীবনের কোন বিষয়েই কোন গভীরতা ও গুরুত্বের অবকাশ রাখেনি। কারণ তাদের মতে শেষ পর্যন্ত সবকিছুই যখন ধ্বংস হয়ে মাটিতে মিশে যাবে এবং দুনিয়ার জীবনের এসব সংগ্রাম-সাধনার কোন ফলাফল প্রকাশ পাবে না তখন মানুষের জন্য সত্য ও মিথ্যা সব সমান। তার জীবন ব্যবস্থা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত না অসত্যের ওপর, এ প্রশ্নের মধ্যে তার জন্য আদতে কোন গুরুত্বই থাকে না।

কিন্তু আসলে এ আলোচনার উদ্দেশ্য হতাশা নয়। অর্থাৎ তারা যখন গাফিলতির মধ্যে ডুবে আছে তখন তাদেরকে দাওয়াত দেয়া নিষ্ফল, এরূপ মনোভাব সৃষ্টি এ আলোচনার

উদ্দেশ্য নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে নিদ্রিতদেরকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগানো। তাই ষষ্ঠ ও সপ্তম রুকূ'তে একের পর এক এমন সব কথা বলা হয়েছে যা লোকদের মধ্যে আখেরাতের চেতনা জাগ্রত করে, তার প্রতি অবহেলা ও গাফিলতি দেখানোর ফলাফল সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে এবং তার আগমনের ব্যাপারে তাদেরকে এমনভাবে নিশ্চিত করে যেমন এক ব্যক্তি নিজের চোখে দেখা ঘটনা সম্পর্কে যে তা চোখে দেখেনি তাকে নিশ্চিত করে।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে কুরআনের আসল দাওয়াত অর্থাৎ এক আল্লাহর বন্দেগীর দাওয়াত অতি সংক্ষেপে কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী ভংগীতে পেশ করে লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ দাওয়াত গ্রহণ করলে তোমাদের নিজেদের লাভ এবং একে প্রত্যাখ্যান করলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে। একে মেনে নেবার জন্য যদি আল্লাহর এমন সব নিদর্শনের অপেক্ষা করতে থাকো যেগুলো এসে যাবার পর আর না মেনে কোন গত্যন্তর থাকবে না, তাহলে মনে রেখো সেটি চূড়ান্ত মীমাংসার সময়। সে সময় মেনে নিলে কোন লাভই হবে না।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ① هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ② الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ③ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ④

ত্বা–সীন। এগুলো কুরআনের ও এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত[১], পথনির্দেশ ও সুসংবাদ[২] এমন মুমিনদের জন্য যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়[৩] এবং তারা এমন লোক যারা আখেরাতে পুরোপুরি বিশ্বাস করে[৪] আসলে যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তাদের জন্য আমি তাদের কৃতকর্মকে সুদৃশ্য করে দিয়েছি, ফলে তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।[৫]

১. "সুস্পষ্ট কিতাবের" একটি অর্থ হচ্ছে, এ কিতাবটি নিজের শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশগুলোর একেবারে দ্ব্যর্থহীন পদ্ধতিতে বর্ণনা করে দেয়। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এটি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে তুলে ধরে। আর এর তৃতীয় একটি অর্থ এই হয় যে, এটি যে আল্লাহর কিতাব সে ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। যে ব্যক্তি চোখ খুলে এ বইটি পড়বে, এটি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের তৈরী করা কথা নয় তা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

২. অর্থাৎ এ আয়াতগুলো হচ্ছে পথনির্দেশ ও সুসংবাদ। "পথনির্দেশকারী" ও "সুসংবাদদানকারী" বলার পরিবর্তে এগুলোকেই বলা হয়েছে "পথনির্দেশ" ও "সুসংবাদ" এর মাধ্যমে পথনির্দেশনা ও সুসংবাদ দানের গুণের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণতার প্রকাশই কাম্য। যেমন কাউকে দাতা বলার পরিবর্তে 'দানশীলতার প্রতিমূর্তি' এবং সুন্দর বলার পরিবর্তে 'আপাদমস্তক সৌন্দর্য' বলা।

৩. অর্থাৎ কুরআন মজীদের এ আয়াতগুলো কেবলমাত্র এমনসব লোকদেরই পথ–নির্দেশনা দেয় এবং শুভ পরিণামের সুসংবাদও একমাত্র এমনসব লোকদের দান করে যাদের মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট ও গুণাবলী পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে, তারা ঈমান আনে। ঈমান

আনার অর্থ হচ্ছে তারা কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করে। এক আল্লাহকে নিজেদের একমাত্র উপাস্য ও রব বলে মেনে নেয়। কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে স্বীকার করে নেয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নবী বলে মেনে নিয়ে নিজেদের নেতা রূপে গ্রহণ করে। এ সংগে এ বিশ্বাসও পোষণ করে যে, এ জীবনের পর দ্বিতীয় আর একটি জীবন আছে, সেখানে আমাদের নিজেদের কাজের হিসেব দিতে এবং প্রত্যেকটি কাজের প্রতিদান লাভ করতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তারা এ বিষয়গুলো কেবলমাত্র মেনে নিয়েই বসে থাকে না বরং কার্যত এগুলোর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এ উদ্বুদ্ধ হবার প্রথম আলামত হচ্ছে এই যে, তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। এ দু'টি শর্ত যারা পূর্ণ করবে কুরআন মজীদের আয়াত তাদেরকেই দুনিয়ায় সত্য সরল পথের সন্ধান দেবে। এ পথের প্রতিটি পর্যায়ে তাদেরকে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে। তার প্রত্যেকটি চৌমাথায় তাদেরকে ভুল পথের দিকে অগ্রসর হবার হাত থেকে রক্ষা করবে। তাদেরকে এ নিশ্চয়তা দান করবে যে, সত্য–সঠিক পথ অবলম্বন করার ফল দুনিয়ায় যাই হোক না কেন শেষ পর্যন্ত তারই বদৌলতে চিরন্তন সফলতা তারাই অর্জন করবে এবং তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সৌভাগ্য লাভে সক্ষম হবে। এটা ঠিক তেমনি একটি ব্যাপার যেমন একজন শিক্ষকের শিক্ষা থেকে কেবলমাত্র এমন এক ব্যক্তি লাভবান হতে পারে যে তার প্রতি আস্থা স্থাপন করে যথার্থই তার ছাত্রত্ব গ্রহণ করে নেয় এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজও করতে থাকে। একজন ডাক্তার থেকে উপকৃত হতে পারে একমাত্র এমনই একজন রোগী যে তাকে নিজের চিকিৎসক হিসেবে গ্রহণ করে এবং ঔষধপত্র ও পথ্যাদির ব্যাপারে তার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কাজ করে। একমাত্র এ অবস্থায়ই একজন শিক্ষক ও ডাক্তার মানুষকে তার কাংখিত ফলাফল লাভ করার নিশ্চয়তা দান করতে পারে।

কেউ কেউ এ আয়াতে يُـؤْتُـوْنَ الزَّكٰوةَ বাক্যাংশের অর্থ গ্রহণ করেছেন, যারা চারিত্রিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে। কিন্তু কুরআন মজীদে নামায কায়েম করার সাথে যাকাত আদায় করার শব্দ যেখানেই ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই এর অর্থ হয়েছে যাকাত দান করা। নামাযের সাথে এটি ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। এ ছাড়াও যাকাতের জন্য ايتاء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি সম্পদের যাকাত দান করার সুনির্দিষ্ট অর্থ ব্যক্ত করে। কারণ আরবী ভাষায় পবিত্রতা অর্জন করার ক্ষেত্রে تزكى শব্দ বলা হয়ে থাকে, ايتاء زكوة বলা হয় না। আসলে এখানে যে কথাটি মনে বদ্ধমূল করে দেয়া উদ্দেশ্য সেটি হচ্ছে এই যে, কুরআনের পথনির্দেশনা থেকে লাভবান হবার জন্য ঈমানের সাথে কার্যত আনুগত্য ও অনুসরণের নীতি অবলম্বন করাও জরুরী। আর মানুষ যথার্থই আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করেছে কিনা নামায কায়েম ও যাকাত দান করাই হচ্ছে তা প্রকাশ করার প্রথম আলামত। এ আলামত যেখানেই অদৃশ্য হয়ে যায় সেখানেই বুঝা যায় যে, মানুষ বিদ্রোহী হয়ে গেছে, শাসককে সে শাসক বলে মেনে নিলেও তার হুকুম মেনে চলতে রাজী নয়।

৪. যদিও আখেরাত বিশ্বাস ঈমানের অংগ এবং এ কারণে মু'মিন বলতে এমনসব লোক বুঝায় যারা তাওহীদ ও রিসালাতের সাথে সাথে আখেরাতের প্রতিও ঈমান আনে

কিন্তু এটি আপনা আপনি ঈমানের অন্তরভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এ বিশ্বাসটির গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য বিশেষ জোর দিয়ে একে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদের জন্য এ কুরআন উপস্থাপিত পথে চলা বরং এর ওপর পা রাখাও সম্ভব নয়। কারণ এ ধরনের চিন্তাধারা যারা পোষণ করে তারা স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের ভালমন্দের মানদণ্ড কেবলমাত্র এমন সব ফলাফলের মাধ্যমে নির্ধারিত করে থাকে যা এ দুনিয়ায় প্রকাশিত হয় বা হতে পারে। তাদের জন্য এমন কোন পথনির্দেশনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না যা পরকালের পরিণাম ফলকে লাভ–ক্ষতির মানদণ্ড গণ্য করে ভালো ও মন্দ নির্ধারণ করে। এ ধরনের লোকেরা প্রথমত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের শিক্ষায় কর্ণপাত করে না। কিন্তু যদি কোন কারণে তারা মুমিন দলের মধ্যে শামিল হয়েও যায় তাহলে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস না থাকার ফলে তাদের জন্য ঈমান ও ইসলামের পথে এক পা চলাও কঠিন হয়। এ পথে প্রথম পরীক্ষাটিই যখন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ইহকালীন লাভ ও পরকালীন ক্ষতির দাবী তাদেরকে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দিকে টানতে থাকবে তখন মুখে যতই ঈমানের দাবী করতে থাকুক না কেন নিসংকোচে তারা ইহকালীন লাভের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং পরকালীন ক্ষতির সামান্যতমও পরোয়া করবে না।

৫. অর্থাৎ এটি আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম আর মানবিক মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক যুক্তিবাদিতাও একথাই বলে যে, যখন মানুষ জীবন এবং তার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফলাফলকে কেবলমাত্র এ দুনিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করবে, যখন সে এমন কোন আদালত স্বীকার করবে না যেখানে মানুষের সারা জীবনের সমস্ত কাজ যাচাই–পর্যালোচনা করে তার দোষ–গুণের শেষ ও চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে, এবং যখন সে মৃত্যুর পরে এমন কোন জীবনের কথা স্বীকার করবে না যেখানে দুনিয়ার জীবনের কর্মকাণ্ডের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা অনুযায়ী যথাযথ পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে তখন অনিবার্যভাবে তার মধ্যে একটি বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগী বিকাশ লাভ করবে। তার কাছে সত্য ও মিথ্যা, শিরক ও তাওহীদ, পাপ ও পুণ্য এবং সচ্চরিত্র ও অসচ্চরিত্রের যাবতীয় আলোচনা একেবারেই অর্থহীন মনে হবে। এ দুনিয়ায় যা কিছু তাকে ভোগ, আয়েশ–আরাম, বস্তুগত উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং শক্তি ও কর্তৃত্ব দান করবে, তা কোন জীবন দর্শন, জীবন পদ্ধতি ও নৈতিক ব্যবস্থা হোক না কেন, তার কাছে তাই হবে কল্যাণকর। প্রকৃত তত্ব ও সত্যের ব্যাপারে তার কোন মাথাব্যথা থাকবে না। তার মৌল আকাংখা হবে কেবলমাত্র দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও সাফল্য। এগুলো অর্জন করার চিন্তা তাকে সকল পথে বিপথে টেনে নিয়ে যাবে। এ উদ্দেশ্যে সে যা কিছুই করবে তাকে নিজের দৃষ্টিতে মনে করবে বড়ই কল্যাণকর এবং যারা এ ধরনের বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধারে ডুব দেয়নি এবং চারিত্রিক সততা ও অসততা থেকে বেপরোয়া হয়ে স্বেচ্ছাচারীর মত কাজ করে যেতে পারেনি তাদেরকে সে নির্বোধ মনে করবে।

কারো অসৎকার্যাবলীকে তার জন্য শোভন বানিয়ে দেবার এ কাজকে কুরআন মজীদে কখনো আল্লাহর কাজ আবার কখনো শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। যখন বলা হয় যে, অসৎকাজগুলোকে আল্লাহ শোভন করে দেন তখন তার অর্থ হয়, যে ব্যক্তি এ দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করে তার কাছে স্বভাবতই জীবনের এ সমতল পথই সুদৃশ্য অনুভূত হতে থাকে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾

এদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি[৬] এবং আখেরাতে এরাই হবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। আর (হে মুহাম্মাদ) নিসন্দেহে তুমি এ কুরআন লাভ করছো এক প্রাজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে।[৭]

(তাদেরকে সেই সময়ের কথা শুনাও) যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বললো[৮] "আমি আগুনের মতো একটা বস্তু দেখেছি। এখনি আমি সেখান থেকে কোন খবর আনবো অথবা খুঁজে আনবো কোন অংগার, যাতে তোমরা উষ্ণতা লাভ করতে পারো।"[৯] সেখানে পৌঁছুবার পর আওয়াজ এলো[১০] "ধন্য সেই সত্তা যে এ আগুনের মধ্যে এবং এর চারপাশে রয়েছে, পাক–পবিত্র আল্লাহ সকল বিশ্ববাসীর প্রতিপালক।[১১]

আর যখন বলা হয় যে, শয়তান ওগুলোকে সুদৃশ্য করে দেয়। তখন এর অর্থ হয়, এ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বনকারী ব্যক্তির সামনে শয়তান সবসময় একটি কাল্পনিক জান্নাত পেশ করতে থাকে এবং তাকে এই বলে ভালোভাবে আশ্বাস দিতে থাকে, শাবাশ! বেটা খুব চমৎকার কাজ করছ।

৬. এ নিকৃষ্ট শাস্তিটি কিভাবে, কখন ও কোথায় হবে। তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। কারণ এ দুনিয়া ও বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও জাতি নানাভাবে এ শাস্তি লাভ করে থাকে। এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সময় একেবারে মৃত্যুর দ্বারদেশেও জালেমরা এর একটি অংশ লাভ করে। মৃত্যুর পরে "আলমে বরযখে"ও (মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পূর্ববর্তী সময়) মানুষ এর মুখোমুখি হয়। আর তারপর হাশরের ময়দানে এর একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে এবং তারপর এক জায়গায় গিয়ে তা আর কোনদিন শেষ হবে না।

৭. অর্থাৎ এ কুরআনে যেসব কথা বলা হচ্ছে এগুলো কোন উড়ো কথা নয়। এগুলো কোন মানুষের আন্দাজ অনুমান ও মতামত ভিত্তিকও নয়। বরং এক জ্ঞানবান প্রাজ্ঞ সত্তা এগুলো নাযিল করছেন। তিনি নিজের সৃষ্টির প্রয়োজন ও কল্যাণ এবং তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে পুরোপুরি জানেন। বান্দাদের সংশোধন ও পথনির্দেশনার জন্য তাঁর জ্ঞান সর্বোত্তম কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

৮. এটা তখনকার ঘটনা যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মাদ্‌য়ানে আট দশ বছর অবস্থান করার পর নিজের পরিবারপরিজন নিয়ে কোন বাসস্থানের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। মাদ্‌য়ান এলাকাটি অবস্থিত ছিল আকাবা উপসাগরের তীরে আরব ও সিনাই উপদ্বীপের উপকূলে (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ্ শু'আরা, ১১৫ টীকা)। সেখান থেকে যাত্রা করে হযরত মূসা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশে পৌছেন। এ অংশের যে স্থানটিতে তিনি পৌছেন বর্তমানে তাকে সিনাই পাহাড় ও মূসা পর্বত বলা হয়। কুরআন নাযিলের সময় এটি তূর নামে পরিচিত ছিল। এখানে যে ঘটনাটির কথা বলা হয়েছে সেটি এরি পাদদেশে সংঘটিত হয়েছিল।

এখানে যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে সূরা "ত্বা-হা"-এর প্রথম রুকূতে উল্লেখিত হয়েছে এবং সামনের দিকে সূরা কাসাসেও (চতুর্থ রুকূ') আসছে।

৯. আলোচনার প্রেক্ষাপট থেকে মনে হয় যে, এটা ছিল শীতকালের একটি রাত। হযরত মূসা একটি অপরিচিত এলাকা অতিক্রম করছিলেন। এ এলাকার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ জানাশোনা ছিল না। তাই তিনি নিজের পরিবারের লোকদের বললেন, আমি সামনের দিকে গিয়ে একটু জেনে আসি আগুন জ্বলছে কোন্ জনপদে, সামনের দিকে পথ কোথায় কোথায় গিয়েছে এবং কাছাকাছি কোন্ কোন্ জনপদ আছে। তবুও যদি দেখা যায়, ওরাও আমাদেরই মতো চলমান মুসাফির, যাদের কাছ থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করা যাবে না, তাহলেও অন্ততপক্ষে ওদের কাছ থেকে কিছু অংগার তো আনা যাবে। এ থেকে আগুন জ্বালিয়ে তোমরা উত্তাপ লাভ করতে পারবে।

হযরত মূসা (আ) যেখানে কুঞ্জবনের মধ্যে আগুন লেগেছে বলে দেখেছিলেন সে স্থানটি তূর পাহাড়ের পাদদেশে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট ওপরে অবস্থিত। রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম খৃষ্টান বাদশাহ কনষ্টানটাইন ৩৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঠিক যে জায়গায় এ ঘটনাটি ঘটেছিল সেখানে একটি গীর্জা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এর দু'শো বছর পরে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান এখানে একটি আশ্রম (Monastery) নির্মাণ করেন। কনষ্টান্টাইনের গীর্জাকেও এর অন্তরভুক্ত করা হয়। এ আশ্রম ও গীর্জা আজো অক্ষুন্ন রয়েছে। এটি গ্রীক খৃষ্টীয় গীর্জার (Greek Orthodox Church) পাদ্রী সমাজের দখলে রয়েছে। আমি ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে এ জায়গাটি দেখি। পাশের পাতায় এ জায়গার কিছু ছবি দেয়া হলো।

১০. সূরা কাসাসে বলা হয়েছে, আওয়াজ আসছিল একটি বৃক্ষ থেকে : فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ এ থেকে ঘটনাটির যে দৃশ্য সামনে ভেসে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, উপত্যাকার এক কিনারে আগুনের মতো লেগে গিয়েছিল কিন্তু কিছু জ্বলছিল না এবং ধোঁয়াও উড়ছিল না। আর এ আগুনের মধ্যে একটি সবুজ শ্যামল গাছ দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে সহসা এ আওয়াজ আসতে থাকে।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সাথে এ ধরনের অদ্ভূত ব্যাপার ঘটা চিরাচরিত ব্যাপার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রথম বার নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন তখন হেরা গিরিগূহায় একান্ত নির্জনে সহসা একজন ফেরেশতা আসেন। তিনি তাঁর কাছে
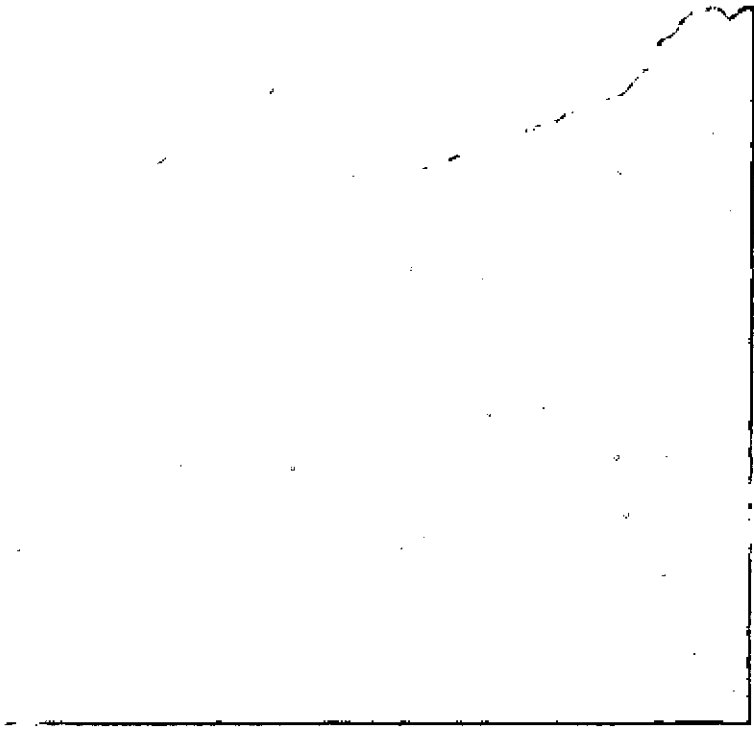
তূর পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সেন্ট ক্যাথারাইন গীর্জা
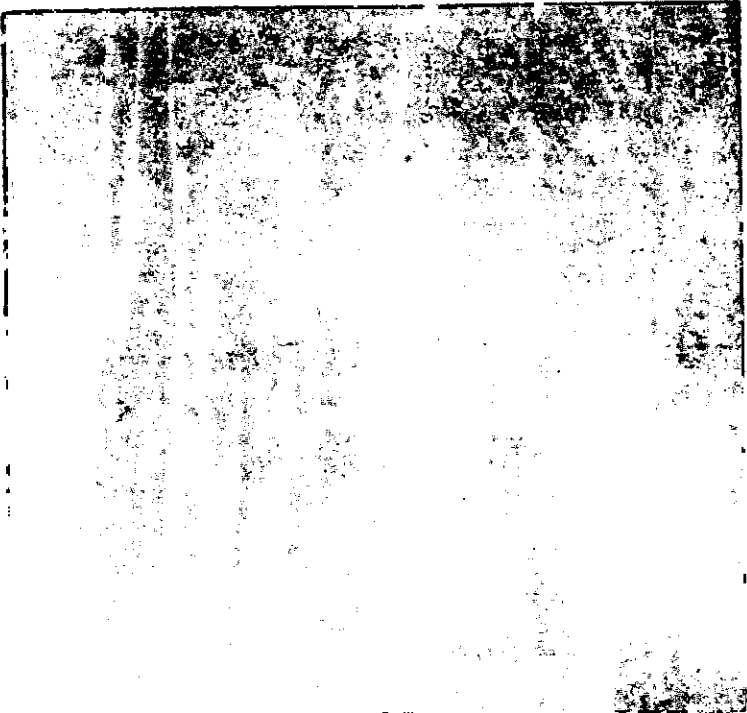
তূর পাহাড়ে সেন্ট ক্যাথারাইন গীর্জা যেখানে হযরত মূসা (আ) বৃক্ষকুঞ্জে প্রজ্জ্বলিত আগুন দেখেছিলেন
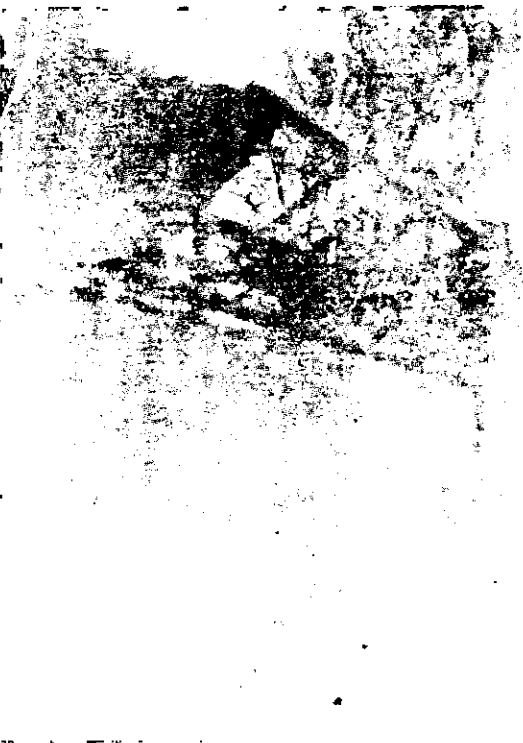
স্থানীয় বর্ণনানুসারে এ বৃক্ষের ওপর হতে হযরত মূসা (আ) আল্লাহর বাণী শুনেছেন। যুগ যুগ ধরে এ বৃক্ষের সবুজতার কথা বংশ পরম্পরায় গীর্জায় চলে আসছে

يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ ﴿٩﴾ وَاَلْقِ عَصَاكَ ۗ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ
كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۗ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۗ اِنِّيْ
لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٠﴾ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ
سُوْٓءٍ فَاِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١﴾ وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ
مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۗ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا
قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿١٢﴾

হে মূসা! এ আর কিছু নয়, স্বয়ং আমি আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী এবং তুমি তোমার লাঠিটি একটু ছুঁড়ে দাও।" যখনই মূসা দেখলো লাঠি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে[১২] তখনই পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো এবং পেছন দিকে ফিরেও দেখলো না। "হে মূসা! ভয় পেয়ো না, আমার সামনে রসূলরা ভয় পায় না।[১৩] তবে হ্যাঁ, যদি কেউ ভুল-ত্রুটি করে বসে।[১৪] তারপর যদি সে দুষ্কৃতির পরে সুকৃতি দিয়ে (নিজের কাজ) পরিবর্তিত করে নেয় তাহলে আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১৫] আর তোমার হাতটি একটু তোমার বক্ষস্থলের মধ্যে ঢুকাও তো, তা উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে কোন প্রকার ক্ষতি ছাড়াই। এ (দু'টি নিদর্শন) ন'টি নিদর্শনের অন্তরভুক্ত ফেরাউন ও তার জাতির কাছে (নিয়ে যাবার জন্য)[১৬] তারা বড়ই বদকার।"

আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে থাকেন। হযরত মূসার ব্যাপারেও একই ঘটনা ঘটে। এক ব্যক্তি সফরকালে এক জায়গায় অবস্থান করছেন। দূর থেকে আগুন দেখে পথের সন্ধান নিতে বা আগুন সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে আসেন। অকস্মাত সকল প্রকার আন্দাজ অনুমানের উর্ধে অবস্থানকারী স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে সম্বোধন করেন। এসব সময় আসলে এমন একটি অস্বাভাবিক অবস্থা বাইরেও এবং নবীগণের মনের মধ্যেও বিরাজমান থাকে যার ভিত্তিতে তাঁদের মনে এরূপ প্রত্যয় জন্মে যে, এটা কোন জিন বা শয়তানের কারসাজী অথবা তাদের নিজেদের কোন মানসিক ভাবান্তর নয় কিংবা তাঁদের ইন্দিয়ানুভূতিও কোন প্রকার প্রতারিত হচ্ছে না বরং প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভু অথবা তাঁর ফেরেশ্‌তাই তাঁদের সাথে কথা বলছেন। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নাজম, ১০ টীকা)

১১. এ অবস্থায় "পাক-পবিত্র আল্লাহ" বলার মাধ্যমে আসলে হযরত মূসাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে যে, বিভ্রান্ত চিন্তা ও বিশ্বাস থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়েই এ

ঘটনাটি ঘটছে। অর্থাৎ এমন নয় যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ গাছের ওপর বসে আছেন অথবা এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এসেছেন কিংবা তাঁর একচ্ছত্র নূর তোমাদের দৃষ্টিসীমায় বাঁধা পড়েছে বা কারো মুখে প্রবিষ্ট কোন জিহবা নড়াচড়া করে এখানে কথা বলছে। বরং এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন থেকে সেই সত্তা নিজেই তোমার সাথে কথা বলছেন।

১২. সূরা আ'রাফ ও সূরা শু'আরাতে এ জন্য ثُعْبَانٌ (অজগর) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এখানে একে جَانٌّ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। "জান" শব্দটি বলা হয় ছোট সাপ অর্থে। এখানে "জান" শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, দৈহিক দিক দিয়ে সাপটি ছিল অজগর কিন্তু তার চলার দ্রুততা ছিল ছোট সাপদের মতো। সূরা তা-হা-য় حَيَّةٌ تَسْعٰى (ছুটন্ত সাপ) এর মধ্যেও এ অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে।

১৩. অর্থাৎ আমার কাছে রসূলদের ক্ষতি হবার কোন ভয় নেই। রিসালাতের মহান মর্যাদায় অভিসিক্ত করার জন্য যখন আমি কাউকে নিজের কাছে ডেকে আনি তখন আমি নিজেই তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে থাকি। তাই যে কোন প্রকার অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলেও রসূলকে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত থাকা উচিত। আমি তার জন্য কোন প্রকার ক্ষতিকারক হবো না।

১৪. আরবী ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে এ বাক্যাংশের দু'রকম অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ হলো, ভয়ের কোন যুক্তিসংগত কারণ যদি থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই যে, রসূল কোন ভুল করেছেন। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, যতক্ষণ কেউ ভুল না করে ততক্ষণ আমার কাছে তার কোন ভয় নেই।

১৫. অর্থাৎ অপরাধকারীও যদি তাওবা করে নিজের নীতি সংশোধন করে নেয় এবং খারাপ কাজের জায়গায় ভালো কাজ করতে থাকে, তাহলে আমার কাছে তার জন্য উপেক্ষা ও ক্ষমা করার দরজা খোলাই আছে। প্রসংগক্রমে একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল একদিকে সতর্ক করা এবং অন্যদিকে সুসংবাদ দেয়াও। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অজ্ঞতাবশত একজন কিবতীকে হত্যা করে মিসর থেকে বের হয়েছিলেন। এটি ছিল একটি ত্রুটি। এদিকে সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়। এ ত্রুটিটি যখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল তখন তিনি পরক্ষণেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এই বলে :

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ

"হে আমার রব! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমাকে মাফ করে দাও।"

আল্লাহ সংগে সংগেই তাঁকে মাফ করে দিয়েছিলেন : فَغَفَرَلَهٗ আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দিলেন। (আল কাসাস, ১৬) এখানে সেই ক্ষমার সুসংবাদ তাঁকে দেয়া হয়। অর্থাৎ এ ভাষণের মর্ম যেন এই দাঁড়ালো : হে মূসা ! আমার সামনে তোমার ভয় পাওয়ার একটি কারণ তো অবশ্যই ছিল। কারণ তুমি একটি ভুল করেছিলে। কিন্তু তুমি যখন সেই দুষ্কৃতিকে সুকৃতিতে পরিবর্তিত করেছো তখন আমার কাছে তোমার জন্য আর মাগফিরাত ও রহমত ছাড়া আর কিছুই নেই। এখন আমি তোমাকে কোন শাস্তি দেবার জন্য ডেকে পাঠাইনি বরং বড় বড় মু'জিযা সহকারে তোমাকে এখন আমি একটি মহান দায়িত্ব সম্পাদনে পাঠাবো।

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑬ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ⑭

কিন্তু যখন আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে এসে গেলো তখন তারা বলল, এতো সুস্পষ্ট যাদু। তারা একেবারেই অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্যের সাথে সেই নিদর্শনগুলো অস্বীকার করলো অথচ তাদের মন মগজ সেগুলোর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল।[১৭] *এখন এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল দেখে নাও।*

১৬. সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে মূসাকে আমি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় এমন ধরনের নয়টি নিদর্শন (تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ) দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। সূরা আ'রাফে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ (১) লাঠি, যা অজগর হয়ে যেতো (২) হাত, যা বগলে রেখে বের করে আনলে সূর্যের মতো ঝিকমিক করতো। (৩) যাদুকরদের প্রকাশ্য জনসমক্ষে পরাজিত করা (৪) হযরত মূসার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সারা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়া। (৫) বন্যা ও ঝড় (৬) পংগপাল (৭) সমস্ত শস্য গুদামে শস্যকীট এবং মানুষ–পশু নির্বেশেষে সবার গায়ে উকুন। (৮) ব্যাংয়ের আধিক্য (৯) রক্ত। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আয্ যুখরুফ, ৪৩ টীকা)

১৭. কুরআনের অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে যে. যখন মূসা আলাইহিস সালামের ঘোষণা অনুযায়ী মিসরের ওপর কোন সাধারণ বালা–মুসীবত নাযিল হতো তখন ফেরাউন হযরত মূসাকে বলতো, আপনার আল্লাহর কাছে দোয়া করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন তারপর আপনি যা বলবেন তা মেনে নেবো। কিন্তু যখন সে বিপদ সরে যেতো তখন ফেরাউন আবার তার আগের হঠকারিতায় ফিরে যেতো। (সূরা আরাফ, ১৩৪ এবং আয্ যুখরুফ, ৪৯–৫০ আয়াত) বাইবেলেও এ আলোচনা এসেছে (যাত্রা পুস্তক ৮ থেকে ১০ অধ্যায়) তাছাড়া এমনিতেও একটি দেশের সমগ্র এলাকা দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও ঘূর্ণি কবলিত হওয়া, সারা দেশের ওপর পংগপাল ঝাঁপিয়ে পড়া এবং ব্যাং ও শস্যকীটের আক্রমণ কোন যাদুকরের তেলসমাতি হতে পারে বলে কোনক্রমেই ধারণা করা যেতে পারে না। এগুলো এমন প্রকাশ্য মু'জিযা ছিল যেগুলো দেখে একজন নিরেট বোকাও বুঝতে পারতো যে, নবীর কথায় এ ধরনের দেশ ব্যাপী বালা–মুসীবতের আগমন এবং আবার তাঁর কথায় তাদের চলে যাওয়া একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনেরই হস্তক্ষেপের ফল হতে পারে। এ কারণে হযরত মূসা ফেরাউনকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"তুমি খুব ভালো করেই জানো, এ নিদর্শনগুলো পৃথিবী ও আকাশের মালিক ছাড়া আর কেউ নাযিল করেনি।" (বনী ইসরাঈল, ১০২)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾

২য় রুকূ'

(অন্যদিকে) আমি দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করলাম[১৮] এবং তারা বললো, সেই আল্লাহর শোকর যিনি তাঁর বহু মু'মিন বান্দার ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[১৯] আর দাউদের উত্তরাধিকারী হলো সুলাইমান[২০] এবং সে বললো, "হে লোকেরা আমাকে শেখানো হয়েছে পাখিদের ভাষা[২১] এবং আমাকে দেয়া হয়েছে সবরকমের জিনিস।[২২] অবশ্যই এ (আল্লাহর) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।" সুলাইমানের জন্য জিন, মানুষ ও পাখিদের সৈন্য সমবেত করা হয়েছিল[২৩] এবং তাদেরকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো।

কিন্তু যে কারণে ফেরাউন ও তার জাতির সরদাররা জেনে বুঝে সেগুলো অস্বীকার করে তা এই ছিল ঃ

اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ –

"আমরা কি আমাদের মতই দু'জন লোকের কথা মেনে নেবো, অথচ তাদের জাতি আমাদের গোলাম?" (আল ম'মিনূন, ৪৭)

১৮. অর্থাৎ সত্যের জ্ঞান। আসলে তাদের কাছে নিজস্ব কোন জ্ঞান নেই, যা কিছু আছে তা আল্লাহর দেয়া এবং তা ব্যবহার করার যে ক্ষমতা তাদেরকে দেয়া হয়েছে তাকে আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। আর এ ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার ও অপব্যবহারের জন্য তাদেরকে প্রকৃত মালিকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ফেরাউন যে মূর্খতায় নিমজ্জিত ছিল এ জ্ঞান তার বিপরীতধর্মী। ফেরাউনী অজ্ঞতা ও মূর্খতার ফলে যে চরিত্র গড়ে উঠেছিল তার নমুনা ওপরে আলোচিত হয়েছে। এ জ্ঞান কোন্ ধরনের নৈতিক চরিত্রের আদর্শ পেশ করে এখন তা বলা হচ্ছে। শাসন ক্ষমতা ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, শক্তি দু'পক্ষেরই সমান। ফেরাউনও এগুলো লাভ করেছিল এবং দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামও লাভ করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞতা তাদের মধ্যে কত বড় ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে।

১৯. অর্থাৎ অন্য মু'মিন বান্দাও এমন ছিল যাদেরকে খেলাফত দান করা যেতে পারতো। কিন্তু এটা আমাদের কোন ব্যক্তিগত গুণ নয় বরং নিছক আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের এ রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করেছেন।

২০. উত্তরাধিকার বলতে ধন ও সম্পদ–সম্পত্তির উত্তরাধিকার বুঝানো হয়নি। বরং নবুওয়াত ও খিলাফতের ক্ষেত্রে হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সম্পদ–সম্পত্তির উত্তরাধিকার যদি ধরে নেয়াও যায় তা স্থানান্তরিত হয়, তাহলে তা এককভাবে হযরত, সুলাইমানের দিকেই স্থানান্তরিত হতে পারতো না। কারণ হযরত দাউদের অন্যান্য সন্তানরাও ছিল। তাই এ আয়াত দ্বারা নবী (সা) এর নিম্নোক্ত হাদীস দু'টিকে খণ্ডন করা যায় না ঃ لا نورث ما تركنا صدقة "আমাদের নবীদের উত্তরাধিকার বন্টন করা হয় না, যা কিছু আমরা পরিত্যাগ করে যাই তা হয় সাদকা" (বুখারী, খুমুস প্রদান করা ফরয অধ্যায়) এবং

إن النبي لا يورث إنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين

"নবীর কোন উত্তরাধিকারী হয় না। যা কিছু তিনি ত্যাগ করে যান তা মুসলমানদের গরীব ও মিসকিনদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়।" (মুসনাদে আহমাদ, আবু বকর সিদ্দীক বর্ণিত ৬০ ও ৭৮ নম্বর হাদীস)।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত দাউদের (আ) সবচেয়ে ছোট ছেলে। তাঁর আসল ইবরানী নাম ছিল সোলোমোন। এটি ছিল "সলীম" শব্দের সমার্থক। খৃষ্ট পূর্ব ৯৬৫ অব্দে তিনি হযরত দাউদের স্থলাভিষিক্ত হন এবং খৃঃ পূঃ ৯২৬ পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। (তাঁর বিস্তারিত বৃত্তান্ত জানার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল হিজর ৭ টীকা, আল আম্বিয়া ৭৪–৭৫ টীকা।) তাঁর রাজ্যসীমা সম্পর্কে আমাদের মুফাসৃসিরগণ অতি বর্ণনের আশ্রয় নিয়েছেন অনেক বেশী। তারা তাঁকে দুনিয়ার অনেক বিরাট অংশের শাসক হিসেবে দেখিয়েছেন। অথচ তাঁর রাজ্য কেবলমাত্র বর্তমান ফিলিস্তীন ও জর্দান রাষ্ট্র সমন্বিত ছিল এবং সিরিয়ার একটি অংশ এর অন্তরভুক্ত ছিল। (দেখুন বাদশাহ সুলাইমানের রাজ্যের মানচিত্র, তাফহীমুল কুরআন সূরা বনী ইসরাঈল)

২১. হযরত সুলাইমানকে (আ) যে পশু–পাখির ভাষা শেখানো হয়েছিল, বাইবেলে সে কথা আলোচিত হয়নি। কিন্তু বনী ইসরাঈলের বর্ণনাসমূহে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, ১১ খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা)

২২. অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া সবকিছু আমার কাছে আছে। একথাটিকে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দেয়া ধন–দৌলত ও সাজ–সরঞ্জামের আধিক্য। হযরত সুলাইমান অহংকারে স্ফীত হয়ে একথা বলেননি। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর দান ও দাক্ষিণ্যের শোকর আদায় করা।

২৩. জিনেরা যে হযরত সুলাইমানের সেনাবাহিনীর অংশ ছিল এবং তিনি তাদের কাজে নিয়োগ করতেন, বাইবেলে একথারও উল্লেখ নেই। কিন্তু তালমূদে ও রাব্বীদের বর্ণনায় এর বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, ১১ খণ্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা)

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ⑱ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْۤ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ⑲

(একবার সে তাদের সাথে চলছিল) এমন কি যখন তারা সবাই পিঁপড়ের উপত্যকায় পৌঁছুল তখন একটি পিঁপড়ে বললো, "হে পিঁপড়েরা। তোমাদের গর্তে ঢুকে পড়ো। যেন এমন না হয় যে, সুলাইমান ও তার সৈন্যরা তোমাদের পিশে ফেলবে এবং তারা তা টেরও পাবে না।"[২৪] সুলাইমান তার কথায় মৃদু হাসলো এবং বললো,– "হে আমার রব! আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো,[২৫] আমি যেন তোমার এ অনুগ্রহের শোকর আদায় করতে থাকি যা তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা–মাতার প্রতি করেছো এবং এমন সৎকাজ করি যা তুমি পছন্দ করো এবং নিজ অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করো।"[২৬]

বর্তমান যুগের কোন কোন ব্যক্তি একথা প্রমাণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যে, জিন ও পাখি বলে আসলে জিন ও পাখির কথা বুঝানো হয়নি বরং মানুষের কথা বুঝানো হয়েছে। মানুষরাই হযরত সুলাইমানের সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিল। তারা বলেন, জিন মানে পার্বত্য উপজাতি। এদের ওপর হযরত সুলাইমান বিজয় লাভ করেছিলেন। তাঁর অধীনে তারা বিস্ময়কর শক্তি প্রয়োগের ও মেহনতের কাজ করতো। আর পাখি মানে অশ্বারোহী সেনাবাহনী। তারা পদাতিক বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশী দ্রুততা সম্পন্ন ছিল। কিন্তু এটি কুরআন মজীদের শব্দের অযথা বিকৃত অর্থ করার নিকৃষ্টতম প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন এখানে জিন, মানুষ ও পাখি তিনটি আলাদা আলাদা প্রজাতির সেনাদলের কথা বর্ণনা করছে এবং তিনের ওপর ال (আলিফ লাম) বসানো হয়েছে তাদের পৃথক পৃথক প্রজাতিকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে। তাই আল জিন (জিন জাতি) ও আত্‌তাইর (পাখি জাত) কোনক্রমেই আল ইন্‌স (মানুষ জাতি)–এর অন্তরভুক্ত হতে পারে না। বরং তারা তার থেকে আলাদা দু'টি প্রজাতিই হতে পারে। তাছাড়া যে ব্যক্তি সামান্য আরবী জানে সে–ও কখনো একথা কল্পনা করতে পারে না যে, এ ভাষায় নিছক জিন শব্দ বলে তার মাধ্যমে মানুষদের কোন দল বা নিছক পাখি (তাইর) শব্দ বলে তার মাধ্যমে অশ্বারোহী বাহিনী অর্থ করা যেতে পারে এবং কোন আরব এ শব্দগুলো শুনে তার এ অর্থ বুঝতে পারে। নিছক প্রচলিত বাগধারা অনুযায়ী কোন

মানুষকে তার অস্বাভাবিক কাজের কারণে জিন অথবা কোন মেয়েকে তার সৌন্দর্যের কারণে পরী কিংবা কোন দ্রুতগতি সম্পন্ন পুরুষকে পাখি বলা হয় বলেই এর অর্থ এ হয় না যে, এখন জিন মানে শক্তিশালী লোক, পরী মানে সুন্দরী মেয়ে এবং পাখি মানে দ্রুতগতি সম্পন্ন মানুষই হবে। এ শব্দগুলোর এসব অর্থ তো তাদের রূপক অর্থ, প্রকৃত অর্থ নয়। আর কোন বাক্যের মধ্যে কোন শব্দকে তার প্রকৃত অর্থ বাদ দিয়ে রূপক অর্থে তখনই ব্যবহার করা হয় বা শ্রোতা তার রূপক অর্থ তখনই গ্রহণ করে যখন আশেপাশে এমন কোন সুস্পষ্ট প্রসংগ ও পূর্বাপর সামঞ্জস্য থাকে যা তার রূপক অর্থের দবী জানায়। এখানে এমন কি প্রসংগ ও সামঞ্জস্য পাওয়া যায় যার ভিত্তিতে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, জিন ও পাখি শব্দ দু'টি তাদের প্রকৃত অর্থে নয় বরং রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? বরং সামনের দিকে ঐ দু'টি দলের প্রত্যেক ব্যক্তির যে অবস্থা ও কাজ বর্ণনা করা হয়েছে তা এ পেঁচালো ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিরোধী অর্থ প্রকাশ করছে। কুরআনের কথায় কোন ব্যক্তির মন যদি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে না পারে, তাহলে তার পরিষ্কার বলে দেয়া উচিত আমি একথা মানি না। কিন্তু মানুষ কুরআনের পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন শব্দগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে নিজের মনের মতো অর্থের ছাঁচে সেগুলো ঢালাই করবে এবং একথা প্রকাশ করতে থাকবে যে, সে কুরআনের বর্ণনা মানে, অথচ আসলে কুরআন যা কিছু বর্ণনা করেছে সে তাকে নয় বরং নিজের জোর করে তৈরী করা অর্থই মানে— এটি মানুষের একটি মস্তবড় চারিত্রিক কাপুরুষতা ও তাত্বিক খেয়ানত ছাড়া আর কী হতে পারে।

২৪. আজকালকার কোন কোন মুফাস্‌সির এ আয়াতটিরও পেঁচালো ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেন, "ওয়াদী–উন্‌–নাম্‌ল" মানে পিঁপড়ের উপত্যকা নয় বরং এটি ছিল সিরীয় এলাকায় অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম। আর "নাম্‌লাহ্‌ মানে একটি পিঁপড়ে নয় বরং এটি একটি গোত্রের নাম। এভাবে তারা এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে বলেন, "যখন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নাম্‌ল উপত্যকায় পৌঁছেন তখন একজন নাম্‌লী বললো, "হে নাম্‌ল গোত্রের লোকেরা ....।" কিন্তু এটিও এমন একটি পেঁচালো ব্যাখ্যা কুরআনের শব্দ যার সহযোগী হয় না। ধরে নেয়া যাক, "ওয়াদিউন নাম্‌ল" বলতে যদি ঐ উপত্যকা মনে করা হয় এবং সেখানে বনী নাম্‌ল নামে কোন গোত্র বাস করতো বলে যদি ধরে নেয়া যায়, তাহলেও নাম্‌ল গোত্রের এক ব্যক্তিকে "নাম্‌লাহ" বলা আরবী ভাষার বাকরীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। যদিও পশুদের নামে আরবে বহু গোত্রের নাম রয়েছে, যেমন কাল্‌ব (কুকুর), আসাদ (সিংহ) ইত্যাদি কিন্তু কোন আরববাসী কাল্‌ব গোত্রের কোন ব্যক্তি সম্পর্কে قَالَ كَلْبٌ (একজন কুকুর একথা বললো) এবং আসাদ গোত্রের কোন ব্যক্তি সম্পর্কে قَالَ أَسَدٌ (একজন সিংহ বললো) কখনো বলবে না। তাই বনী নাম্‌লের এক ব্যক্তি সম্পর্কে এভাবে বলা, قَالَتْ نَمْلَةٌ (একজন পিঁপড়ে একথা বললো) পুরোপুরি আরবী বাগ্‌ধারা ও আরবী বাক্য প্রয়োগ রীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তারপর নাম্‌ল গোত্রের এক ব্যক্তির বনী নাম্‌লকে চিৎকার করে একথা বলা, "হে নাম্‌ল গোত্রীয় লোকেরা! নিজ নিজ গৃহে ঢুকে পড়ো। এমন যেন না হয়, সুলাইমানের সৈন্যরা তোমাদের পিষে ফেলবে এবং তারা জানতেও পারবে না," একেবারেই অর্থহীন। কারণ মানুষের কোন সেনাদল মানুষের কোন দলকে অজ্ঞাতসারে পদদলিত করে না। যদি তারা তাদেরকে

আক্রমণ করার সংকল্প নিয়ে এসে থাকে, তাহলে তাদের নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়া অর্থহীন। আক্রমণকারীরা ঘরের মধ্যে ঢুকে ভালোভাবে তাদেরকে কচুকাটা করবে। আর যদি তারা নিছক কুচকাওয়াজ করতে করতে অতিক্রম করে থাকে, তাহলে তো তাদের জন্য শুধুমাত্র পথ ছেড়ে দেয়াই যথেষ্ট। কুচকাওয়াজকারীদের আওতায় এলে মানুষের ক্ষতি অবশ্যই হতে পারে কিন্তু চলাচলকারী মানুষ অজ্ঞাতসারে মানুষকে দলে পিষে রেখে যাবে এমনটি তো হতে পারে না। কাজেই বনী নাম্‌ল যদি কোন মানবিক গোত্র হতো এবং তাদের কোন ব্যক্তি নিজের গোত্রকে সতর্ক করতে চাইতো, তাহলে আক্রান্ত হবার আশংকার প্রেক্ষিতে সে বলতো, "হে নাম্‌ল গোত্রীয়রা! পালাও; পালাও; পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় নাও, যাতে সুলাইমানের সৈন্যরা তোমাদের ধ্বংস করে না দেয়।" আর আক্রমণের আশংকা না থাকলে সে বলতো, "হে নাম্‌ল গোত্রীয়রা! পথ থেকে সরে যাও, যাতে তোমাদের কেউ সুলায়মানের সেনাদলের সামনে না পড়ে।"

এ পেঁচালো ব্যাখ্যার মধ্যে আরবী ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তো এ ভুল ছিল। এখন নাম্‌ল উপত্যকা এবং সেখানে বনী নাম্‌ল নামক একটি গোত্রের বাস সম্পর্কে বলা যায়, এটি আসলে একটি কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পেছনে আদৌ কোন তাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। যারা একে উপত্যকার নাম বলেছেন তারা নিজেরাই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পিঁপড়ের আধিক্যের কারণে একে এ নামে অভিহিত করা হয়েছিল। কাতাদাহ ও মুকাতিল বলেন, واد بارض الشام كثير النمل "সেটি সিরিয়া দেশের একটি উপত্যকা এবং সেখানে পিঁপড়ের আধিক্য রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস ও ভূগোলের কোন বইতে এবং পুরাতত্ত্বের কোন গবেষণায়ও এ উপত্যকায় বনী নাম্‌ল নামক কোন উপজাতির কথা উল্লেখিত হয়নি। এটি নিছক একটি মনগড়া কথা। নিজেদের কল্পিত ব্যাখ্যাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য এটি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের বর্ণনাসমূহেও এ কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু তার শেষাংশ কুরআনের বর্ণনার বিপরীত এবং হযরত সুলাইমানের মর্যদারও বিরোধী। সেখানে বলা হয়েছে, হযরত সুলাইমান যখন এমন একটি উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন যেখানে খুব বেশী পিঁপড়ে ছিল তখন তিনি শুনলেন একটি পিঁপড়ে চিৎকার করে অন্য পিঁপড়েদেরকে বলছে, "নিজেদের ঘরে ঢুকে পড়ো, নয়তো সুলাইমানের সৈন্যরা তোমাদের পিষে ফেলবে।" একথা শুনে হযরত সুলাইমান (আ) সেই পিঁপড়ের সামনে বড়ই আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করলেন। এর জবাবে পিঁপড়েটি তাকে বললো, তুমি কোথাকার কে? তুমি তো নগণ্য একটি ফোঁটা থেকে তৈরী হয়েছো। একথা শুনে সুলাইমান লজ্জিত হলেন। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপিডিয়া ১১ খণ্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা) এথেকে অনুমান করা যায়, কুরআন কিভাবে বনী ইসরাঈলের বর্ণনাসমূহ সংশোধন করেছে এবং তারা নিজেদের নবীদের চরিত্রে যেসব কলংক লেপন করেছিল কিভাবে সেগুলো দূর করেছে। এসব বর্ণনা থেকে কুরআন সবকিছু চুরি করেছে বলে পশ্চিমী প্রাচ্যবিদরা নির্লজ্জভাবে দাবী করে।

একটি পিঁপড়ের পক্ষে নিজের সমাজের সদস্যদেরকে কোন একটি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া এবং এ জন্য তাদের নিজেদের গর্তে ঢুকে যেতে বলা

বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মোটেই কোন অস্বাভবিক ব্যাপার নয়। এখন হযরত সুলাইমান একথাটি কেমন করে শুনতে পেলেন এ প্রশ্ন থেকে যায়। এর জবাবে বলা যায়, যে ব্যক্তির শ্রবনেন্দ্রিয় আল্লাহর কালামের মতো সূক্ষ্মতর জিনিস আহরণ করতে পারে তার পক্ষে পিঁপড়ের কথার মতো স্থূল (Crude) জিনিস আহরণ করা কোন কঠিন ব্যাপার হতে যাবে কেন।

২৫. মূল শব্দ হচ্ছে رَبِّ اَوْزِعْنِىْ এখানে আরবী ভাষায় وزع এর আসল অর্থ হচ্ছে রুখে দেয়া। এ সময় হযরত সুলাইমানের একথা বলা اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ (আমাকে রুখে দাও, আমি তোমার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো)। আমাদের কাছে আসলে এ অর্থ প্রকাশ করে যে, হে আমার রব! তুমি আমাকে যে বিরাট শক্তি ও যোগ্যতা দান করেছো তা এমন যে, যদি আমি সামান্য গাফিল হয়ে যাই তাহলে নাজানি বন্দেগীর সীমানা থেকে বের হয়ে আমি নিজের অহংকারে মত্ত হয়ে কোথা থেকে কোথায় চলে যাই। তাই হে আমার পরওয়ারদিগার! তুমি আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, যাতে আমি অনুগ্রহ অস্বীকারকারীর পরিবর্তে অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীতে পরিণত হতে পারি।

২৬. সৎকর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করার অর্থ সম্ভবত এ হবে যে, আখেরাতে আমার পরিণতি যেন সৎকর্মশীল লোকদের সাথে হয় এবং আমি যেন তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। কারণ মানুষ যখন সৎকাজ করবে তখন সৎকর্মশীল তো সে আপনা আপনিই হয়ে যাবে। তবে আখেরাতে কারো জান্নাতে প্রবেশ করা নিছক তার সৎকর্মের ভিত্তিতে হতে পারে না বরং এটি আল্লাহর রহমতের ওপর নির্ভর করে। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لن يدخل احدكم الجنة عمله "তোমাদের কারো নিছক আমল তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না।" বলা হলো, ولا انت يا رسول الله "আপনার বেলায়ও কি একথা খাটে?" জবাব দিলেন, ولا انا الا ان يتغمدنى الله تعالى برحمته "হ্যাঁ, আমিও নিছক আমার আমলের জোরে জান্নাতে প্রবেশ করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে নেবেন।"

যদি 'আন নাম্‌ল, মানে হয় মানুষদের একটি উপজাতি এবং 'নাম্‌লাহ' মানে হয় নাম্‌ল উপজাতির এক ব্যক্তি তাহলে সুলাইমান আলাইহিস সালামের এ দোয়া এ সময় একেবারেই নিরর্থক হয়ে যায়। এক বাদশাহর পরাক্রমশালী সেনাবাহিনীর ভয়ে কোন মানবিক গোত্রের এক ব্যক্তির নিজের গোত্রকে বিপদ সম্পর্কে সজাগ করা এমন কোন্‌ ধরনের অস্বাভাবিক কথা যে, এমন একজন সুমহান মর্যাদাশালী পরাক্রান্ত বাদশাহ এ জন্য আল্লাহর কাছে এ দোয়া চাইবেন। তবে এক ব্যক্তির দূর থেকে একটু পিঁপড়ের আওয়াজ শুনার এবং তার অর্থ বুঝার মতো জবরদস্ত শ্রবণ ও জ্ঞান শক্তির অধিকারী হওয়াটা অবশ্যই এমন একটি বিষয় যার ফলে মানুষের আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ ধরনের অবস্থায় হযরত সুলাইমানের এ দোয়া যথার্থ ও যথাযথ।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ ۖ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِينَ ﴿٢٠﴾

لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَا۟ذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾

(আর একবার) সুলাইমান পাখিদের খোঁজ–খবর নিল[২৭] এবং বললো, "কি ব্যাপার, আমি অমুক হুদ্‌হুদ পাখিটিকে দেখছিনা যে! সে কি কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে? আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো অথবা জবাই করে ফেলবো, নয়তো তাকে আমার কাছে যুক্তিসংগত কারণ দর্শাতে হবে।"[২৮]

২৭. অর্থাৎ এমনসব পাখিদের খোঁজ–খবর যাদের সম্পর্কে ওপরে বলা হয়েছে যে, জিন ও মানুষের মতো তাদের সেনাদলও হযরত সুলাইমানের সেনাবাহিনীর অন্তরভুক্ত ছিল। সম্ভবত হযরত সুলাইমান তাদের মাধ্যমে সংবাদ আদান–প্রদান, শিকার এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজ করতেন।

২৮. বর্তমান যুগের কোন কোন লোকও বলেন, আরবী ও আমাদের দেশীয় ভাষায় যে পাখিটিকে হুদ্‌হুদ পাখি বলা হয় হুদ্‌হুদ বলে আসলে সে পাখিটিকে বুঝানো হয়নি। বরং এটি এক ব্যক্তির নাম। সে ছিল হযরত সুলাইমানের (আ) সেনাবাহিনীর একজন অফিসার। এ দাবীর ভিত্তি এ নয় যে, ইতিহাসে তারা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সেনাবাহিনীতে হুদ্‌হুদ নামে একজন অফিসারের সন্ধান পেয়েছেন। বরং শুধুমাত্র এ যুক্তির ভিত্তিতে এ দাবী খাড়া করা হয়েছে যে, প্রাণীদের নামে মানুষের নামকরণ করার রীতি দুনিয়ার সকল ভাষার মতো আরবীতেও প্রচলিত আছে এবং হিব্রু ভাষাতেও ছিল। তাছাড়া সামনের দিকে হুদ্‌হুদের যে কাজ বর্ণনা করা হয়েছে এবং হযরত সুলাইমানের (আ) সাথে তার যে কথাবার্তা উল্লেখিত হয়েছে তা তাদের মতে একমাত্র একজন মানুষই করতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কুরআন মজীদের পূর্বাপর আলোচনা দেখলে মানুষ পরিষ্কার জানতে পারে যে, এটা কুরআনের তাফসীর নয় বরং তার বিকৃতি এবং এর চেয়ে অগ্রসর হয়ে বলা যায়, তার প্রতি মিথ্যাচারিতা। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সাথে কুরআনের কি কোন শত্রুতা আছে? সে বলতে চায়, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সেনাবাহনী বা পল্টন অথবা তথ্য বিভাগের একব্যক্তি অনুপস্থিত ছিল। তিনি তার খোঁজ করছিলেন। সে হাজির হয়ে এই এই খবর দিল। হযরত সুলাইমান তাকে এই এই কাজে পাঠালেন। একথাটা বলতে গিয়ে কুরআন অনবরত এমন হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করছে যা পাঠ করে একজন পাঠক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে পাখিই মনে করতে বাধ্য হচ্ছে। এ প্রসংগে কুরআনের বর্ণনা বিন্যাসের প্রতি একটু দৃষ্টি দিন ঃ

প্রথমে বলা হয়, হযরত সুলাইমান আল্লাহর এ অনুগ্রহের জন্য এভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, "আমাকে পাখির ভাষার জ্ঞান দেয়া হয়েছে" এ বাক্যে তো প্রথমত পাখি শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার ফলে প্রত্যেকটি আরব ও আরবী জানা লোক এ শব্দটিকে পাখি অর্থে গ্রহণ করবে। কারণ এখানে এমন কোন পূর্বাপর প্রসংগ বা সম্পর্ক নেই যা এ শব্দটিকে রূপক বা অপ্রকৃত অর্থে ব্যবহার করার পথ সুগম করতে পারে।

দ্বিতীয়ত এ মূলে ব্যবহৃত "তাইর" শব্দের অর্থ পাখি না হয়ে যদি মানুষের কোন দল হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য "মানতিক" (বুলি) শব্দ না বলে "লুগাত" বা "লিসান" (অর্থাৎ ভাষা) শব্দ বলা বেশী সঠিক হতো। আর তাছাড়া কোন ব্যক্তির অন্য কোন মানব গোষ্ঠীর ভাষা জানাটা এমন কোন বিরাট ব্যাপার নয় যে, বিশেষভাবে সে তার উল্লেখ করবে। আজকাল আমাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক অনেক বিদেশী ভাষা জানে ও বোঝে। এটা এমন কি কৃতিত্ব যে জন্য একে মহান আল্লাহর অস্বাভাবিক দান ও অনুগ্রহ গণ্য করা যেতে পারে?

এরপর বলা হয়, "সুলাইমানের জন্য জিন, মানুষ ও পাখি সেনাদল সমবেত করা হয়েছিল।" এ বাক্যে প্রথমত জিন, মানুষ ও পাখি তিনটি পরিচিত জাতির নাম ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ তিনটি শব্দ তিনটি বিভিন্ন ও সর্বজন পরিচিত জাতির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তারপর এ শব্দগুলো ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এদের কোনটির রূপক ও অপ্রকৃত অর্থে বা উপমা হিসেবে ব্যবহারের সপক্ষে কোন পূর্বাপর প্রাসংগিক সূত্রও নেই। ফলে ভাষার পরিচিত অর্থগুলোর পরিবর্তে অন্য অর্থে কোন ব্যক্তি এগুলোকে ব্যবহার করতে পারে না। তাছাড়া "মানুষ" শব্দটি "জিন" ও "পাখি" শব্দ দু'টির মাঝখানে বসেছে, যার ফলে জিন ও পাখি আসলে মানুষ প্রজাতিরই দু'টি দল ছিল এ অর্থ গ্রহণ করার পথে সুস্পষ্ট বাধার সৃষ্টি হয়েছে। যদি এ ধরনের অর্থ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হতো তাহলে مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ না বলে বলা হতো الْجِنِّ وَالطَّيْرِ مِنَ الْاِنْسِ –

সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে বলা হয়, হযরত সুলাইমান পাখির খোঁজ খবর নিচ্ছেলেন। এ সময় হুদহুদকে অনুপস্থিত দেখে তিনি একথা বলেন। যদি এ পাখি মানুষ হয়ে থাকে এবং হুদহুদও কোন মানুষের নাম হয়ে থাকে তাহলে কমপক্ষে তিনি এমন কোন শব্দ বলতেন যা থেকে বেচারা পাঠক তাকে প্রাণী মনে করতো না। দলের নাম বলা হচ্ছে পাখি এবং তার একজন সদস্যের নাম বলা হচ্ছে হুদহুদ, এরপরও আমরা স্বতস্ফূর্তভাবে তাকে মানুষ মনে করে নেব, আমাদের কাছে এ আশা করা হচ্ছে।

তারপর হযরত সুলাইমান বলেন, হুদহুদ হয় তার নিজের অনুপস্থিত থাকার যুক্তি সংগত কারণ বলবে আর নয়তো আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো অথবা জবাই করে ফেলবো। মানুষকে হত্যা করা হয়, ফাঁসি দেয়া হয়, মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, জবাই করে কে? কোন ভয়ংকর পাষাণ হৃদয় ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ প্রতিশোধ স্পৃহায় পাগল হয়ে গেলে হয়তো কাউকে জবাই করে ফেলে। কিন্তু আল্লাহর নবীর কাছেও কি আমরা এ আশা করবো যে, তিনি নিজের সেনাদলের এক সদস্যকে নিছক তার গরহাজির (Deserter) থাকার অপরাধে জবাই করার কথা ঘোষণা করে দেবেন এবং আল্লাহর প্রতি এ সুধারণা পোষণ করবো যে, তিনি এ ধরনের একটি মারাত্মক কথার উল্লেখ করে তার নিন্দায় একটি শব্দও বলবেন না?

আর একটু সামনের দিকে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে, হযরত সুলাইমান এ হুদহুদের কাছে সাবার রাণীর নামে পত্র দিয়ে পাঠাচ্ছেন এবং সেটি তাদের কাছে ফেলে দিতে বা নিক্ষেপ করতে বলছেন (اَلْقِهْ اِلَيْهِمْ) । বলা নিষ্প্রয়োজন, এ নির্দেশ পাখিদের প্রতি দেয়া যেতে পারে কিন্তু কোন মানুষকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়ে তাকে এ ধরনের নিক্ষেপ

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍۭ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّى وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَىْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

কিছুক্ষণ অতিবাহিত না হতেই সে এসে বললো, "আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি যা আপনি জানেন না। আমি সাবা সম্পর্কে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।[২৯] আমি সেখানে এক মহিলাকে সে জাতির শাসকরূপে দেখেছি। তাকে সবরকম সাজ সরঞ্জাম দান করা হয়েছে এবং তার সিংহাসন খুবই জমকালো।

করার নির্দেশ দেয়া একেবারে অসংগত হয়। কেউ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলে সে একথা মেনে নেবে যে, এক দেশের বাদশাহ অন্য দেশের রাণীর নামে পত্র দিয়ে নিজের রাষ্ট্রদূতকে এ ধরনের নির্দেশ সহকারে পাঠাতে পারে যে, পত্রটি নিয়ে রাণীর সামনে ফেলে দাও বা নিক্ষেপ করো। আমাদের মতো মামুলি লোকেরাও নিজেদের প্রতিবেশীর কাছে নিজের কোন কর্মচারীকে পাঠাবার ক্ষেত্রেও ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের যে প্রাথমিক রীতি মেনে চলি হযরত সুলাইমানকে কি তার চেয়েও নিম্নমানের মনে করতে হবে? কোন ভদ্রলোক কি কখনো নিজের কর্মচারীকে বলতে পারে, যা আমার এ পত্রটি অমুক সাহেবের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে আয়?

এসব নিদর্শন ও চিহ্ন পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, এখানে হুদ্‌হুদ আভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে মানুষ নয় বরং একটি পাখি ছিল। এখন যদি কোন ব্যক্তি একথা মেনে নিতে প্রস্তুত না হয় যে, কুরআন হুদ্‌হুদের বলা যেসব কথা উদ্ধৃত করছে একটি হুদ্‌হুদ তা বলতে পারে, তাহলে তার পরিষ্কার বলে দেয়া উচিত আমি কুরআনে এ কথাটি মানি না। কুরআনের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শব্দগুলোর মনগড়া অর্থ করে তার আড়ালে নিজের অবিশ্বাসকে লুকিয়ে রাখা জঘন্য মুনাফিকী ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৯. সাবা ছিল আরবের দক্ষিণ এলাকার একটি বিখ্যাত ব্যবসাজীবী জাতি। তাদের রাজধানী মারিব বর্তমান ইয়ামনের রাজধানী সান্‌আ থেকে ৫৫ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত ছিল। তাঁর উত্থানের যুগ মাঈনের রাষ্ট্রের পতনের পর প্রায় খৃষ্টপূর্ব ১১০০ অব্দে শুরু হয়। এরপর থেকে প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত। আরব দেশে তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ অব্যাহত থাকে। তারপর ১১৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ আরবের দ্বিতীয় খ্যাতিমান জাতি হিম্‌য়ার তাদের স্থান দখল করে। আরবে ইয়ামন ও হাদরামউত এবং আফ্রিকায় হাবৃশা (ইথিয়োপিয়া) পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পূর্ব আফ্রিকা, হিন্দুস্তান, দূর প্রাচ্য এবং আরবের যত বাণিজ্য মিসর, সিরিয়া, গ্রীস ও ইতালীর সাথে হতো তার বেশীর ভাগ ছিল এ সাবায়ীদের হাতে। এ জন্য এ জাতিটি প্রাচীনকালে নিজের ধনাঢ্যতা ও সম্পদশালীতার জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বরং গ্রীক ঐতিহাসিকরা তো তাদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী জাতি বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যবসায় ছাড়া তাদের সমৃদ্ধির বড় কারণটি ছিল এই যে, তারা

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾ (সজদা)

আমি তাকে ও তার জাতিকে আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের সামনে সিজ্‌দা করতে দেখেছি[৩০] —শয়তান[৩১] তাদের কার্যাবলী তাদের জন্য শোভন করে দিয়েছে[৩২] এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছে এ কারণে তারা সোজা পথ পায় না। (শয়তান তাদেরকে বিপথগামী করেছে এ জন্য) যাতে তারা সেই আল্লাহকে সিজ্‌দা না করে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন জিনিসসমূহ বের করেন[৩৩] এবং সে সবকিছু জানেন যা তোমরা গোপন করো ও প্রকাশ করো।[৩৪] আল্লাহ, ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের হকদার নয় তিনি মহান আরশের মালিক।[৩৫]

দেশের জায়গায় জায়গায় বাঁধ নির্মাণ করে পানি সেচের উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ফলে তাদের সমগ্র এলাকা সবুজ শ্যামল উদ্যানে পরিণত হয়েছিল। তাদের দেশের এ অস্বাভাবিক শস্য শ্যামলিমার কথা গ্রীক ঐতিহাসিকেরাও উল্লেখ করেছেন এবং কুরআন মজীদও সূরা সাবার দ্বিতীয় রুকূ'তে এদিকে ইংগিত করেছে।

হুদ্‌হুদের একথা, "আমি এমন তথ্য সংগ্রহ করেছি যা আপনি জানেন না" বলার অর্থ এ নয় যে, হযরত সুলাইমান সাবার ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। একথা সুস্পষ্ট ফিলিস্তীন ও সিরিয়ার যে শাসকের রাজ্য লোহিত সাগরের উত্তর তীর (আকাবা উপসাগর) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তিনি সেই লোহিত সাগরের দক্ষিণ কিনারে (ইয়ামন) বসবাসরত এমন একটি জাতি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ থাকতে পারেন না যারা আন্তরজাতিক বাণিজ্য পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ন্ত্রণ করতো। তাছাড়া যাবুর থেকে জানা যায়, হযরত সুলাইমানেরও পূর্বে তাঁর মহান পিতা হযরত দাউদ (আ) সাবা সম্পর্কে জানতেন। যাবুরে আমরা তার দোয়ার এ শব্দগুলো পাই ঃ

> "হে ইশ্বর, তুমি রাজাকে (অর্থাৎ স্বয়ং হযরত দাউদকে) আপনার শাসন, রাজপুত্রকে (অর্থাৎ সুলাইমানকে) আপনার ধর্মশীলতা প্রদান কর.....................। তর্শীশ ও দ্বীপগণের রাজগণ নৈবেদ্য আনিবেন। শিবা (অর্থাৎ সাবার ইয়ামনী ও হাবশী শাখাসমূহ) সাবার রাজগণ উপহার দিবেন।" (গীত সংহিতা ৭২ ঃ ১–২, ১০–১১)

তাই হুদ্‌হুদের কথার অর্থ মনে হয় এই যে, সাবা জাতির কেন্দ্রস্থলে আমি স্বচক্ষে যা দেখে এসেছি তার কোন খবর এখনো পর্যন্ত আপনার কাছে পৌঁছেনি।

৩০. এ থেকে জানা যায়, সেকালে এ জাতিটি সূর্য দেবতার পূজা করতো। আরবের প্রাচীন বর্ণনাগুলো থেকেও এ জাতির এ একই ধর্মের কথা জানা যায়। ইবনে ইসহাক কুলজি বিজ্ঞান (Genealogies) অভিজ্ঞদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, সাবা জাতির প্রাচীনতম পূর্ব পুরুষ হলো আব্‌দে শাম্‌স (অর্থাৎ সূর্যের দাস বা সূর্য উপাসক) এবং উপাধি ছিল সাবা। বনী ইসরাঈলের বর্ণনাও এর সমর্থক। সেখানে বলা হয়েছে, হুদ্‌হুদ যখন হযরত সুলাইমানের (আ) পত্র নিয়ে পৌঁছে যায় সাবার রাণী তখন সূর্য দেবতার পূজা করতে যাচ্ছিলেন। হুদ্‌হুদ পথেই পত্রটি রাণীর সামনে ফেলে দেয়।

৩১. বক্তব্যের ধরন থেকে অনুমিত হয় যে, এখান থেকে শেষ প্যারা পর্যন্তকার বাক্যগুলো হুদ্‌হুদের বক্তব্যের অংশ নয়। বরং "সূর্যের সামনে সিজদা করে" পর্যন্ত তার বক্তব্য শেষ হয়ে যায়। এরপর এ উক্তিগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সংযোজন করা হয়েছে। এ অনুমানকে যে জিনিস শক্তিশালী করে তা হচ্ছে এ বাক্যটি وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ "আর তিনি সবকিছু জানেন, যা তোমরা লুকাও ও প্রকাশ করো।" এ শব্দগুলো থেকে প্রবল ধারণা জন্মে যে, বক্তা হুদ্‌হুদ এবং শ্রোতা হযরত সুলাইমান ও তার দরবারীগণ নন বরং বক্তা হচ্ছেন আল্লাহ এবং তিনি সম্বোধন করছেন মক্কার মুশরিকদেরকে, যাদেরকে নসিহত করার জন্যই এ কাহিনী শুনানো হচ্ছে। মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে রূহুল মা'আনী–এর লেখক আল্লামা আলূসীও এ অনুমানকে অগ্রগণ্য মনে করেছেন।

৩২. অর্থাৎ দুনিয়ার ধন–সম্পদ উপার্জন এবং নিজের জীবনকে অত্যধিক জাঁকালো ও বিলাসী করার যে কাজে তারা নিমগ্ন ছিল, শয়তান তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, বুদ্ধি ও চিন্তার এটিই একমাত্র নিয়োগ ক্ষেত্র এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তিসমূহ প্রয়োগের একমাত্র উপযুক্ত স্থান। তাই এ পার্থিব জীবন ও তার আরাম আয়েশ ছাড়া আর কোন জিনিস সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা–ভাবনা করার দরকার নেই। এ আপাতদৃষ্ট পার্থিব জীবনের পিছনে কোন্ বাস্তব সত্য নিহিত রয়েছে এবং তোমাদের প্রচলিত ধর্ম, নৈতিকতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিসমূহ এ সত্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, না পুরোপুরি তার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে— সেসব নিয়ে অযথা মাথা ঘামাবার দরকার নেই বলে শয়তান তাদেরকে নিশ্চিন্ত করে দেয় যে, তোমরা যখন ধন–দৌলত, শক্তি–সামর্থ ও শান–শওকতের দিক দিয়ে দুনিয়ায় অগ্রসর হয়েই যাচ্ছো তখন আবার তোমাদের প্রচলিত আকিদা–বিশ্বাস ও মতবাদকে সঠিক কিনা, তা চিন্তা করার প্রয়োজনই বা কি। এসব সঠিক হবার সপক্ষে তো এই একটি প্রমাণই যথেষ্ট যে, তোমরা আরামে ও নিশ্চিন্তে অর্থ ও বিত্তের পাহাড় গড়ে তুলছ। এবং আয়েশী জীবন যাপন করছো।

৩৩. যিনি প্রতিমুহূর্তে এমন সব জিনিসের উদ্ভব ঘটাচ্ছেন যেগুলো জন্মের পূর্বে কোথায় কোথায় লুকিয়ে ছিল কেউ জনে না। ভূ–গর্ভ থেকে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য উদ্ভিদ এবং নানা ধরনের খনিজ পদার্থ বের করছেন। উর্ধ জগত থেকে প্রতিনিয়ত এমন সব জিনিসের আবির্ভাব ঘটাচ্ছেন, যার আবির্ভাব না ঘটলে মানুষের ধারণা ও কল্পনায়ও কোনদিন আসতে পারতো না।

৩৪. অর্থাৎ সকল জিনিসই তাঁর জ্ঞানের আওতাধীন। তাঁর কাছে গোপন ও প্রকাশ্য সব সমান। সবকিছুই তার সামনে সমুজ্জ্বল ও উন্মুক্ত।

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَأَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

সুলাইমান বললো, "এখনই আমি দেখছি তুমি সত্য বলছো অথবা মিথ্যাবাদীদের অন্তরভুক্ত। আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং এটি তাদের প্রতি নিক্ষেপ করো, তারপর সরে থেকে দেখো তাদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়।"৩৬

রাণী বললো, "হে দরবারীরা! আমার প্রতি একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ পত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে। তা সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ রহমানুর রহীমের নামে শুরু করা হয়েছে।" বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ "আমার অবাধ্য হয়ো না এবং মুসলিম হয়ে আমার কাছে হাজির হয়ে যাও।"৩৭

নমুনা হিসেবে মহান আল্লাহর এ দু'টি গুণ বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, যদি তারা শয়তানের প্রতারণা জালে আবদ্ধ না হতো তাহলে এ সোজা পথটি পরিষ্কার দেখতে পেতো যে, সূর্যনামের একটি জ্বলন্ত জড় পদার্থ, যার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই কোন অনুভূতি নেই, সে কোন ইবাদাতের হকদার নয় বরং একমাত্র সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী মহান সত্তা যাঁর অসীম শক্তি প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন অভাবনীয় কৃর্তির উদ্ভব ঘটাচ্ছে, তিনিই এর হকদার।

৩৫. এখানে সিজদা করা ওয়াজিব। কুরআনের যেসব জায়গায় সিজদা করা ওয়াজিব বলে ফকীহগণ একমত, এটি তার অন্যতম । এখানে সিজদা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন মু'মিনের সূর্যপূজারীদের থেকে নিজেকে সচেতনভাবে পৃথক করা এবং নিজের কর্মের মাধ্যমে একথার স্বীকৃতি দেয়া ও একথা প্রকাশ করা উচিত যে, সে সূর্যকে নয় বরং একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকেই নিজের সিজদার ও ইবাদাতের উপযোগী এবং যোগ্য মনে করে।

৩৬. এখানে এসে হুদ্‌হুদের ভূমিকা শেষ হয়ে যায়। যুক্তিবাদের প্রবক্তারা যে কারণে তাকে পাখি বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে সেটি হচ্ছে এই যে, তাদের মতে একটি পাখি এতটা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বিচার ক্ষমতা ও বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সে একটা দেশের ওপর দিয়ে উড়ে য়াওয়ার সময় বুঝে ফেলবে যে, এটি সাবা জাতির দেশ, এদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ ধরনের, এর শাসক অমুক মহিলা, এদের ধর্ম সূর্যপূজা, এদের এক আল্লাহর পূজারী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এরা ভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে ইত্যাদি, আর সে এসে হযরত সুলাইমানের সামনে নিজের এসব উপলব্ধি এত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এটা

তাদের দৃষ্টিতে একটি অসম্ভব ব্যাপার। এসব কারণে কট্টর নাস্তিকরা কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলে, কুরআন "কালীলাহ ও দিমনা" (পশু পাখির মুখ দিয়ে বর্ণিত উপদেশমূলক কল্পকাহিনী) ধরনের কথাবার্তা বলে। আর কুরআনের যুক্তিবাদী তাফসীর যারা করেন তারা তার শব্দগুলোকে তাদের প্রত্যক্ষ অর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, এই হুদ্‌হুদ তো আসলে কোন পাখিই ছিল না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, এ ভদ্র মহোদয়গণের কাছে এমন কি বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী আছে যার ভিত্তিতে তারা চূড়ান্তভাবে একথা বলতে পারেন যে, পশু পাখি ও তাদের বিভিন্ন প্রজাতি এবং বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট পাখির শক্তি, দক্ষতা, নৈপুন্য, ও ধীশক্তি কতটুকু এবং কতটুকু নয়? যে জিনিসগুলোকে তারা অর্জিত জ্ঞান মনে করছেন সেগুলো আসলে প্রাণীদের জীবন ও আচার আচরণের নিছক অকিঞ্চিত ও ভাসাভাসা পর্যবেক্ষণ ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীরা কে কি জানে, শোনে ও দেখে, কি অনুভব করে, কি চিন্তা করে ও বোঝে এবং তাদের প্রত্যেকের মন ও বুদ্ধিশক্তি কিভাবে কাজ করে, এসব সম্পর্কে মানুষ আজ পর্যন্ত কোন নিশ্চিত উপায়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। এরপরও বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর জীবনের যে সামান্যতম পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে তা থেকে তাদের বিস্ময়কর যোগ্যতা ও ক্ষমতার সন্ধান পাওয়া গেছে। এখন মহান আল্লাহ যিনি এসব প্রাণীর স্রষ্টা তিনি যদি আমাদের বলেন, তিনি তাঁর একজন নবীকে এসব প্রাণীর ভাষা বুঝার এবং এদের সাথে কথা বলার যোগ্যতা দান করেছিলেন এবং সেই নবীর কাছে প্রতিপালিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবার কারণে একটি হুদ্‌হুদ পাখি এমনি যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েছিল যার ফলে ভিন দেশ থেকে এই এই বিষয় দেখে এসে নবীকে সে তার খবর দিতো, তাহলে আল্লাহর এ বর্ণনার আলোকে আমাদের কি প্রাণীজগত সম্পর্কে নিজেদের এ পর্যন্তকার যৎসামান্য জ্ঞান ও বিপুল সংখ্যক অনুমানের পুনরবিবেচনা করা উচিত ছিল না? তা না করে নিজেদের এ অকিঞ্চিত জ্ঞানকে মানদণ্ড হিসেবে ধরে নিয়ে আল্লাহর এ বর্ণনার প্রতি মিথ্যা আরোপ অথবা তার মধ্যে সূক্ষ্ম অর্থগত বিকৃতি সাধন করা আমাদের কোন্ ধরনের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক?

৩৭. অর্থাৎ কয়েকটি কারণে পত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। এক, পত্রটি এসেছে অদ্ভূত ও অস্বাভিক পথে। কোন রাষ্ট্রদূত এসে পত্র দেয়নি। বরং তার পরিবর্তে এসেছে একটি পাখি। সে পত্রটি আমার কাছে ফেলে দিয়েছে। দুই, পত্রটি হচ্ছে, ফিলিস্তীন ও সিরিয়ার মহান শাসক সুলাইমানের (আ) পক্ষ থেকে। তিন, এটি শুরু করা হয়েছে আল্লাহ রহমানুর রহীমের নামে। অথচ দুনিয়ার কোথাও চিঠিপত্র লেখার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না। তারপর সকল দেবতাকে বাদ দিয়ে একমাত্র মহান ও শ্রেষ্ঠ আল্লাহর নামে পত্র লেখাও আমাদের দুনিয়ায় একটি অস্বাভাবিক ও অভিনব ব্যাপার। সর্বোপরি যে বিষয়টি এর গুরুত্ব আরো বেশী বাড়িয়ে দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, পত্রে আমাকে একেবারে পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাওয়াত দেয়া হয়েছে, আমি যেন অবাধ্যতার পথ পরিহার করে আনুগত্যের পথ অবলম্বন করি এবং হুকুমের অনুগত বা মুসলমান হয়ে সুলাইমানের সামনে হাজির হয়ে যাই।

"মুসলিম" হয়ে হাজির হবার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, অনুগত হয়ে হাজির হয়ে যাও। দুই, দীন ইসলাম গ্রহণ করে হাজির হয়ে যাও। প্রথম হুকুমটি হযরত সুলাইমানের

قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ قَالُوا۟ نَحْنُ أُو۟لُوا۟ قُوَّةٍ وَأُو۟لُوا۟ بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

৩ রুকূ'

(পত্র শুনিয়ে) রাণী বললো, "হে জাতীয় নেতৃবৃন্দ! আমার উদ্ভূত সমস্যায় তোমরা পরামর্শ দাও। তোমাদের বাদ দিয়ে তো আমি কোন বিষয়ের ফায়সালা করি না।[৩৮] তারা জবাব দিল, "আমরা শক্তিশালী ও যোদ্ধা জাতি, তবে সিদ্ধান্ত আপনার হাতে, আপনি নিজেই ভেবে দেখুন আপনার কি আদেশ দেয়া উচিত। রাণী বললো, কোন বাদশাহ যখন কোন দেশে ঢুকে পড়ে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে এবং সেখানকার মর্যাদাশালীদেরকে লাঞ্ছিত করে[৩৯] এ রকম কাজ করাই তাদের রীতি।[৪০] আমি তাদের কাছে একটি উপঢৌকন পাঠাচ্ছি তারপর দেখছি আমার দূত কি জবাব নিয়ে ফেরে।"

শাসকসুলভ মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। দ্বিতীয় হুকুমটি সামঞ্জস্য রাখে তাঁর নবীসুলভ মর্যাদার সাথে। সম্ভবত এই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে পত্রে উভয় উদ্দেশ্য অন্তরভুক্ত থাকার কারণে। ইসলামের পক্ষ থেকে স্বাধীন জাতি ও সরকারদেরকে সবসময় এ মর্মে দাওয়াত দেয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সত্য দীন গ্রহণ করো এবং আমাদের সাথে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সমান অংশীদার হয়ে যাও অথবা নিজেদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা পরিত্যাগ করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অধীনতা গ্রহণ করো এবং নিসংকোচে জিযিয়া দাও।

৩৮. মূল শব্দ হচ্ছে حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ –যতক্ষণ না তোমরা উপস্থিত হও অথবা তোমরা সাক্ষী না হও। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ফায়সালা করার সময় আমার নিকট তোমাদের উপস্থিতি জরুরী হয়ে পড়ে। তাছাড়া আমি যে ফায়সালাই করি না কেন তার সঠিক হবার ব্যাপারে তোমাদের সাক্ষ দিতে হয়। এ থেকে যে কথা প্রকাশিত হয় তা হচ্ছে এই যে, সাবা জাতির মধ্যে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও তা কোন স্বৈরতান্ত্রিক মেজাজের ছিল না বরং তদানীন্তন শাসনকর্তা রাষ্ট্রের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করতেন।

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ز فَمَآ اٰتٰىنِ ءَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ج بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ج وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾

যখন সে (রাণীর দূত) সুলাইমানের কাছে পৌঁছুলো, সে বললো, "তোমরা কি অর্থ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী।[৪১] তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরাই খুশী থাকো। (হে দূত!) ফিরে যাও নিজের প্রেরণকারীদের কাছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন সেনাদল নিয়ে আসবো[৪২] যাদের তারা মোকাবিলা করতে পারবে না এবং আমি তাদেরকে এমন লাঞ্ছিত করে সেখান থেকে বিতাড়িত করবো যে, তারা ধিকৃত ও অপমাণিত হবে।"

সুলাইমান বললো,[৪৩] "হে সভাসদগণ! তারা অনুগত হয়ে আমার কাছে আসার আগে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে?"[৪৪] এক বিশালকায় জিন বললো, আপনি নিজের জায়গা ছেড়ে ওঠার আগেই আমি তা এনে দেবো।[৪৫] আমি এ শক্তি রাখি এবং আমি বিশ্বস্ত।[৪৬]

৩৯. এ একটি বাক্যের মাধ্যমে রাজতন্ত্র এবং তার প্রভাব ও ফলাফলের ওপর পূর্ণাংগ মন্তব্য করা হয়েছে। রাজ–রাজড়াদের দেশ জয় এবং বিজেতা জাতি কর্তৃক অন্য জাতির ওপর হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব কখনো সংশোধন ও মংগলাকাংখ্যার উদ্দেশ্যে হয় না। এর উদ্দেশ্য হয়, অন্য জাতিকে আল্লাহ যে রিযিক এবং উপায় উপকরণ দিয়েছেন তা থেকে নিজেরা লাভবান হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট জাতিকে এতটা ক্ষমতাহীন করে দেয়া যার ফলে সে আর কখনো মাথা উঁচু করে নিজের অংশটুকু চাইতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে সে তার সমৃদ্ধি, শক্তি ও মর্যাদার যাবতীয় উপায়–উপকরণ খতম করে দেয়। তার যেসব লোকের মধ্যে আত্ম–মর্যাদাবোধের লেশমাত্র সঞ্জীবিত থাকে তাদেরকে দলিত মথিত করে। তার লোকদের মধ্যে তোষামোদ প্রিয়তা পরস্পরের মধ্যে হানাহানি, কাটাকাটি, একে অন্যের গোয়েন্দাগিরি করা, বিজয়ী শক্তির অন্ধ অনুকরণ করা, নিজের সভ্যতা–সংস্কৃতিকে হেয়

মনে করা, হানাদারদের সভ্যতা–সংস্কৃতিকে গোলামী দান করা এবং এমনিতর অন্যান্য নীচ ও ঘৃণিত গুণাবলী সৃষ্টি করে দেয়। এ সংগে তাদেরকে এমন স্বভাবের অধিকারী করে তোলে যার ফলে তারা নিজেদের পবিত্রতম জিনিসও বিক্রি করে দিতে ইতস্তত করে না এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যাবতীয় ঘৃণিত কাজ করে দিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়।

৪০. এ বাক্যাংশের বক্তা কে, সে ব্যাপারে দু'টি সমান সমান সম্ভাবনা রয়েছে। একটি হচ্ছে, এটি সাবার রাণীরই উক্তি এবং তিনি তাঁর পূর্বের উক্তিটির ওপর জোর দিয়ে এটুকু সংযোজন করেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি হচ্ছে, এটি মহান আল্লাহরই উক্তি। রাণীর বক্তব্য সমর্থন করার জন্য প্রাসংগিক বাক্য হিসেবে তিনি একথা বলেন।

৪১. অহংকার ও দাম্ভীকতার প্রকাশ এ কাজের উদ্দেশ্য নয়। আসল বক্তব্য হচ্ছে, তোমাদের অর্থ–সম্পদ আমার লক্ষ নয় বরং তোমরা ঈমান আনো এটাই আমার কাম্য। অথবা কমপক্ষে যে জিনিস আমি চাই তা হচ্ছে, তোমরা একটি সৎজীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে যাও। এ দু'টি জিনিসের মধ্যে কোন একটিই যদি তোমরা না চাও, তাহলে ধন-সম্পদের উৎকোচ গ্রহণ করে তোমাদেরকে এই শির্‌ক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নোংরা জীবন ব্যবস্থার ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমাদের সম্পদের তুলনায় আমার রব আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা ঢের বেশী। কাজেই তোমাদের সম্পদের প্রতি আমার লোভাতুর হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৪২. প্রথম বাক্য এবং এ বাক্যটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ফাঁক রয়ে গেছে। বক্তব্যটি সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে এটি আপনা আপনিই অনুধাবন করা যায়। অর্থাৎ পুরো বক্তব্যটি এমন ঃ হে দূত এ উপহার এর প্রেরকের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তাকে হয় আমার প্রথম কথাটি মেনে নিতে হবে অর্থাৎ মুসলিম হয়ে আমার কাছে হাজির হয়ে যেতে হবে আর নয়তো আমি সেনাদল নিয়ে তার ওপর আক্রমণ করবো।

৪৩. মাঝখানের ঘটনা উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সাবার রাণীর দূত তার উপঢৌকন ফেরত নিয়ে দেশে পৌঁছে গেলো এবং যা কিছু সে শুনেছিল ও দেখেছিল সব আনুপূর্বিক বর্ণনা করলো। রাণী তার কাছ থেকে হযরত সুলাইমান সম্পর্কে যা শুনলেন তা থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি নিজেই বায়তুল মাকদিসে যাবেন। কাজেই তিনি রাজকীয় জৌলুশ ও সাজ–সরঞ্জাম সহকারে ফিলিস্তীনের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং হযরত সুলাইমানের দরবারে খবর পাঠালেন এই বলে ঃ আপনার দাওয়াত আপনার মুখে শুনার এবং সরাসরি আপনার সাথে আলোচনা করার জন্য আমি নিজেই আসছি। এসব বিস্তারিত ঘটনা বাদ দিয়ে এখন শুধুমাত্র রাণী যখন বাইতুল মাকদিসের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তার মাত্র এক–দু'দিনের পথ বাকি ছিল তখনকার ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

৪৪. অর্থাৎ সেই সিংহাসনটি যে সম্পর্কে হুদ্‌হুদ পাখি বলেছিল যে, "তার সিংহাসনটি বড়ই জমকালো।" কোন কোন মুফাস্‌সির রাণীর আগমনের পূর্বে তাঁর সিংহাসন উঠিয়ে নিয়ে আসার কারণ হিসেবে এরূপ অদ্ভুত উক্তি করেছেন যে, হযরত সুলাইমান এটি দখল

করে নিতে চাচ্ছিলেন এবং তিনি আশংকা করেছিলেন, রাণী যদি ইসলাম গ্রহণ করে বসেন, তাহলে তাঁর সম্পদ তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি ছাড়া দখল করা হারাম হয়ে যাবে। তাই তিনি তাঁর আসার আগেই সাত তাড়াতাড়ি তাঁর সিংহাসনটি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। কারণ এ সময় পর্যন্ত রাণীর সম্পদ–সম্পত্তি মুবাহ ছিল। আস্তাগ্ ফিরুল্লাহ একজন নবীর নিয়ত সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা বড়ই বিস্ময়কর মনে হয়। একথা মনে করা হয় না কেন যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে রাণী ও তার সভাসদদেরকে একটি মু'জিযাও দেখাতে চাচ্ছিলেন? এভাবে তারা জানতে পারতো, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর নবীদেরকে কেমন সব অস্বাভাবিক শক্তি দান করেন এবং এভাবে তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারতো যে, হযরত সুলাইমান (আ) যথার্থই আল্লাহর নবী। কোন কোন আধুনিক তাফসীরকার এর চেয়েও মারাত্মক অশালীন ও অনাকাংখিত কথা বলেছেন। তারা আয়াতের তরজমা এভাবে করেছেন ঃ "তোমাদের মধ্য থেকে কে আমাকে রাণীর জন্য একটি সিংহাসন এনে দেবে"? অথচ কুরআন يا تيني بعرش لها নয় বরং بعرشها বলছে। এর অর্থ হচ্ছে, "তার সিংহাসন, তার জন্য একটি সিংহাসন নয়। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যেহেতু রাণীরই সিংহাসন ইয়ামন থেকে উঠিয়ে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন এবং তাও আবার রাণীর এসে পড়ার আগেভাগেই, শুধুমাত্র এ কারণে এ ধরনের মনগড়া কথা তৈরি করা হয়েছে আর যে কোনভাবে কুরআনের বর্ণনাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।

৪৫. এ থেকে হযরত সুলাইমানের কাছে যেসব জিন ছিল তারা বর্তমান যুগের কোন কোন যুক্তিবাদী তাফসীরকারের মতানুযায়ী মানব বংশজাত ছিল অথবা সাধারণ প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী জিন নামে পরিচিত অদৃশ্য সৃষ্টি ছিল, একথা জানা যেতে পারে। বলা নিষ্প্রয়োজন, হযরত সুলাইমানের দরবারের অধিবেশন বড় জোর তিন চার ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল বলে মনে হয়। বাইতুল মাক্দিস থেকে সাবার রাজধানী মায়ারিবের দূরত্বও পাখির উড়ে চলার পথের হিসেবে কমপক্ষে দেড় হাজার মাইল ছিল। এতদূর দেশ থেকে এক সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন এত কম সময়ে উঠিয়ে নিয়ে আসা কোন মানুষের কাজ হতে পারতো না। সে আমালিকা বংশোদ্ভুত যতই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ব্যক্তিই হোক না কেন তার পক্ষে এটা সম্ভব পর ছিলা না। আধুনিক জেট বিমানগুলোও তো এ কাজ সম্পাদন করতে অক্ষম। বিষয়টা এমন নয় যে, সিংহাসন কোন বনে–জংগলে রাখা আছে এবং শুধুমাত্র সেখান থেকে উঠিয়ে আনতে হবে। বরং ব্যাপার হচ্ছে, সিংহাসন রয়েছে এক রাণীর মহলের অভ্যন্তরে। নিশ্চয়ই তার চারদিকে রয়েছে কড়া পাহারা। আবার রাণীর অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই তা আরো সংরক্ষিত জায়গায় রাখা হয়েছে। মানুষ যদি তা উঠিয়ে আনতে যায় তাহলে তার সাথে একটি ছোট খাট তড়িৎগতি সম্পন্ন সেনাদলও থাকতে হবে। হাতাহাতি লড়াই করে পাহারাদারদের পরাজিত করে তাদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে আনতে হবে। দরবার শেষ হবার আগে এসব কাজ কেমন করে করা যেতে পারতো! বিষয়টির এ দিকটি ভেবে দেখলে এ কাজটি একমাত্র একজন প্রকৃত জিনের পক্ষেই করা সম্ভবপর ছিল বলে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে।

৪৬. অর্থাৎ আপনি আমার প্রতি আস্থা রাখতে পারেন, আমি নিজে তা উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবো না অথবা তার কোন মূল্যবান জিনিস চুরি করে নেব না।

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۗ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ ۗ لِيَبْلُوَنِىْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۗ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾

কিতাবের জ্ঞান সম্পন্ন অপর ব্যক্তি বললো, "আমি আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই আপনাকে তা এনে দিচ্ছি।"৪৭ যখনই সুলাইমান সেই সিংহাসন নিজের কাছে রক্ষিত দেখতে পেলো, অমনি সে চিৎকার করে উঠলো, "এ আমার রবের অনুগ্রহ, আমি শোকরগুযারী করি না নাশোকরী করি, তা তিনি পরীক্ষা করতে চান।"৪৮ আর যে ব্যক্তি শোকরগুযারী করে তার শোকর তার নিজের জন্যই উপকারী। অন্যথায় কেউ অকৃতজ্ঞ হলে, আমার রব কারো ধার ধারেন না এবং তিনি আপন সত্তায় আপনি মহীয়ান।৪৯

৪৭. এ ব্যক্তি কে ছিল, তার কাছে কোন্ বিশেষ ধরনের জ্ঞান ছিল এবং যে কিতাবের জ্ঞান তার আয়ত্বাধীন ছিল সেটি কোন্ কিতাব ছিল, এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ও নিশ্চিত কথা বলা সম্ভবপর নয়। কুরআনে বা কোন সহীহ হাদীসে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করা হয়নি। তাফসীরকারদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেন, সে ছিল একজন ফেরেশতা আবার কেউ কেউ বলেন, একজন মানুষই ছিল। তারপর সে মানুষটিকে চিহ্নিত করার ব্যাপারেও তাদের মধ্যে মতদ্বৈধতা রয়েছে। কেউ আসফ ইবনে বরখিয়াহ (Asaf- B-Barchiah) –এর নাম বলেন। ইহুদী রাব্বীদের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ছিলেন মানব প্রধান (Prince of Men) কেউ বলেন, তিনি ছিলেন খিযির। কেউ অন্য কারোর নাম নেন। আর ইমাম রাযী এ ব্যাপারে জোর দিয়ে বলতে চান যে, তিনি ছিলেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নিজেই। কিন্তু এদের কারো কোন নির্ভরযোগ্য উৎস নেই। আর ইমাম রাযীর বক্তব্য তো কুরআনের পূর্বাপর আলোচনার সাথে কোন সামঞ্জস্য রাখে না। এভাবে কিতাব সম্পর্কেও মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন। কেউ বলেন, এর অর্থ লাওহে মাহফুজ এবং কেউ বলেন, শরীয়াতের কিতাব। কিন্তু এগুলো সবই নিছক অনুমান। আর কিতাব থেকে ঐ ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কেও বিনা যুক্তি–প্রমাণে ঐ একই ধরনের অনুমানের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। আমরা কেবলমাত্র কুরআনে যতটুকু কথা বলা হয়েছে অথবা তার শব্দাবলী থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে ততটুকু কথাই জানি ও মানি। ঐ ব্যক্তি কোনক্রমেই জিন প্রজাতির অন্তরভুক্ত ছিলেন না এবং তার মানব প্রজাতির অন্তরভুক্ত হওয়াটা মোটেই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নয়। তিনি কোন অস্বাভাবিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তার এ জ্ঞান আল্লাহর কোন কিতাব থেকে সংগৃহীত ছিল। জিন নিজের দৈহিক শক্তি বলে

কয়েক ঘন্টার মধ্যে এ সিংহাসন উঠিয়ে আনার দাবী করছিল। কিন্তু এ ব্যক্তি আসমানী কিতাবের শক্তিবলে মাত্র এক লহমার মধ্যে তা উঠিয়ে আনলেন।

৪৮. কুরআন মজীদের বর্ণনাভংগী এ ব্যাপারে একদম পরিষ্কার। এ বর্ণনা অনুসারে, সেই দানবাকৃতির জিনের মতো এ ব্যক্তির দাবী নিছক দাবীই ছিল না। বরং প্রকৃতপক্ষে তিনি দাবী করার পরপরই মাত্র এক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা গেলো সিংহাসনটি হযরত সুলাইমানের (আ) সামনে রাখা আছে। এ শব্দগুলোর ওপর একবার নজর বুলিয়ে নিন।

"সেই ব্যক্তি বললো, আমি চোখের পলক ফেলতেই তা নিয়ে আসছি। তখনই সুলাইমান তা তাঁর নিজের কাছে রক্ষিত দেখতে পেলো।"

ঘটনাটি কেমন অদ্ভুত ও বিস্ময়কর সে কথা মন থেকে বের করে দিয়ে যে ব্যক্তি এ বাক্যাংশটি পড়বে, সে এ থেকে এ অর্থই গ্রহণ করবে যে, ঐ ব্যক্তির একথা বলার সাথে সাথেই সে যা দাবী করেছিল তা ঘটে গেলো। এ সোজা সরল কথাটিকে অনর্থক টানা হেঁচড়া করে এর ভিন্ন অর্থ করার কি দরকার ছিল? তারপর সিংহাসন দেখতেই হযরত সুলাইমানের একথা বলা ঃ "এ আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি অথবা অনুগ্রহ অস্বীকারকারী হয়ে যাই" — এমন এক অবস্থায় এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা হলে তবেই যথাযথ হতে পারে। অন্যথায় যদি ঘটনা এমনটিই হতো, তাঁর একজন চালাক-চতুর ও করিতকর্মা কর্মচারী রাণীর জন্য অতিদ্রুত একটি সিংহাসন তৈরি করে বা তৈরি করিয়ে নিয়ে আসতো, তাহলে বলা নিষ্প্রয়োজন যে তা এমন কোন অভিনব ব্যাপার হতো না যে, এ জন্য হযরত সুলাইমান বে এখতিয়ার هَـٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي (এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ) বলে চিৎকার করে উঠতেন এবং তাঁর মনে আশংকা জাগতো যে, এত দ্রুত সম্মানীয় অতিথির জন্য সিংহাসন তৈরি হবার কারণে আমি আবার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে তাঁর নিয়ামত অস্বীকারকারী হয়ে যাই। সামান্য এতটুকু ঘটনায় একজন মু'মিন শাসনকর্তার এত বেশী অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হয়ে যাবার কী এমন আশংকা হতে পারে, বিশেষ করে যখন তিনি একজন সাধারণ ও মামুলি পর্যায়ের মু'মিন নন বরং আল্লাহর নবী?

এরপর যে প্রশ্নটির নিষ্পত্তি বাকী থাকে তা এই যে, চোখের পলক ফেলতেই দেড় হাজার মাইল দূর থেকে একটি সিংহাসন কেমন করে উঠে এলো? এর সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে, স্থান-কাল এবং বস্তু ও গতি সম্পর্কে যে ধারণা আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তৈরী করে রেখেছি সেসবের যাবতীয় সীমারেখা কেবল মাত্র আমাদের নিজেদের জন্যই সংগত। আল্লাহর জন্য এসব ধারণা সঠিক নয় এবং তিনি এসব সীমানার মধ্যে আবদ্ধও নন। তিনি নিজের অসীম ক্ষমতাবলে একটি নিতান্ত মামুলি সিংহাসন তো দূরের কথা সূর্য এবং তার চাইতেও বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্রকেও মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করাতে পারেন। যে আল্লাহর একটি মাত্র হুকুমে এ বিশাল বিশ্ব-জগতের জন্ম হয়েছে। তাঁর সামান্য একটি ইশারায়ই সাবার রাণীর সিংহাসনকে আলোকের গতিতে চালিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ তাঁর

এক বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক রাতে মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়েও এনেছিলেন, একথা তো কুরআনেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৯. অর্থাৎ তিনি কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মুখাপেক্ষী নন। কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ফলে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সামান্য পরিমাণও বৃদ্ধি পায় না আবার কারো অকৃতজ্ঞতার ফলে তাতে এক চুল পরিমাণ কমতিও হয় না। তিনি নিজস্ব শক্তি বলে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে যাচ্ছেন। বান্দাদের মানা না মানার ওপর তাঁর খোদায়ী কর্তৃত্ব নির্ভরশীল নয়। কুরআন মজীদে একথাটিই এক জায়গায় হযরত মূসার মুখ দিয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে :

إِنْ تَكْفُرُوٓا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا فَإِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ –

"যদি তোমরা এবং সারা দুনিয়াবাসীরা মিলে কুফরী করো তাহলেও তাতে আল্লাহর কিছু এসে যায় না এবং আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত।" (ইবরাহীম, ৮)

সহীহ মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদীসে কুদসীতেও এ একই বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে :

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا عِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَازَادَ ذَالِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا – يَا عِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَالِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا – يَا عِبَادِىْ اِنَّمَا هِىَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا – فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَالِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهٗ –

"মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দারা যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হয়ে যাও, তাহলে তার ফলে আমার বাদশাহী ও শাসন কর্তৃত্বে কিছুমাত্র বৃদ্ধি ঘটে না। হে আমার বান্দারা! যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে বেশী বদকার ব্যক্তিটির হৃদয়ের মতো হয়ে যাও, তাহলে এর ফলে আমার বাদশাহীতে কোন কমতি দেখা যাবে না। হে আমার বান্দারা! এগুলো তোমাদের নিজেদেরই কর্ম, তোমাদের হিসেবের খাতায় আমি এগুলো গণনা করি, তারপর এগুলোর পুরোপুরি প্রতিদান আমি তোমাদের দিয়ে থাকি। কাজেই যার ভাগ্যে কিছু কল্যাণ এসেছে তার আল্লাহর শোকরগুজারী করা উচিত এবং যে অন্যকিছু লাভ করেছে তার নিজেকে ভর্ৎসনা করা উচিত।"

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾

সুলাইমান[৫০] বললো, "সে চিনতে না পারে এমনভাবে সিংহাসনটি তার সামনে রেখে দাও, দেখি সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় কিনা অথবা যারা সঠিক পথ পায় না তাদের অন্তরভুক্ত হয়।"[৫১] রাণী যখন হাজির হলো, তাকে বলা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলতে লাগলো, "এ তো যেন সেটিই।[৫২] আমরা তো আগেই জেনেছিলাম এবং আমরা আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছিলাম। (অথবা আমরা মুসলিম হয়ে গিয়েছিলাম।)"[৫৩] আল্লাহর পরিবর্তে যেসব উপাস্যের সে পূজা করতো তাদের পূজাই তাকে ঈমান আনা থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। কারণ সে ছিল একটি কাফের জাতির অন্তরভুক্ত।[৫৪]

৫০. রাণী কিভাবে বাইতুল মাকদিসে পৌঁছে গেলেন এবং কিভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো সে ঘটনা মাঝখানে উহ্য রাখা হয়েছে। এ ঘটনার কথা আলোচনা না করে এবার এখানে যখন তিনি হযরত সুলাইমানের সাথে সাক্ষাত করার জন্য তাঁর মহলে পৌঁছে গেলেন তখনকার কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

৫১. তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য। এর অর্থ হচ্ছে, হঠাৎ তিনি স্বদেশ থেকে এত দূরে নিজের সিংহাসন দেখে একথা বুঝতে পারেন কি না যে এটা তাঁরই সিংহাসন এবং এটা উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। আবার এ বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে তিনি সত্য–সঠিক পথের সন্ধান পান অথবা নিজের ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করতে থাকেন কি না— এ অর্থও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে।

যারা বলেন, হযরত সুলাইমান (আ) এ সিংহাসন হস্তগত করতে চাচ্ছিলেন, এ থেকে তাদের ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়। এখানে তিনি নিজেই প্রকাশ করছেন, রাণীকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্যই তিনি এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

৫২. এথেকে তাদের চিন্তার ভ্রান্তিও প্রমাণিত হয়, যারা ঘটনাটিকে কিছুটা এভাবে চিত্রিত করেছেন যেন হযরত সুলাইমান তাঁর সম্মানীয় মেহমানের জন্য একটি সিংহাসন তৈরি করতে চাচ্ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি টেণ্ডার তলব করলেন। একজন বলিষ্ঠ সুঠামদেহী কারিগর কিছু বেশী সময় নিয়ে সিংহাসন তৈরি করে দেবার প্রস্তাব দিল। কিন্তু অন্য একজন পারদর্শী ওস্তাদ কারিগর বললো, আমি অতি দ্রুত অতি অল্প সময়ের মধ্যে

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۗ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾

তাকে বলা হলো, প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করো। যেই সে দেখলো মনে করলো বুঝি কোন জলাধার এবং নামার জন্য নিজের পায়ের নিম্নাংশের বস্ত্র উঠিয়ে নিল। সুলাইমান বললো, এতো কাঁচের মসৃণ মেঝে।[৫৫] একথায় সে বলে উঠলো, "হে আমার রব! (আজ পর্যন্ত) আমি নিজের ওপর বড়ই জুলুম করে এসেছি এবং এখন আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আনুগত্য গ্রহণ করছি।"[৫৬]

দেখতে না দেখতেই তৈরি করে দিচ্ছি। একটি মাত্র কথাই এসব জল্পনা–কল্পনার অবসান ঘটাতে সক্ষম সেটি এই যে, হযরত সুলাইমানের, (আ) নিজেই রানীর সিংহাসনটিই আনার কথা বলেছিলেন (اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসনটি আমার কাছে এনে দিতে পারে?) সিংহাসনটি নিয়ে আসার পর তিনি তারই সিংহাসন অপরিচিত পদ্ধতিতে তারই সামনে উপস্থাপিত করার জন্য কর্মচারীদেরকে হুকুম দিয়েছিলেন نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا । তারপর যখন তিনি এলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সিংহাসন কি এ রকম (اَهٰكَذَا عَرْشُكِ) ? তিনি জাববে বললেন, এটা যেন সেটাই (كَاَنَّهٗ هُوَ) । এ ধরনের সুস্পষ্ট বর্ণনার উপস্থিতিতে ঐসব জল্পনা কল্পনার অবকাশ কোথায়? এরপরও যদি কারো সন্দেহ থাকে তাহলে পরবর্তী বাক্য তাঁকে নিশ্চিন্ত করার জন্য যথেষ্ট।

৫৩. অর্থাৎ এ মু'জিযা দেখার আগেই সুলাইমান আলাইহিস সালামের যেসব গুণাবলী ও বিবরণ আমরা জেনেছিলাম তার ভিত্তিতে আমাদের বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, তিনি নিছক একটি রাজ্যের শাসনকর্তা নন বরং আল্লাহর একজন নবী। যদি এটা মনে করে নেয়া হয় যে, হযরত সুলাইমান (আ) তার জন্য একটি সিংহাসন তৈরী করে রেখে দিয়েছিলেন, তাহলে সিংহাসন দেখার এবং "যেন এটা সেটাই" বলার পর এ বাক্যটি জুড়ে দেয়ার কি স্বার্থকতা থাকে? ধরে নেয়া যাক, যদি রাণীর সিংহাসনের অনুরূপ ঐ সিংহাসনটি তৈরী করা হয়ে থাকে তাহলেও তার মধ্যে এমন কি মাহাত্ম ছিল যার ফলে একজন সূর্য পূজারিনী রাণী তা দেখে বলে উঠলেন اُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ "আমাদের আগেই এ জ্ঞানলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল এবং আমরা মুসলিম হয়ে গিয়ে ছিলাম।"

৫৪. এ বাক্যাংশটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর অবস্থান সুস্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে জিদ ও একগুয়েমী ছিল না। শুধুমাত্র কাফের জাতির মধ্যে জন্ম নেয়ার কারণেই তিনি তখনো পর্যন্ত কাফের ছিলেন। সচেতন বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হবার পর থেকেই যে জিনিসের সামনে সিজদানত হবার অভ্যাস তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল সেটিই

ছিল তার পথের প্রতিবন্ধক। হযরত সুলাইমানের (আ) মুখোমুখি হবার পর যখন তার চোখ খুলে তখন এ প্রতিবন্ধক দূর হতে এক মুহূর্তও দেরী হয়নি।

৫৫. এটি ছিল রাণীর সামনে প্রকৃত সত্য উদঘাটনকারী সর্বশেষ উপকরণ। প্রথম উপকরণটি ছিল হযরত সুলাইমানের পত্র। সাধারণ বাদশাহী রীতি এড়িয়ে আল্লাহ রহমানুর রহীমের নামে তা শুরু করা হয়েছিল। দ্বিতীয় উপকরণটি ছিল মূল্যবান উপহার সামগ্রী প্রত্যাখ্যান। এ থেকে রাণী বুঝতে পারলেন যে, ইনি এক অসাধারণ রাজা। তৃতীয় উপকরণটি ছিল রাণীর দূতের বর্ণনা। এ থেকে তিনি হযরত সুলাইমানের তাকওয়া ভিত্তিক জীবন, তাঁর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং তাঁর সত্যের দাওয়াত সম্পর্কে অবহিত হন। এ জিনিসটিই তাঁকে অগ্রণী হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজের একটি উক্তির মাধ্যমে তিনি এদিকেই ইংগিত করেন। এ উক্তিতে তিনি বলেন ঃ আমরা তো আগেই জেনেছিলাম এবং আমরা মুসলিম হয়ে গিয়েছিলাম। চতুর্থ উপকরণটি ছিল এ মহান মূল্যবান সিংহাসনটির মুহূর্তকালের মধ্যে মায়ারিব থেকে বাইতুল মাকদিসে পৌঁছে যাওয়া। এর ফলে রাণী জানতে পারেন এ ব্যক্তির পেছনে সর্বশক্তিমান আল্লাহর শক্তি রয়েছে। আর এখন সর্বশেষ উপকরণটি ছিল এই যে, রাণী দেখলেন যে ব্যক্তি এহেন আরাম আয়েশ ও পার্থিব ভোগের সামগ্রীর অধিকারী এবং এমন নয়নাভিরাম ও জাঁকালো প্রাসাদে বাস করেন তিনি আত্মগরিমা ও আত্মম্ভরিতা থেকে কত দূরে অবস্থান করেন, তিনি কেমন আল্লাহকে ভয় করেন, কেমন সৎ হৃদয়বৃত্তির অধিকারী, কেমন কথায় কথায় কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর সামনে মাথা নত করে দেন এবং পৃথিবী পূজারী লোকদের জীবন থেকে তার জীবন কত ভিন্নতর। এ জিনিসই এমন সব কথা তাঁর মুখ থেকে উচ্চারণ করতে তাঁকে বাধ্য করেছিল, যা সামনের দিকে তাঁর মুখ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৫৬. হযরত সুলাইমান (আ) ও সাবার রাণীর এ কাহিনী বাইবেলের পুরাতন ও নূতন নিয়মে এবং ইহুদী বর্ণনাবলীতে সব জায়গায় বিভিন্ন ভংগীতে এসেছে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা এদের সবার থেকে আলাদা। পুরাতন নিয়মে এ কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

"আর শিবার রাণী সদাপ্রভুর নামের পক্ষে শলোমনের কীর্তি শুনিয়া গূঢ়বাক্য দ্বারা তাঁহার পরীক্ষা করিতে আসিলেন। তিনি অতি বিপুল ঐশ্বর্যসহ, সুগন্ধি দ্রব্য, অতি বিস্তর স্বর্ণ ও মণিবাহক উষ্ট্রগণ সংগে লইয়া যিরুশালেমে আসিলেন, এবং শলোমনের নিকটে আসিয়া নিজের মনে যাহা ছিল, তাঁহাকে সমস্তই কহিলেন। আর শলোমন তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিলেন;.....................এই প্রকারে শিবার রাণী শলোমনের সমস্ত জ্ঞান ও তাঁহার নির্মিত গৃহ, এবং তাঁহার মেজের খাদ্য দ্রব্য ও তাঁহার সেবকদের উপবেশন ও দণ্ডায়মান পরিচারকদের শ্রেণী ও তাহাদের পরিচ্ছদ এবং তাঁহার পানপাত্র বাহকগণ ও সদাপ্রভুর গৃহে উঠিবার জন্য তাঁহার নির্মিত সোপান, এই সকল দেখিয়া হত জ্ঞান হইলেন। আর তিনি রাজাকে কহিলেন, আমি আপন দেশে থাকিয়া আপনার বাক্য ও জ্ঞানের বিষয় যেকথা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য। কিন্তু আমি যাবৎ আসিয়া স্বচক্ষে না দেখিলাম, তাবৎ সেই কথায় আমার বিশ্বাস হয় নাই; আর দেখুন, অর্ধেকও আমাকে বলা হয় নাই; আমি যে খ্যাতি শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতেও আপনার জ্ঞান ও মঙ্গল অধিক। ধন্য আপনার লোকেরা, ধন্য আপনার

এই দাসেরা, যাহারা নিয়ত আপনার সম্মুখে দাঁড়ায়, যাহারা আপনার জ্ঞানের উক্তি শুনে। ধন্য আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি আপনাকে ইসরাঈলের সিংহাসনে বসাইবার জন্য আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন............পরে তিনি বাদশাহকে একশত বিশ তালন্ত স্বর্ণ ও অতি প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ও মণি উপঢৌকন দিলেন, শিবার রাণী শলোমন রাজাকে যত সুগন্ধি দ্রব্য দিলেন, তত প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য আর কখনো আসে নাই।........আর শলোমন রাজা শিবার রাণীর বাসনা অনুসারে তাঁহার যাবতীয় বাঞ্ছিত দ্রব্য দিলেন, তাহা ছাড়া শলোমন আপন রাজকীয় দানশীলতা অনুসারে তাঁহাকে আরও দিলেন। পরে তিনি ও তাঁহার দাসগণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।" (১–রাজাবলী ১০ঃ১–১৩ প্রায় একই বিষয়বস্তু সম্বলিত কথা ২–বংশাবলী ৯ঃ১–১২ তেও এসেছে।)

নতুন নিয়মে হযরত ঈসার ভাষণের শুধুমাত্র একটি বাক্য সাবার রাণী সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"দক্ষিণ দেশের রাণী বিচারে এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবেন; কেননা শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন, আর দেখ শলোমন হইতে মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন।" (মথি ১২ঃ৪২ এবং লুক ১১ঃ৩১)

ইহুদী রব্বীরা হযরত সুলাইমান ও সাবার রাণীর যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তার বেশীর ভাগ বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের সাথে মিলে যায়। হুদ্‌হুদ পাখির অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, তারপর ফিরে এসে তার সাবার রাণীর অবস্থা বর্ণনা করা, তার মাধ্যমে হযরত সুলাইমানের পত্র পাঠানো, হুদ্‌হুদের পত্রটি ঠিক তখনই রাণীর সামনে ফেলে দেয়া যখন তিনি সূর্য পূজা করতে যাচ্ছিলেন, পত্রটি দেখে রাণীর মন্ত্রীপরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠান করা, তারপর রাণীর একটি মূল্যবান উপঢৌকন সুলাইমানের কাছে পাঠানো, নিজে জেরুসালেমে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করা, তাঁর সুলাইমানের মহলে এসে বাদশাহ জলাধারের মধ্যে বসে আছেন বলে মনে করা এবং তাতে নেমে পড়ার জন্য নিজের পরণের কাপড় হাঁটুর কাছে উঠিয়ে নেয়া— এসব সে বর্ণনাগুলোতে কুরআনে যেমনি আছে ঠিক তেমনিভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু এ উপঢৌকন লাভ করার পর হযরত সুলাইমানের জবাব, রাণীর সিংহাসন উঠিয়ে আনা, প্রত্যেকটি ঘটনায় তাঁর আল্লাহর সামনে মাথা নত করা এবং সবশেষে তাঁর হাতে রাণীর ঈমান আনা—এসব কথা এমনকি আল্লাহর আনুগত্য ও তাওহীদের সমস্ত কথাই এ বর্ণনাগুলোতে অনুপস্থিত। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে, এই জালেমরা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে, তিনি সাবার রাণীর সাথে নাউযুবিল্লাহ ব্যভিচার করেন। আর এর ফলে যে জারজ সন্তানটি জন্মলাভ করে সে–ই হয় পরবির্তীকালে বাইতুল মাকদিস ধ্বংসকারী ব্যবিলনের বাদশাহ বখ্‌তে নাস্‌সার। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপিডিয়া, ১১ খণ্ড ৪৪৩ পৃষ্ঠা) আসল ব্যাপার হচ্ছে, ইহুদী আলেমদের একটি দল হযরত সুলাইমানের কঠোর বিরোধী ছিল। তারা তাঁর বিরুদ্ধে তাওরাতের বিধানের বিরুদ্ধাচরণ, রাষ্ট্র পরিচালনায় আত্মম্ভরিতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অহংকার, নারী আসক্তি, বিলাসী জীবন যাপন এবং শির্‌ক ও মূর্তি পূজার জঘন্য অভিযোগ এনেছেন। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপিডিয়া, ১১ খণ্ড, ৪৩৯–৪৪১ পৃষ্ঠা) এ প্রচারনার প্রভাবে বাইবেল তাঁকে নবীর পরিবর্তে নিছক একজন বাদশাহ হিসেবেই উল্লেখ করেছে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾

৪ রুকূ'

আর আমি[৫৭] সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে (এ পয়গাম সহকারে) পাঠালাম যে, আল্লাহর বন্দেগী করো এমন সময় সহসা তারা দু'টি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে গেলো।[৫৮] সালেহ বললো, "হে আমার জাতির লোকেরা! ভালোর পূর্বে তোমরা মন্দকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো কেন?[৫৯] আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাচ্ছো না কেন? হয়তো তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে।"

আবার বাদশাহও এমন যিনি নাউযুবিল্লাহ আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ মুশরিক মেয়েদের প্রেমে মত্ত হয়ে গেছেন। যাঁর অন্তর আল্লাহ বিমুখ হয়ে গেছে এবং যিনি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য মাবুদদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। (১ রাজাবলী ১১ঃ ১-১১) এসব দেখে বুঝা যায় কুরআন বনী ইসরাঈলদের প্রতি কত বড় অনুগ্রহ করেছে। নিজেদের জাতীয় মনীষীদের জীবন ও চরিত্রকে তারা নিজেরাই কলূষিত করেছে এবং কুরআন সেই কলূষ কালিমা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। অথচ এ বনী ইসরাঈল কতই অকৃতজ্ঞ জাতি, এরপরও তারা কুরআন ও তার বাহককে নিজেদের সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করে।

৫৭. তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য সূরা আল আ'রাফের ৭৩ থেকে ৭৯, হূদের ৬১ থেকে ৬৮, আশ্ শু'আরার ৪১ থেকে ৫৯, আল কামারের ২৩ থেকে ৩২ এবং আশ্ শামসের ১১ থেকে ১৫ আয়াত পড়ুন।

৫৮. অর্থাৎ হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত শুরু হবার সাথে সাথেই তাঁর জাতি দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেলো। একটি দল মু'মিনদের এবং অন্যটি অস্বীকারকারীদের এ বিভক্তির সাথে সাথেই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতও শুরু হয়ে গেলো। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ○ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ -

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾

তারা বললো, "আমরা তো তোমাকে ও তোমার সাথিদেরকে অমংগলের নিদর্শন হিসেবে পেয়েছি।"৬০ সালেহ জবাব দিল, তোমাদের মংগল অমংগলের উৎস তো আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ, আসলে তোমাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।"৬১

"তার জাতির শ্রেষ্ঠত্বের গর্বে গর্বিত সরদাররা দলিত ও নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বললো, সত্যই কি তোমরা জানো, সালেহ তার রবের পক্ষ থেকে পাঠানো একজন নবী? তারা জবাব দিল, তাকে যে জিনিস সহকারে পাঠানো হয়েছে আমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান রাখি। এ অহংকারীরা বললো, তোমরা যে জিনিসের প্রতি ঈমান এনেছো আমরা তা মানি না।" (আ'রাফ ৭৫–৭৬ আয়াত)

মনে রাখতে হবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সাথে সাথে মক্কায়ও এ একই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তখনও জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল এবং সাথে সাথেই তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই যে অবস্থার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল তার সাথে এ কাহিনী আপনা থেকেই খাপ খেয়ে যাচ্ছিল।

৫৯. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে কল্যাণ চাওয়ার পরিবর্তে অকল্যাণ চাওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছো কেন? অন্য জায়গায় সালেহের জাতির সরদারদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে :

يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ –

"হে সালেহ! আনো সেই আযাব আমাদের ওপর, যার হুমকি তুমি আমাদের দিয়ে থাকো, যদি সত্যি তুমি রসূল হয়ে থাকো।" (আল আ'রাফ : ৭৭)

৬০. তাদের উক্তির একটি অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমার এ আন্দোলন আমাদের জন্য বড়ই অমংগলজনক প্রমাণিত হয়েছে। যখন থেকে তুমি ও তোমার সাথীরা পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছো তখন থেকেই নিত্যদিন আমাদের ওপর কোন না কোন বিপদ আসছে। কারণ আমাদের উপাস্যরা আমাদের প্রতি নারাজ হয়ে গেছে। এ অর্থের দিক দিয়ে আলোচ্য উক্তিটি সেই সব মুশরিক জাতির উক্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল, যারা নিজেদের নবীদেরকে অপয়া গণ্য করতো। সূরা ইয়াসীনে একটি জাতির কথা বলা হয়েছে। তারা তাদের নবীদেরকে বললো : اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ "আমরা তোমাদের অপয়া পেয়েছি" (১৮ আয়াত) হযরত মূসা সম্পর্কে ফেরাউনের জাতি এ কথাই বলতো :

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ –

"যখন তাদের সুসময় আসতো, তারা বলতো আমাদের এটাই প্রাপ্য এবং যখন কোন বিপদ আসতো তখন মুসা ও তার সাথিদের কুলক্ষুণে হওয়াটাকে এ জন্য দায়ী মনে করতো।" (আল আ'রাফঃ ১৩০ আয়াত)

প্রায় একই ধরনের কথা মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেও বলা হতো।

এ উক্তিটির দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমার আসার সাথে সাথেই আমাদের জাতির মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে। পূর্বে আমরা ছিলাম এক জাতি। এক ধর্মের ভিত্তিতে আমরা সবাই একত্র সংঘবদ্ধ ছিলাম। তুমি এমন অপয়া ব্যক্তি এলে যে, তোমার আসার সাথে সাথেই ভাই-ভাইয়ের দুশমন হয়ে গেছে এবং পুত্র-পিতা থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এভাবে জাতির মধ্যে আর একটি নতুন জাতির উত্থানের পরিণাম আমাদের চোখে ভালো ঠেকছে না। এ অভিযোগটিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে বারবার পেশ করতো। তাঁর দাওয়াতের সূচনাতেই কুরাইশ সরদারদের যে প্রতিনিধি দলটি আবু তালেবের নিকট এসেছিল তারা এ কথাই বলেছিল ঃ "আপনার এ ভাতিজাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন। সে আপনার ও আপনার বাপদাদার ধর্মের বিরোধিতা করছে, আপনার জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং সমগ্র জাতিকে বেকুব গণ্য করেছে।" ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা) হজ্জের সময় মক্কার কাফেরদের যখন আশংকা হলো যে, বাইরের যিয়ারতকারীরা এসে যেন আবার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে যেতে পারে। তখন তারা পরস্পর পরামর্শ করার পর আরব গোত্রগুলোকে একথা বলার সিদ্ধান্ত নেয় ঃ

"এ ব্যক্তি একজন যাদুকর। এর যাদুর প্রভাবে পুত্র-পিতা থেকে, ভাই-ভাই থেকে, স্ত্রী-স্বামী থেকে এবং মানুষ তার সমগ্র পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।" (ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড ২৮৯ পৃষ্ঠা)

৬১. অর্থাৎ তোমরা যা মনে করছো আসল ব্যাপার তা নয়। আসল ব্যাপারটি তোমরা এখনো বুঝতে পারোনি। সেটি হচ্ছে, আমার আসার ফলে তোমাদের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। যতদিন আমি আসিনি ততদিন তোমরা নিজেদের মূর্খতার পথে চলছিলে। তোমাদের সামনে হক ও বাতিলের কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য-রেখা ছিল না। ভেজাল ও নির্ভেজাল যাচাই করার কোন মানদণ্ড ছিল না। অত্যধিক নিকৃষ্ট লোকেরা উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল এবং সবচেয়ে ভালো যোগ্যতা সম্পন্ন লোকেরা মাটিতে মিশে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন একটি মানদণ্ড এসে গেছে। তোমাদের সবাইকে এখানে যাচাই ও পরখ করা হবে। এখন মাঠের মাঝখানে একটি তুলাদণ্ড রেখে দেয়া হয়েছে। এ তুলাদণ্ড প্রত্যেককে তার ওজন অনুযায়ী পরিমাপ করবে। এখন হক ও বাতিল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। যে হককে গ্রহণ করবে সে ওজনে ভারী হয়ে যাবে, চাই এ যাবত তার মূল্য কানাকড়িও না থেকে থাকুক। আর যে বাতিলের ওপর অবিচল থাকবে তার ওজন এক রত্তিও হবে না। চাই এ যাবত সে সর্বোচ্চ নেতার পদেই অধিষ্ঠিত থেকে থাকুক না কেন। কে কোন্ পরিবারের লোক, কার সহায় সম্পদ কি পরিমাণ আছে এবং কে কতটা শক্তির অধিকারী তার ভিত্তিতে এখন আর কোন ফায়সালা হবে না। বরং কে সোজাভাবে সত্যকে গ্রহণ করে এবং কে মিথ্যার সাথে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে দেয়- এরি ভিত্তিতে ফায়সালা হবে।

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٨﴾ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ أَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٣﴾

সে শহরে ছিল ন'জন দল নায়ক[৬২] যারা দেশের বিপর্যয় সৃষ্টি করতো এবং কোন গঠনমূলক কাজ করতো না। তারা পরস্পর বললো, "আল্লাহর কসম খেয়ে শপথ করে নাও, আমরা সালেহ ও তার পরিবার পরিজনদের ওপর নৈশ আক্রমণ চালাবো এবং তারপর তার অভিভাবককে[৬৩] বলে দেবো আমরা তার পরিবারের ধ্বংসের সময় উপস্থিত ছিলাম না, আমরা একদম সত্য কথা বলছি।"[৬৪] এ চক্রান্ত তো তারা করলো এবং তারপর আমি একটি কৌশল অবলম্বন করলাম, যার কোন খবর তারা রাখতো না।[৬৫] অবশেষে তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হলো দেখে নাও। আমি তাদেরকে এবং তাদের সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে দিলাম। ঐ যে তাদের গৃহ তাদের জুলুমের কারণে শূন্য পড়ে আছে, তার মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষনীয় নিদর্শন যারা জ্ঞানবান তাদের জন্যে।[৬৬] আর যারা ঈমান এনেছিল এবং নাফরমানী থেকে দূরে অবস্থান করতো তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।

৬২. অর্থাৎ ন'জন উপজাতীয় সরদার। তাদের প্রত্যেকের সাথে ছিল একটি বিরাট দল।

৬৩. অর্থাৎ হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের গোত্রের সরদারকে। প্রাচীন গোত্রীয় রেওয়াজ অনুযায়ী তাঁকে হত্যা করার বিরুদ্ধে তাঁর গোত্রীয় সরদারেরই রক্তের দাবী পেশ করার অধিকার ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় তার চাচা আবু তালেবেরও এ একই অধিকার ছিল। কুরাইশ বংশীয় কাফেররাও এ আশংকায় পিছিয়ে আসতো যে, যদি তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করে ফেলে তাহলে বনু হাশেমের সরদার আবু তালেব নিজের গোত্রের পক্ষ থেকে তাঁর খুনের বদলা নেবার দাবী নিয়ে এগিয়ে আসবে।

৬৪. হুবহু এ একই ধরনের চক্রান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে করার জন্য মক্কার গোত্রীয় সরদাররা চিন্তা করতো। অবশেষে হিজরতের সময় তারা নবীকে (সা) হত্যা করার জন্য এ চক্রান্ত করলো। অর্থাৎ তারা সব গোত্রের লোক একত্র হয়ে তাঁর ওপর হামলা করবে। এর ফলে বনু হাশেম কোন একটি বিশেষ গোত্রকে অপরাধী গণ্য করতে পারবে না এবং সকল গোত্রের সাথে একই সংগে লড়াই করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

৬৫. অর্থাৎ তারা নিজেদের স্থিরীকৃত সময়ে হযরত সালেহের ওপর নৈশ আক্রমণ করার পূর্বেই আল্লাহ তাঁর আযাব নাযিল করলেন এবং এর ফলে কেবলমাত্র তারা নিজেরাই নয় বরং তাদের সমগ্র সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেলো। মনে হয়, উটনীর পায়ের রগ কেটে ফেলার পর তারা এ চক্রান্তটি করেছিল। সূরা হূদে বলা হয়েছে, যখন তারা উটনীকে মেরে ফেললো তখন হযরত সালেহ তাদেরকে নোটিশ দিলেন। তাদেরকে বললেন, ব্যস, আর মাত্র তিন দিন ফূর্তি করে নাও, তারপর তোমাদের ওপর আযাব এসে যাবে (فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ، ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ) একথায় সম্ভবত তারা চিন্তা করেছিল, সালেহের (আ) কথিত আযাব আসুক বা না আসুক আমরা উটনীর সাথে তারও বা দফা রফা করে দিই না কেন। কাজেই খুব সম্ভবত নৈশ আক্রমণ করার জন্য তারা সেই রাতটিই বেছে নেয়, যে রাতে আযাব আসার কথা ছিল এবং হযরত সালেহের গায়ে তারা হাত দেবার আগেই আল্লাহর জবরদস্ত হাত তাদেরকে পাকড়াও করে ফেললো।

৬৬. অর্থাৎ মূর্খদের ব্যাপার আলাদা। তারা তো বলবে, সামূদ জাতি যে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয় তার সাথে হযরত সালেহ ও তাঁর উটনীর কোন সম্পর্ক নেই। এসব তো প্রাকৃতিক কারণে হয়ে থাকে। এ এলাকায় কে সৎকাজ করতো এবং কে অসৎকাজ করতো আর কে কার ওপর জুলুম করেছিল এবং কে করেছিল অনুগ্রহ, ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসার ওপর এসব বিষয়ের কোন দখল নেই। অমুক শহর বা অমুক এলাকা ফাসেকী ও অশ্লীল কার্যকলাপে ভরে গিয়েছিল তাই সেখানে বন্যা এসেছিল বা ভূমিকম্প দ্বারা সে এলাকাটিকে ওলট পালট করে দেয়া হয়েছিল। কিংবা কোন আকস্মিক মহা প্রলয় তাকে বিধ্বস্ত করেছিল, এসব নিছক ওয়াজ নসিহতকারীদের গালভরা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু চিন্তাশীল ও জ্ঞানবান লোক মাত্রই জানেন, কোন অন্ধ ও বধির আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানের ওপর রাজত্ব করছেন না বরং এক সর্বজ্ঞ ও পরম বিজ্ঞ সত্তা এখানে সকলের ভাগ্যের নিষ্পত্তি করছেন। তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ প্রাকৃতিক কার্যকারণের অধীন নয় বরং প্রাকৃতিক কার্যকারণসমূহ তাঁর ইচ্ছার অধীন। তিনি চোখ বন্ধ করে জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ফায়সালা করেন না বরং বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে করেন। একটি প্রতিদান ও প্রতিশোধের আইনও তাঁর আইনগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ আইনের দৃষ্টিতে নৈতিক ভিত্তিতে এ দুনিয়াতেও জালেমকে শাস্তি দেয়া হয়। এ সত্যগুলো সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিরা কখনো ঐ ভূমিকম্পকে প্রাকৃতিক কারণ প্রসূত বলে এড়িয়ে যেতে চাইবে না। তারা তাকে নিজেদের জন্য সতর্কীকরণ মূলক বেত্রাঘাত মনে করবে। তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। স্রষ্টা যেসব নৈতিক কারণের ভিত্তিতে নিজের সৃষ্ট একটি সমৃদ্ধ বিকাশমান জাতিকে ধ্বংস করে দেন তারা তার নৈতিক কারণসমূহ অনুধাবন করার

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَٰهَا مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾

আর[৬৭] লূতকে আমি পাঠালাম। স্মরণ করো তখনকার কথা যখন সে তার জাতিকে বললো, "তোমরা জেনে বুঝে বদকাম করছো?[৬৮] তোমাদের কি এটাই রীতি, কাম–তৃপ্তির জন্য তোমরা মেয়েদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাও? আসলে তোমরা ভয়ানক মূর্খতায় লিপ্ত হয়েছো।"[৬৯] কিন্তু সে জাতির এছাড়া আর কোন জবাব ছিল না যে, তারা বললো, "লূতের পরিবারবর্গকে তাদের নিজেদের জনপদ থেকে বের করে দাও, এরা বড় পাক–পবিত্র সাজতে চাচ্ছে।" শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে বাঁচিয়ে নিলাম তবে তার স্ত্রীকে নয়। কারণ তার পেছনে থেকে যাওয়াটাই আমি স্থির করে দিয়েছিলাম।[৭০] আর বর্ষণ করলাম তাদের ওপর একটি বৃষ্টি, বড়ই নিকৃষ্ট ছিল সেই বৃষ্টি যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্য।

চেষ্টা করবে। তারা নিজেদের কর্মনীতিকে এমন পথ থেকে সরিয়ে আনবে যে পথে আল্লাহর গযব আসে এবং এমন পথে তাকে পরিচালিত করবে যে পথে তাঁর রহমত নাযিল হয়।

৬৭. তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য দেখুন আল আ'রাফ ৮০ থেকে ৮৪, হূদ ৭৪ থেকে ৮৩, আল হিজর ৫৭ থেকে ৭৭, আল আম্বিয়া ৭১ থেকে ৭৫, আশ্‌ শু'আরা ১৬০ থেকে ১৭৪, আল আনকাবুত ২৮–৭৫, আস্‌ সাফ্‌ফাত ১৩৩ থেকে ১৩৮ এবং আল কামার ৩৩ থেকে ৩৯ আয়াত।

৬৮. এ উক্তির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। সম্ভবত এ সবগুলো অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক, এ কাজটি যে অশ্লীল ও খারাপ তা তোমরা জানো না এমন নয়। বরং জেনে বুঝে তোমরা এ কাজ করো। দুই, একথাটিও তোমাদের অজানা নেই যে, পুরুষের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য পুরুষকে সৃষ্টি করা হয়নি বরং এজন্য নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পুরুষ ও নারীর পার্থক্য এমন নয় যে, তা তোমাদের চোখে ধরা পড়ে না বরং তোমরা চোখে দেখেই এ জ্বলজ্যান্ত মাছি গিলে ফেলছো। তিন, তোমরা প্রকাশ্যে এ অশ্লীল কাজ করে

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ۗ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫ রুকূ'

(হে নবী!)[৭১] বলো, প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সালাম তাঁর এমনসব বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি নির্বাচিত করেছেন।

(তাদেরকে জিজ্ঞেস করো) আল্লাহ ভালো অথবা সেই সব মাবুদরা ভালো যাদেরকে তারা তাঁর শরীক করছে?[৭২]

যাচ্ছো। অন্যদিকে চক্ষুষ্মান লোকেরা তোমাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছে, যেমন সামনের দিকে সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে ঃ

وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ –

"আর তোমরা নিজেদের মজলিসে বদকাম করে থাকো" (২৯ আয়াত)

৬৯. মূলে জিহালত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এখানে নিবুর্দ্ধিতা ও বোকামি। গালি গালাজ ও বেহুদা কাজ কারবার করলেও তাকে জাহেলী কাজ বলা হয়। আরবী ভাষাতে শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا (الفرقان : ٦٣)

কিন্তু যদি এ শব্দটিকে জ্ঞানহীনতা অর্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, তোমরা নিজেদের এ খারাপ কাজটির পরিণাম জানো না। তোমরা তো একথা জানো, তোমরা যা অর্জন করছো তা প্রবৃত্তিকে তৃপ্তি দান করে। কিন্তু তোমরা জানো না এ চরম অপরাধমূলক ও জঘন্য ভোগ লিপ্সার জন্য শীঘ্রই তোমাদের কেমন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহর আযাব তোমাদের ওপর অতর্কিতে নেমে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে। অথচ তোমরা পরিণামের কথা না ভেবে নিজেদের এ জঘন্য খেলায় মত্ত হয়ে আছো।

৭০. অর্থাৎ পূর্বেই হযরত লূতকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তিনি যেন এ মহিলাকে নিজের সহযোগী না করেন। কারণ তার নিজের জাতির সাথেই তাকে ধ্বংস হতে হবে।

৭১. এখান থেকে দ্বিতীয় ভাষণ শুরু হচ্ছে। এ বাক্যটি হচ্ছে তার ভূমিকা। এ ভূমিকার মাধ্যমে মুসলমানরা কিভাবে তাদের বক্তৃতা শুরু করবে তা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এরি ভিত্তিতেই সঠিক ইসলামী চিন্তা ও মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা সব সময় আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর সৎ বান্দাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার দোয়া করে তাদের বক্তৃতা শুরু করে থাকেন। কিন্তু আজকাল একে মোল্লাকী মনে করা হয়ে থাকে। এবং এ যুগের মুসলিম বক্তারা তো এর মাধ্যমে বক্তৃতা শুরু করার কথা কল্পনাই করতে পারেন না অথবা এভাবে বক্তৃতা শুরু করতে তারা লজ্জা অনুভব করেন।

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

কে তিনি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন তারপর তার সাহায্যে সুদৃশ্য বাগান উৎপাদন করেছেন, যার গাছপালা উৎপন্ন করাও তোমাদের আয়ত্বাধীন ছিল না? আল্লাহর সাথে কি (এসব কাজে অংশীদার) অন্য ইলাহও আছে?[৭৩] (না,) বরং এরাই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এগিয়ে চলছে।

৭২. আল্লাহ ভালো না এসব মিথ্যা মাবুদ ভালো, এ প্রশ্নটি আপাত দৃষ্টিতে বড়ই অদ্ভুত মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা উপাস্যদের মধ্যে তো আদৌ কোন ভালাই নেই যে, আল্লাহর সাথে তাদের তুলনা করা যেতে পারে। মুশরিকরাও আল্লাহর সাথে এ উপাস্যদের তুলনা করা যেতে পারে এমন কথা ভাবতো না। কিন্তু তারা যাতে নিজেদের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয় সেজন্য এ প্রশ্ন তাদের সামনে রাখা হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজ করে না যতক্ষণ না সে তার নিজের দৃষ্টিতে তার মধ্যে কোন কল্যাণ বা লাভের সন্ধান পায় এখন এ মুশরিকরা আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে ঐ উপাস্যদের ইবাদাত করতো, আল্লাহর পরিবর্তে তাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য দোয়া করতো এবং তাদের সামনে নজরানা পেশ করতো। অথচ ঐ উপাস্যদের মধ্যে যখন কোন কল্যাণ নেই তখন তাদের এসব করার কোন অর্থই ছিল না। তাই তাদের সামনে পরিষ্কার ভাষায় এ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, বলো, আল্লাহ ভালো না তোমাদের ঐসব উপাস্যরা? কারণ এ দ্ব্যর্থহীন প্রশ্নের সম্মুখীন হবার হিম্মত তাদের ছিল না। তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে কট্টর মুশরিকও একথা বলার সাহস করতে পারতো না যে, আমাদের উপাস্যরা ভালো। আর আল্লাহ ভালো একথা মেনে নেবার পর তাদের ধর্মের পুরো ভিত্তিটাই ধ্বসে পড়তো, কারণ এরপর ভালোকে বাদ দিয়ে মন্দকে গ্রহণ করা পুরোপুরি অযৌক্তিক হয়ে দাঁড়াতো।

এভাবে কুরআন তার ভাষণের প্রথম বাক্যেই বিরোধীদেরকে লা জবাব ও অসহায় করে দিয়েছে। এরপর এখন আল্লাহর শক্তিমত্তা এবং তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি বৈচিত্রের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, এটা কার কাজ বলো? আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহও কি এ কাজে শরীক আছে? যদি না থেকে থাকে তাহলে তোমরা এই যাদেরকে উপাস্য করে রেখেছো এদের কি স্বার্থকতা আছে?

হাদীসে বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন তখন সংগে সংগেই এর জবাবে বলতেন ঃ

بَلِ اللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى وَاَجَلُّ وَّاَكْرَمُ –

"বরং আল্লাহই ভালো এবং তিনিই চিরস্থায়ী, মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ।"

৭৩. মুশরিকদের একজনও একথার জবাবে বলতে পারতো না, একাজ আল্লাহর নয়, অন্য কারো অথবা আল্লাহর সাথে অন্য কেউ তাঁর একাজে শরীক আছে। কুরআন মজীদে অন্যান্য স্থানে মক্কার কাফের সমাজ ও আরব মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ –

"যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, পৃথিবী ও আকাশসমূহ কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, মহা পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী সত্তাই এসব সৃষ্টি করেছেন।"

(আয্‌ যুখরুফ ঃ ৯)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ –

"আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। (আয্‌ যুখরুক–৮৭)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ –

"আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছে এবং মৃত পতিত জমি কে জীবিত করেছে? তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ।"

(আনকাবুতঃ ৬৩ আয়াত)

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ .... وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ –

"তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করেন? এ শ্রবণ ও দর্শনের শক্তি কার নিয়ন্ত্রণাধীন? কে সজীবকে নির্জীব এবং নির্জীবকে সজীব করেন? কে এ বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন? তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ। (ইউনুস ঃ ৩১ আয়াত)

আরবের মুশরিকরা এবং সারা দুনিয়ার মুশরিকরা সাধারণত একথা স্বীকার করতো এবং আজো স্বীকার করে যে, আল্লাহই বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা এবং বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনাকারী। তাই কুরআন মজীদের এ প্রশ্নের জবাবে তাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি নিতান্ত হঠকারিতা ও গোয়ার্তমীর আশ্রয় নিয়েও নিছক বিতর্কের খাতিরেও বলতে পারতো না যে, আমাদের উপাস্য দেবতারা আল্লাহর সাথে এসব কাজে শরীক আছে। কারণ যদি তারা

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾

আর তিনি কে, যিনি পৃথিবীকে করেছেন অবস্থানলাভের উপযোগী[৭৪] এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদ–নদী এবং তার মধ্যে গেড়ে দিয়েছেন (পর্বতমালার) পেরেক, আর পানির দু'টি ভাণ্ডারের মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করে দিয়েছেন।[৭৫] আল্লাহর সাথে (এসব কাজে শরীক) অন্য কোন ইলাহ আছে কি? না, বরং এদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

একথা বলতো তাহলে তাদের নিজেদের জাতির হাজার হাজার লোক তাদেরকে মিথ্যুক বলতো এবং তারা পরিষ্কার বলে দিতো, এটা আমাদের আকীদা নয়।

এ প্রশ্ন এবং এর পরবর্তী প্রশ্নগুলোতে শুধুমাত্র শিরুকই বাতিল করা হয়নি বরং নাস্তিক্যবাদকেও বাতিল করে দেয়া হয়েছে। যেমন এ প্রথম প্রশ্নেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে ঃ এই বৃষ্টি বর্ষণকারী এবং এর সাহায্যে সবরকম উদ্ভিদ উৎপাদনকারী কে? এখন চিন্তা করুন, অজস্র রকমের উদ্ভিদের জীবনের জন্য যে ধরনের উপাদান প্রয়োজন, ভূমিতে তার ঠিক উপরিভাগে অথবা উপরিভাগের কাছাকাছি এসব জিনিসের মজুত থাকা এবং পানির মধ্যে ঠিক এমন ধরনের গুণাবলী থাকা যা প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ করে এবং এ পানিকে অনবরত সমুদ্র থেকে উঠানো এবং জমির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময় যথানিয়মে বর্ষণ করা আর মাটি, বাতাস, পানি ও তাপমাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন শক্তির মধ্যে এমন পর্যায়ের আনুপাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা যার ফলে উদ্ভিদ জীবন বিকাশ লাভ করতে পারে এবং সব রকমের জৈব জীবনের জন্য তার অসংখ্য প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম হয়, এসব কিছু কি একজন জ্ঞানবান সত্তার পরিকল্পনা ও সুবিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা এবং প্রবল শক্তি ও সংকল্প ছাড়াই আপনা আপনি হয়ে যেতে পারে? আর এ ধরনের আকস্মিক ঘটনা কি অনবরত হাজার বছর বরং লাখো কোটি বছর ধরে যথা নিয়মে ঘটে যাওয়া সম্ভবপর? প্রবল আক্রোস ও বিদ্বেষে অন্ধ একজন চরম হঠকারী ব্যক্তিই কেবল একে একটি আকস্মিক ঘটনা বলতে পারে। কোন সত্য প্রিয় বুদ্ধি ও বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে এ ধরনের অযৌক্তিক ও অর্থহীন দাবী করা এবং তা মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

৭৪. পৃথিবী যে, অজস্র ধরনের বিচিত্র সৃষ্টির আবাসস্থল ও অবস্থান স্থল হয়েছে এটাও কোন সহজ ব্যাপার নয়। যে বৈজ্ঞানিক সমতা ও সামঞ্জস্যশীলতার মাধ্যমে এ গ্রহটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিষয়াবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে মানুষ বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারে না। সে অনুভব করতে থাকে, এমন ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যশীলতা একজন জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ ও পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন সত্তার ব্যবস্থাপনা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। এ ভূ–গোলকটি মহাশূন্যে ঝুলছে। কারো ওপর ভর দিয়ে অবস্থান করছে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও এর মধ্যে কোন কম্পন ও অস্থিরতা নেই। পৃথিবীর কোথাও মাঝে মধ্যে সীমিত পর্যায়ে ভূমিকম্প হলে তার যে ভয়াবহ চিত্র আমাদের

সামনে আসে তাতে গোটা পৃথিবী যদি কোন কম্পন বা দোদুল্যমানতার শিকার হতো তাহলে এখনো মানব বসতি সম্ভবপর হতো না। এ গ্রহটি নিয়মিতভাবে সূর্যের সামনে আসে আবার পেছন ফেরে। এর ফলে দিনরাতের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যদি এর একটি দিক সব সময় সূর্যের দিকে ফেরানো থাকতো এবং অন্য দিকটা সব সময় থাকতো আড়ালে তাহলে এখানে কোন প্রাণী বসবাস করতে পারতো না। কারণ একদিকের সার্বক্ষণিক শৈত্য ও আলোকহীনতা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্মলাভের উপযোগী হতো না এবং অন্যদিকের ভয়াবহ দাবদাহ প্রচণ্ড উত্তাপ তাকে পানিহীন, উদ্ভিদহীন ও প্রাণীহীন করে দিতো। এ ভূ-মণ্ডলের পাঁচশো মাইল উপর পর্যন্ত বাতাসের একটি পুরু স্তর দিয়ে ঢেকে দয়া হয়েছে। উল্‌কা পতনের ভয়াবহ প্রভাব থেকে তা পৃথিবীকে রক্ষা করে। অন্যথায় প্রতিদিন কোটি কোটি উল্‌কাপিণ্ড সেকেণ্ডে ৩০ মাইল বেগে পৃথিবী পৃষ্ঠে আঘাত হানতো। ফলে এখানে যে ধ্বংস লীলা চলতো তাতে মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা কিছুই জীবিত থাকতো না। এ বাতাসই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, সমুদ্র থেকে মেঘ উঠিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে এবং মানুষ, পশু ও উদ্ভিদের জীবনে প্রয়োজনীয় গ্যাসের যোগান দেয়। এ বাতাস না হলে এ পৃথিবী কোন বসতির উপযোগী অবস্থান স্থলে পরিণত হতে পারতো না। এ ভূ-মণ্ডলের ভূ-ত্বকের কাছাকাছি বিভিন্ন জায়গায় খনিজ ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বিপুল পরিমাণে স্তূপীকৃত করা হয়েছে। উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের জীবনের জন্য এগুলো একান্ত অপরিহার্য। যেখানে এ জিনিসগুলো থাকে না সেখানকার ভূমি জীবন ধারনের উপযোগী হয় না। এ গ্রহটিতে সাগর, নদী, হ্রদ, ঝরণা ও ভূগর্ভস্থ স্রোতধারার আকারে বিপুল পরিমাণ পানির ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে। পাহাড়ের ওপরও এর বিরাট ভাণ্ডার ঘনীভূত করে এবং পরে তা গলিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যবস্থাপনা ছাড়া এখানে জীবনের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আবার এ পানি, বাতাস এবং পৃথিবীতে অন্যান্য যেসব জিনিস পাওয়া যায় সেগুলোকে একত্র করে রাখার জন্য এ গ্রহটিতে অত্যন্ত উপযোগী মাধ্যাকর্ষণ (Granitation) সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এ মধ্যাকর্ষণ যদি কম হতো, তাহলে বাতাস ও পানি উভয়কে এখানে আটকে রাখা সম্ভব হতো না এবং তাপমাত্রা এত বেশী বেড়ে যেতো যে, জীবনের টিকে থাকা এখানে কঠিন হয়ে উঠতো। এ মধ্যাকর্ষণ যদি বেশী হতো, তাহলে বাতাস অনেক বেশী ঘন হয়ে যেতো, তার চাপ অনেক বেশী বেড়ে যেতো এবং জলীয়বাষ্প সৃষ্টি হওয়া কঠিন হয়ে পড়তো ফলে বৃষ্টি হতো না, ঠাণ্ডা বেড়ে যেতো, ভূ-পৃষ্টের খুব কম এলাকাই বাসযোগ্য হতো বরং ভারীত্বের আকর্ষণ অনেক বেশী হলে মানুষ ও পশুর শারীরিক দৈর্ঘ-প্রস্থ কম হতো কিন্তু তাদের ওজন এত বেড়ে যেতো যে তাদের পক্ষে চলাফেরা করা কঠিন হয়ে যেতো। তাছাড়া এ গ্রহটিকে সূর্য থেকে জনবসতির সবচেয়ে উপযোগী একটি বিশেষ দূরত্বে রাখা হয়েছে। যদি এর দূরত্ব বেশী হতো, তাহলে সূর্য থেকে সে কম উত্তাপ লাভ করতো, শীত অনেক বেশী হতো, এবং অন্যান্য অনেক জিনিস মিলেমিশে পৃথিবী নামের এ গ্রহটি আর মানুষের মতো সৃষ্টির বসবাসের উপযোগী থাকতো না।

এ গুলো হচ্ছে বাসোপযোগিতার কয়েকটি দিক মাত্র। এগুলোর বদৌলতে ভূ-পৃষ্ঠ তার বর্তমান মানব প্রজাতির জন্য অবস্থান স্থলে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই এসব বিষয় সামনে রেখে চিন্তাভাবনা করলে এক মুহূর্তের জন্যও একথা ভাবতে পারে না যে, কোন পূর্ণ জ্ঞানময় স্রষ্টার পরিকল্পনা ছাড়া এসব উপযোগিতা ও ভারসাম্য নিছক

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ
اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ قُلْ
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

কে তিনি যিনি আর্তের ডাক শোনেন যখন সে তাঁকে ডাকে কাতরভাবে এবং কে তার দুঃখ দূর করেন?[৭৬] আর (কে) তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন?[৭৭] আল্লাহর সাথে কি আর কোন ইলাহও কি (একাজ করছে)? তোমরা সামান্যই চিন্তা করে থাকো। আর কে জল–স্থলের অন্ধকারে তোমাদের পথ দেখান[৭৮] এবং কে নিজের অনুগ্রহের পূর্বাহ্নে বাতাসকে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান?[৭৯] আল্লাহর সাথে কি অন্য ইলাহও (একাজ করে)? আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে এ শির্‌ক থেকে যা এরা করে।

আর তিনি কে যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তারপর আবার এর পুনরাবৃত্তি করেন?[৮০] আর কে তোমাদের জীবিকা দেন আকাশ ও পৃথিবী থেকে?[৮১] আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহও কি (একাজে অংশীদার) আছে? বলো, আনো তোমাদের যুক্তি, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।[৮২]

একটি আকস্মিক ঘটনার ফলে আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং একথাও ধারণা করতে পারে না যে, এ মহা সৃষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং একে বাস্তব রূপদান করার ব্যাপারে কোন দেব–দেবী বা জিন অথবা নবী–ওলী কিংবা ফেরেশতার কোন হাত আছে।

৭৫. অর্থাৎ মিঠা ও নোনা পানির ভাণ্ডার। এ ভাণ্ডার এ পৃথিবীতেই রয়েছে কিন্তু তারা কখনো পরস্পর মিশে যায় না। ভূ–গর্ভের পানির স্রোতও কখনো একই এলাকায় মিঠা পানির স্রোত আলাদা এবং নোনা পানির স্রোত আলাদা দেখা যায়। নোনা পানির সাগরেও দেখা যায় কোথাও মিঠা পানির স্রোত আলাদা প্রবাহিত হচ্ছে। সাগর যাত্রীরা সেখান থেকে তাদের খাবার পানি সগ্রহ করেন। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ফুরকান, ৬৮ টীকা)

৭৬. আরবের মুশরিকরা ভালোভাবেই জানে এবং স্বীকারও করে যে, একমাত্র আল্লাহই বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করেন। তাই কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যখন তোমরা কোন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হও তখন আল্লাহরই কাছে ফরিয়াদ করতে থাকো কিন্তু যখন সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় তখন আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করতে থাকো। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আল আন'আম, ২৯-৪১ টীকা, সূরা ইউনুস ২১-২২ আয়াত, ও ৩১ টীকা, সূরা আন্ নাহল ৪৬ টীকা, সূরা বনী ইসরাঈল ৮৪ টীকা) এ বিষয়টি কেবল আরব মুশরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সারা দুনিয়ার মুশরিকদেরও সাধারণভাবে এ একই অবস্থা। এমনকি রাশিয়ার নাস্তিকরা যারা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর হুকুম মেনে চলার বিরুদ্ধে যথারীতি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, তারাও যখন বিগত বিশ্ব মহাযুদ্ধে জার্মান সেনাদলের অবরোধ কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তখন তারা আল্লাহকে ডাকার প্রয়োজন অনুভব করেছিল।

৭৭. এর দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, এক প্রজন্মের পর আর এক প্রজন্মকে এবং এক জাতির পর আর এক জাতির উত্থান ঘটান। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, পৃথিবীর সম্পদ ব্যবহার এবং এখানে রাজত্ব করার ক্ষমতা দেন।

৭৮. অর্থাৎ যিনি তারকার সাহায্যে এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যার ফলে তোমরা রাতের অন্ধকারেও নিজেদের পথের সন্ধান করতে পারো। মানুষ জলে-স্থলে যেসব সফর করে, সেখানে তাকে পথ দেখাবার জন্য আল্লাহ এমন সব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার সাহায্যে সে নিজের গন্তব্য স্থলের দিকে নিজের চলার পথ নির্ধারণ করে নিতে পারে। দিনে ভূ-প্রকৃতির বিভিন্ন আলামত এবং সূর্যের উদয়াস্তের দিক তাকে সাহায্য করে এবং অন্ধকার রাতে আকাশের তারকারা তাকে পথ দেখায়। এ সবই আল্লাহর জ্ঞানগর্ভ ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনারই একটি অংশ। সূরা নাহলে এসবগুলোকে আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ (ايت : ١٦)

৭৯. রহমত বা অনুগ্রহ বলতে বৃষ্টিধারা বুঝানো হয়েছে। এর আগমনের পূর্বে বাতাস এর আগমনী সংবাদ দেয়।

৮০. একটি সহজ সরল কথা। একটি বাক্যে কথাটি বলে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে এত বেশী খুটিনাটি বিষয় রয়েছে যে, মানুষ এর যত গভীরে নেমে যেতে থাকে ততই আল্লাহর অস্তিত্ব ও আল্লাহর একত্বের প্রমাণ সে লাভ করে যেতে থাকে। প্রথমে সৃষ্টি কর্মটিই দেখা যাক। জীবনের উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কেমন করে হয়, মানুষের জ্ঞান আজো এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। নির্জীব বস্তুর নিছক রাসায়নিক মিশ্রণের ফলে প্রাণের স্বতস্ফূর্ত উন্মেষ ঘটতে পারে না, এ পর্যন্ত এটিই সর্বস্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রাণ সৃষ্টির জন্য যতগুলো উপাদানের প্রয়োজন সে সবগুলো যথাযথ আনুপাতিক হারে একেবারে আকস্মিকভাবে একত্র হয়ে গিয়ে আপনা আপনি জীবনের উন্মেষ ঘটে যাওয়া অবশ্যই নাস্তিক্যবাদীদের একটি অ-তাত্বিক কল্পনা। কিন্তু যদি অংকশাস্ত্রের আকস্মিক ঘটনার নিয়ম (Law of chance) এর ওপর প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায় নেমে যায়। এ পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতিতে

বিজ্ঞান গবেষণাগারসমূহে (Laboratories) নিষ্প্রাণ বস্তু থেকে প্রাণবান বস্তু সৃষ্টি করার যতগুলো প্রচেষ্টাই চলেছে, সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের পরও তা সবই চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। বড় জোর যা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে তা হচ্ছে কেবলমাত্র এমন বস্তু যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় D. N. A. বলা হয়। এটি এমন বস্তু যা জীবিত কোষসমূহে পাওয়া যায়। এটি অবশ্যই জীবনের উপাদান কিন্তু নিজে জীবন্ত নয়। জীবন আজো একটি অলৌকিক ব্যাপার। এটি একজন স্রষ্টার হুকুম, ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ফল, এছাড়া এর আর কোন তাত্বিক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না।

এরপর সামনের দিকে দেখা যাক। জীবন নিছক একটি একক অমিশ্রিত অবস্থায় নেই বরং অসংখ্য বিচিত্র আকৃতিতে তাকে পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রাণীর মধ্যে প্রায় দশ লাখ এবং উদ্ভিদের মধ্যে প্রায় দু'লাখ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ লাখো লাখো প্রজাতি নিজেদের আকার-আকৃতি ও শ্রেণী বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে পরস্পর থেকে এত সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত পার্থক্যের অধিকারী এবং জানা ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগ থেকে তারা নিজেদের পৃথক শ্রেণী আকৃতিকে অনবরত এমনভাবে অক্ষুন্ন রেখে আসছে যার ফলে এক আল্লাহর সৃষ্টি পরিকল্পনা (Design) ছাড়া জীবনের এ মহা বৈচিত্রের অন্য কোন যুক্তি সংগত ব্যাখ্যা করা কোন ডারউইনের পক্ষেই সম্ভব নয়। আজ পর্যন্ত কোথাও দু'টি প্রজাতির মাঝখানে এমন এক শ্রেণীর জীব পাওয়া যায়নি যারা এক প্রজাতির কাঠামো, আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট ভেদ করে বের হয়ে এসেছে এবং এখনো অন্য প্রজাতির কাঠামো, আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট পর্যন্ত পৌছুবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কংকালের (Fossils) সমগ্র বিবরণীতে এ পর্যন্ত এর কোন নজির পাওয়া যায়নি এবং বর্তমান প্রাণী জগতে কোথাও এ ধরনের 'হিজড়া' শ্রেণী পাওয়া কঠিন। আজ পর্যন্ত সর্বত্রই সকল প্রজাতির সদস্যকেই তার পূর্ণ শ্রেণীগত বৈশিষ্ট সহকারেই পাওয়া গেছে। মাঝে-মধ্যে কোন হারিয়ে যাওয়া শ্রেণী সম্পর্কে যেসব কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়, কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়ে তার অসারতা ফাঁস করে দেয়। বর্তমানে এটি একটি অকাট্য সত্য যে, একজন সুবিজ্ঞ কারিগর, একজন সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা ও চিত্রকরই জীবনকে এত সব বৈচিত্রময় রূপদান করেছেন।

এ তো গেলো সৃষ্টির প্রথম অবস্থার কথা। এবার সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির কথাটা একবার চিন্তা করা যাক। সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠনাকৃতি ও গঠন প্রণালীর মধ্যে এমন বিস্ময়কর কর্মপদ্ধতি (Mechanism) রেখে দিয়েছেন যা তার অসংখ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে ঠিক একই শ্রেণীর আকৃতি, স্বভাব ও বৈশিষ্ট সম্পন্ন হাজারো প্রজন্মের জন্ম দিয়ে যেতে থাকে। কখনো মিছামিছিও এ কোটি কোটি ছোট ছোট কারখানায় এ ধরনের ভুলচুক হয় না, যার ফলে একটি প্রজাতির কোন বংশ বৃদ্ধি কারখানায় অন্য প্রজাতির কোন নমুনা উৎপাদন করতে থাকে। আধুনিক বংশ তত্ব (Genetics) পর্যবেক্ষণ এ ব্যাপারে বিস্ময়কর সত্য উদ্‌ঘাটন করে। প্রত্যেকটি চারাগাছের মধ্যে এমন যোগ্যতা রাখা হয়েছে যার ফলে সে তার নিজের প্রজন্মকে পরবর্তী বংশধরদের পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এমন পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করে যাতে পরবর্তী বংশধররা তার যাবতীয় প্রজাতিক বৈশিষ্ট, আচরণ ও গুণের অধিকারী হয় এবং তার প্রত্যেক ব্যক্তি সত্তাই অন্যান্য সকল প্রজাতির ব্যক্তিবর্গ থেকে শ্রেণীগত বিশিষ্টতা অর্জন করে। এ প্রজাতি ও প্রজন্ম রক্ষার সরঞ্জাম প্রত্যেকটি চারার প্রতিটি কোষের (Cell) একটি অংশে

সংরক্ষিত থাকে। অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একে দেখা যেতে পারে। এ ক্ষুদ্র প্রকৌশলীটি পূর্ণ সুস্থতা সহকারে চারার সার্বিক বিকাশকে চূড়ান্তভাবে তার শ্রেণীগত আকৃতির স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করে। এরি বদৌলতে একটি গম বীজ থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে যেখানেই যত গমের চারা উৎপন্ন হয়েছে তা সব গমই উৎপাদন করেছে। কোন আবহাওয়ায় এবং কোন পরিবেশে কখনো ঘটনাক্রমে একটি গম বীজের বংশ থেকে একটি যব উৎপন্ন হয়নি। মানুষ ও পশুর ব্যাপারেও এই একই কথা। অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে কারো সৃষ্টিই একবার হয়েই থেমে যায়নি। বরং কল্পনাতীত ব্যাপকতা নিয়ে সর্বত্র সৃষ্টির পুনরাবর্তনের একটি বিশাল কারখানা সক্রিয় রয়েছে। এ কারখানা অনবরত প্রতিটি শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে একই শ্রেণীর অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ উৎপাদন করে চলছে। যদি কোন ব্যক্তি সন্তান উৎপাদন ও বংশ বিস্তারের এ অণুবীক্ষণীয় বীজটি দেখে, যা সকল প্রকার শ্রেণীগত বৈশিষ্ট ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলীকে নিজের ক্ষুদ্রতম অস্তিত্বেরও নিছক একটি অংশে ধারণ করে থাকে এবং তারপর দেখে অংগ প্রত্যংগের এমন একটি চরম নাজুক ও জটিল ব্যবস্থা এবং চরম সূক্ষ্ম ও জটিল কর্মধারা (Progresses), যার সাহায্যে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তির বংশধারার বীজ একই শ্রেণীর নবতর ব্যক্তিকে উৎপন্ন করে, তাহলে একথা সে এক মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করতে পারে না যে, এমন নাজুক ও জটিল কর্মব্যবস্থা কখনো আপনা আপনি গড়ে উঠতে পারে, এবং তারপর বিভিন্ন শ্রেণীর শত শত কোটি ব্যক্তির মধ্যে তা আপনা আপনি যথাযথভাবে চালুও থাকতে পারে। এ জিনিসটি কেবল নিজের সূচনার জন্যই একজন বিজ্ঞ স্রষ্টা চায় না বরং প্রতি মুহূর্তে নিজের সঠিক ও নির্ভুল পথে চলতে থাকার জন্যও একজন পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সত্তার প্রত্যাশী হয়, যিনি এক মুহূর্তের জন্যও এ কারখানাগুলোর দেখা–শুনা, রক্ষণা–বেক্ষণ ও সঠিক পথে পরিচালনা থেকে গাফিল থাকবেন না।

এ সত্যগুলো যেমন একজন নাস্তিকের আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রবণতার মূলোচ্ছেদ করে তেমনি একজন মুশরিকের শিরককেও সমূলে উৎপাটিত করে দেয়। এমন কোন নির্বোধ আছে কি যে একথা ধারণা করতে পারে যে, আল্লাহর বিশ্ব পরিচালনার এ কাজে কোন ফেরেশতা, জিন, নবী বা অলী সামান্যতমও অংশীদার হতে পারে? আর কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিদ্বেষ ও স্বার্থশূন্য মনে একথা বলতে পারে যে, এ সমগ্র সৃষ্টি কারখানা ও সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি এ ধরনের পরিপূর্ণ বিজ্ঞতা ও নিয়ম–শৃংখলা সহকারে ঘটনাক্রমেই শুরু হয় এবং আপনা আপনিই চলছে?

৮১. এ সংক্ষিপ্ত শব্দগুলোকে অগভীরভাবে পড়ে কোন ব্যক্তি রিযিক দেবার ব্যাপারটি যেমন সহজ সরল ভাবে অনুভব করে আসলে ব্যাপার কিন্তু তেমন সহজ সরল নয়। এ পৃথিবীতে পশু ও উদ্ভিদের লাখো লাখো শ্রেণী পাওয়া যায়। তাদের প্রত্যেকের সংখ্যা শত শত কোটি হবে এবং তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা খাদ্যের প্রয়োজন। স্রষ্টা তাদের প্রত্যেক শ্রেণীর খাদ্যবস্তু এত বিপুল পরিমাণে এবং প্রত্যেকের আহরণ ক্ষমতার এত কাছাকাছি রেখে দিয়েছেন যার ফলে কোন শ্রেণীর কোন একজনও খাদ্য থেকে বঞ্চিত থাকে না। তারপর এ ব্যবস্থাপনায় পৃথিবী ও আকাশের এত বিচিত্র শক্তি মিলেমিশে কাজ করে যাদের সংখ্যা গণনা করা কঠিন। তাপ, আলো, বাতাস, পানি ও মাটির বিভিন্ন

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۞٦٥ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۫ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۫ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ۞٦٦

তাদেরকে বলো, আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে ও আকাশে কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না।[৮৩] এবং তারা জানে না ক'বে তাদেরকে উঠিয়ে নেয়া হবে[৮৪] বরং আখেরাতের জ্ঞানই তাদের থেকে হারিয়ে গেছে। উপরন্তু তারা সে ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। আসলে তারা সে ব্যাপারে অন্ধ।[৮৫]

উপাদানের মধ্যে যদি ঠিকমতো আনুপাতিক হারে সহযোগিতা না থাকে তাহলে এক বিন্দু পরিমাণ খাদ্যও উৎপন্ন হতে পারে না।

কে কল্পনা করতে পারে, এ বিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা একজন ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাপনা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়া এমনিই ঘটনাক্রমে হতে পারে? এবং বুদ্ধি সচেতন অবস্থায় কে একথা চিন্তা করতে পারে যে, এ ব্যবস্থাপনায় কোন জিন, ফেরেশতা বা কোন মহা মনীষীর আত্মার কোন হাত আছে?

৮২. অর্থাৎ এসব কাজে সত্যিই অন্য কেউ শরীক আছে, এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ আনো অথবা যদি তা না পারো তাহলে কোন যুক্তিসংগত প্রমাণের সাহায্যে একথা বুঝিয়ে দাও যে, এ সমস্ত কাজ তো একমাত্র আল্লাহরই কিন্তু বন্দেগী ও উপাসনা লাভের অধিকার লাভ করবে তিনি ছাড়া অন্য কেউ অথবা তাঁর সাথে অন্যজনও।

৮৩. উপরে সৃষ্টিকর্ম, ব্যবস্থাপনা ও জীবিকাদানের দিক দিয়ে এই মর্মে যুক্তি পেশ করা হয়েছিল যে, আল্লাহই একমাত্র ইলাহ (অর্থাৎ একমাত্র ইলাহ ও ইবাদাত লাভের একমাত্র অধিকারী) এবার আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ অর্থাৎ জ্ঞানের দিক দিয়ে জানানো হচ্ছে যে, এ ব্যাপারেও মহান আল্লাহ হচ্ছেন লা-শরীক। পৃথিবী ও আকাশে ফেরেশতা, জিন, নবী, আউলিয়া অথবা মানুষ ও অ-মানুষ যে কোন সৃষ্টি হোক না কেন সবারই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কিছু না কিছু জিনিস সবার কাছ থেকে গোপন রয়েছে। সব কিছুর জ্ঞান যদি কারো থাকে তাহলে তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানের কোন জিনিস এবং কোন কথা তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব কিছু জানেন।

এখানে মূলে "গায়েব" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। গায়েব মানে প্রচ্ছন্ন লুকানো অদৃশ্য বা আবৃত। পারিভাষিক অর্থে গায়েব হচ্ছে এমন জিনিস যা অজানা এবং যাকে জানার উপায়-উপকরণগুলো দ্বারা আয়ত্ব করা যায় না। দুনিয়ায় এমন বহু জিনিস আছে যা এককভাবে কোন কোন লোক জানে এবং কোন কোন লোক জানে না। আবার এমন অনেক জিনিস আছে যা সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানব জাতি কখনো জানতো না, আজকেও

জানে না এবং ভবিষ্যতেও কখনো জানবে না। জিন, ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টির ব্যাপারেও এই একই কথা। কতক জিনিস তাদের কারো কাছে প্রচ্ছন্ন এবং কারো কাছে প্রকাশিত। আবার অসংখ্য জিনিস এমন আছে যা তাদের সবার কাছে প্রচ্ছন্ন ও অজানা। এ সব ধরনের অদৃশ্য জিনিস একমাত্র একজনের কাছে দৃশ্যমান। তিনি হচ্ছেন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তাঁর কাছে কোন জিনিস অদৃশ্য নয়। সবকিছুই তাঁর কাছে সুস্পষ্টভাবে পরিদৃশ্যমান।

উপরে বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা, ব্যবস্থাপক এবং খাদ্য যোগানদাতা হিসেবে আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য প্রশ্নের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, আল্লাহর অদৃশ্য জ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য বর্ণনা করার জন্য সে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে, পূর্বোক্ত গুণগুলো প্রত্যেকটি মানুষ দেখছে, সেগুলোর চিহ্ন একদম সুস্পষ্ট। কাফের ও মুশরিকরাও সেগুলো সম্পর্কে আগেও একথা মানতো এবং এখনো মানে যে, এসব একমাত্র আল্লাহরই কাজ। তাই সেখানে যুক্তি প্রদানের পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ ঃ এ সমস্ত কাজ যখন আল্লাহরই এবং তাদের কেউ যখন এ সব কাজে তাঁর অংশীদার নয়, তখন তোমরা কেমন করে সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অন্যদেরকে অংশীদার করে নিয়েছো এবং কিসের ভিত্তিতেই বা তারা ইবাদাত লাভের অধিকারী হয়ে গেছে? কিন্তু আল্লাহর সর্বজ্ঞতা সংক্রান্ত গুণটির এমন কোন অনুভব যোগ্য আলামত নেই, যা আংগুল দিয়ে দেখানো যায়। এ বিষয়টি শুধুমাত্র চিন্তা–ভাবনা করেই বুঝতে পারা যেতে পারে। তাই একে প্রশ্নের পরিবর্তে দাবী আকারে পেশ করা হয়েছে। এখন প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির একথা ভেবে দেখা উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে এ কথা কি বোধগম্য? অর্থাৎ বিশ্ব–জাহানে যেসব অবস্থা, বস্তু ও সত্য কখনো ছিল বা এখন আছে কিংবা ভবিষ্যতে হবে, সেগুলো কি আল্লাহ চাড়া অন্য কারো জানা সম্ভব। আর যদি অন্য কেউ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী না হয়ে থাকে এবং সে জ্ঞান লাভের ক্ষমতা ও যোগ্যতা আর কারো না থেকে থাকে তাহলে যারা প্রকৃত সত্য ও অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত নয় তাদের মধ্য থেকে কেউ বান্দাদের ফরিয়াদ শ্রবণকারী, অভাব মোচনকারী ও সংকট নিরসনকারী হতে পারে, একথা কি বুদ্ধি সম্মত?

ইবাদাত–উপাসনা ও সার্বভৌম কতৃত্বের অধিকারী হওয়া এবং অদৃশ্য জ্ঞানের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ জন্য অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যার ভেতরেই উপাস্য বা দেবতা বা বিশ্ববিধাতা সুলভ সর্বময় কর্তৃত্বের কোন গন্ধ ও অনুমান করেছে তার সম্পর্কে একথা অবশ্যই ভেবেছে যে, তার কাছে সবকিছুই সুস্পষ্ট ও আলোকিত এবং কোন জিনিস তার অগোচরে নেই। অর্থাৎ মানুষের মন এ সত্যটি সুস্পষ্টভাবে জানে যে, ভাগ্যের ভাংগা–গড়া, ফরিয়াদ শোনা, প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং প্রত্যেক সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করা কেবলমাত্র এমন এক সত্তার কাজ হতে পারে যিনি সব কিছু জানেন এবং যার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। এ কারণে তো মানুষ যাকেই সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পন্ন মনে করে তাকে অবশ্যই অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারীও মনে করে। কারণ তার বুদ্ধি নিসন্দেহে সাক্ষ দেয়, জ্ঞান ও ক্ষমতা পরস্পর অংগাংগীভাবে সম্পর্কিত একটির জন্য অন্যটি অনিবার্য। এখন যদি এটি সত্য হয়ে থাকে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ স্রষ্টা, ব্যবস্থাপক, ফরিয়াদ শ্রবণকারী ও রিযিকদাতা নেই, যেমন উপরের আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে সাথে সাথে এটিও সত্য যে, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্তা অদৃশ্য

জ্ঞানের অধিকারীও নয়। কোন্‌ বুদ্ধি সচেতন ব্যক্তি একথা কল্পনা করতে পারে যে, কোন ফেরেশতা, জিন, নবী, অলী বা কোন সৃষ্টি সাগরের বুকে, বাতাসের মধ্যে এবং মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তরে ও তার উপরিভাগে কোথায় কোথায় কোন্‌ কোন্‌ প্রকারের কত প্রাণী আছে ? মহাশূন্যের অসংখ্য গ্রহ–নক্ষত্রের সঠিক সংখ্যা কত তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ ধরনের সৃষ্টি বিরাজ করছে এবং এ সৃষ্টিগুলোর প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অবস্থান কোথায় এবং তার প্রয়োজনসমূহ কি কি তা জানে? এসব কিছু আল্লাহর অপরিহার্যভাবে জানা থাকতে হবে। কারণ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকেই তাদের যাবতীয় ব্যাপার পরিচালনা এবং তাদের যাবতীয় অবস্থা দেখা–শুনা করতে হয় আর তিনিই তাদের জীবিকা সরবরাহকারী। কিন্তু অন্য কেউ তার নিজের সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের মধ্যে এই ব্যাপক ও সর্বময় জ্ঞান কেমন করে রাখতে পারে? সৃষ্টি ও জীবিকাদানের কর্মের সাথে তার কি কোন সম্পর্ক আছে যে, সে এসব জিনিস জানবে?

আবার অদৃশ্য জ্ঞানের গুণটি বিভাজ্যও নয়। উদাহরণস্বরূপ কেবলমাত্র পৃথিবীর সীমানা পর্যন্ত এবং শুধুমাত্র মানুষের ব্যাপারে কোন মানুষ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হবে–এটা সম্ভব নয়। আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, স্থিতিস্থাপক ও প্রতিপালক হওয়ার গুণগুলো যেমন বিভক্ত হতে পারে না। তেমনি এ গুণটিও বিভক্ত হতে পারে না। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো মানুষ দুনিয়ায় জন্ম নিয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম নেবে মাতৃ জরায়ুতে গর্ভসঞ্চার হওয়ার সময় থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের সবার সকল অবস্থা ও পরিস্থিতি জানতে পারে এমন মানুষটি কে হতে পারে? সে মানুষটি কেমন করে এবং কেন তা জানবে? সে কি এ সীমা সংখ্যাহীন সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা? সে কি তাদের পিতৃপুরুষদের বীর্যে তাদের বীজানু উৎপন্ন করেছিল? সে কি তাদের মাতৃগর্ভে তাদের আকৃতি নির্মাণ করেছিল? মাতৃগর্ভের সেই মাংসপিণ্ডটি জীবিত ভুমিষ্ট হওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা কি সে করেছিল? সে কি তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগ্য তৈরি করেছিল? সে কি তাদের জীবন–মৃত্যু, রোগ–স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি, দারিদ্র ও উত্থান পতনের ফায়সালা করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল? এসব কাজ কবে থেকে তার দায়িত্বে এসেছে? তার নিজের জন্মের আগে, না পরে? আর কেবল মানুষের মধ্যে এ দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হতে পারে কেমন করে? একাজ তো অনিবার্যভাবে পৃথিবী ও আকাশের বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। যে সত্তা সমগ্র বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন তিনিই তো মানুষের জন্ম–মৃত্যু, তাদের জীবিকার সংকীর্ণতা ও স্বচ্ছলতার এবং তাদের ভাগ্যের ভাংগা গড়ার জন্য দায়িত্বশীল হতে পারেন।

তাই আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নয়, এটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান যতটুকু চান জ্ঞান দান করেন। কোন অদৃশ্য বা কতগুলো অদৃশ্য জিনিসকে তার সামনে উন্মুক্ত করে দেন। কিন্তু অদৃশ্য জ্ঞান সামগ্রিকভাবে কেউ লাভ করতে পারে না এবং "আলেমুল গায়েব" অদৃশ্য জ্ঞানী উপাধি একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ –

"আর তাঁর কাছেই আছে অদৃশ্যের চাবিগুলো, সেগুলো তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।" (আন'আম ৫৯ আয়াত)

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ –

"একমাত্র আল্লাহই রাখেন কিয়ামতের জ্ঞান। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কি (লালিত) হচ্ছে, কোন প্রাণী জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কোন প্রাণী জানে না কোন্ ভূমিতে তার মৃত্যু হবে।" (লুকমান ৩৪ আয়াত)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ إِلَّا بِمَا شَاءَ –

"তিনি জানেন যা কিছু সৃষ্টির সামনে আছে এবং যা কিছু আছে তাদের অগোচরে। আর তাঁর জ্ঞানের কিছুমাত্র অংশও তারা আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যে জিনিসটির জ্ঞান তাদেরকে দিতে চান, দেন।" (আল বাকারাহ ২৫৫ আয়াত)

কোন সৃষ্টি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে এ ধারণা কুরআন সর্বতোভাবে নাকচ করে দেয়। এমনকি বিশেষভাবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারেও এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে, তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নন এবং তাঁকে অদৃশ্যের কেবলমাত্র ততটুকু জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে যতটুকু রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন ছিল। সূরা আন'আম ৫০ আয়াত, সূরা আ'রাফ ১৮৭ আয়াত, সূরা তাওবাহ ১০১ আয়াত, সূরা হূদ ৩১ আয়াত, সূরা আহযাব ৬৩ আয়াত, সূরা আহকাফ ৯ আয়াত, সূরা তাহরীম ৩ আয়াত এবং সূরা জিন ২৬ আয়াত এ ব্যাপারে কোন প্রকার অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের অবকাশই রাখেনি।

কুরআনের এ সমস্ত সুস্পষ্ট ভাষণ আলোচ্য আয়াতটির বক্তব্য সমর্থন ও ব্যাখ্যা করে এর পর এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করা এবং যা কিছু আছে ও যা কিছু হবে এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো আছে—একথা মনে করা পুরোপুরি একটি অনৈসলামী বিশ্বাস। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম নির্ভুল বর্ণনা পরম্পরায় হযরত আয়েশা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

مَنْ زَعَمَ أَنَّهٗ (اى النبى صلى الله عليه وسلم) يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفِرْيَةَ وَاللّٰهُ يَقُولُ قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ –

"যে ব্যক্তি দাবী করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগামী কাল কি হবে তা জানেন, সে আল্লাহর প্রতি মহা মিথ্যা আরোপ করে। কারণ আল্লাহ তো বলেন, হে নবী। তুমি বলে দাও আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে আর কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না।"

ইবনুল মুনযির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) প্রখ্যাত শিষ্য হযরত ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, "হে মুহাম্মাদ! কিয়ামত কবে আসবে? আমাদের দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকায় বৃষ্টি কবে হবে? আর আমার গর্ভবতী স্ত্রী ছেলে না মেয়ে প্রসব করবে? আর আজ আমি কি উপার্জন করেছি তাতো আমি জানি কিন্তু আগামীকাল আমি কি উপার্জন করবো? আর আমি কোথায় জন্মেছি তাতো আমি জানি কিন্তু আমি মরবো কোথায়?" এ প্রশ্নগুলোর জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিপূর্বে আমাদের উল্লেখিত সূরা লুকমানের আয়াতটি শুনিয়ে দেন। এছাড়া বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের একটি বহুল পরিচিত হাদীসও এর সমর্থন করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ সাহাবীগণের সমাবেশে হযরত জিব্রীল মানুষের বেশে এসে নবীকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার একটি এও ছিল যে, কিয়ামত কবে হবে? নবী (সা) জবাব দিয়েছিলেন,

مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ –

"যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সে জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে এ ব্যাপারে বেশী জানে না।"

তারপর বলেন, এ পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। এ সময় তিনি উল্লেখিত আয়াতটি পাঠ করেন।

৮৪. অর্থাৎ অন্যরা, যাদের সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, তারা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী এবং এ জন্য যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করে নিয়েছো, তারা নিজেরা তো নিজেদেরই ভবিষ্যতের খবর রাখে না। তারা জানে না, কিয়ামত কবে আসবে যখন আল্লাহ পুনর্বার তাদেরকে উঠিয়ে দাঁড় করাবেন।

৮৫. 'ইলাহ'র গুণাবলীর ব্যাপারে তাদের আকীদার মৌলিক ত্রুটিগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার পর এখন একথা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তারা যে এ মারাত্মক গোমরাহীর মধ্যে পড়ে আছে এর কারণ এ নয় যে, চিন্তা–ভাবনা করার পর তারা কোন যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে ভিন্ন সত্তাদের শরীকানা আছে। বরং এর আসল কারণ হচ্ছে, তারা কখনো গুরুত্ব সহকারে চিন্তা–ভাবনা করেনি। যেহেতু তারা আখেরাত সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে কিংবা তা থেকে চোখ বন্ধ করে রেখেছে, তাই আখেরাত চিন্তা থেকে বেপরোয়া ভাব তাদের মধ্যে পুরোপুরি একটি অ–দায়িত্বশীল মনোভাব সৃষ্টি করে দিয়েছে। তারা এ বিশ্ব–জাহান এবং নিজেদের জীবনের প্রকৃত সমস্যাবলীর প্রতি আদতে কোন গুরুত্বই আরোপ করে না। প্রকৃত সত্য কি এবং তাদের জীবন দর্শন তার সাথে সামঞ্জস্য রাখে কিনা এর কোন পরোয়াই তারা করে না। কারণ তাদের মতে শেষ পর্যন্ত মুশরিক, নাস্তিক, একত্ববাদী ও সংশয়বাদী সবাইকেই মরে গিয়ে মাটিতে মিশে যেতে হবে এবং কোন জিনিসেরই কোন চূড়ান্ত ফলাফল নেই।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৬ রুকূ'

এ অস্বীকারকারীরা বলে থাকে, "যখন আমরা ও আমাদের বাপ–দাদারা মাটি হয়ে যাবো তখন আমাদের সত্যিই কবর থেকে বের করা হবে নাকি? এ খবর আমাদেরও অনেক দেয়া হয়েছে এবং ইতিপূর্বে আমাদের বাপ দাদাদেরকেও অনেক দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এসব নিছক কল্প–কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়, যা আগের জামানা থেকে শুনে আসছি।" বলো, পৃথিবী পরিভ্রমণ করে দেখো অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে।[৮৬] হে নবী! তাদের অবস্থার জন্য দুঃখ করো না এবং তাদের চক্রান্তের জন্য মনঃক্ষুন্নও হয়ো না।[৮৭]

আখেরাত সংক্রান্ত এ বক্তব্যটি এর আগের আয়াতের নিম্নোক্ত বাক্যাংশ থেকে বের হয়েছে ঃ "তারা জানে না, কবে তাদেরকে উঠানো হবে।" এ বাক্যাংশে একথা বলে দেয়া হয়েছিল যে, যাদেরকে উপাস্য করা হয়—আর ফেরেশ্‌তা, জিন, নবী, অলী সবাই এর অন্তরভুক্ত—তাদের কেউই আখেরাত কবে আসবে জানে না। এরপর এখন সাধারণ কাফের ও মুশরিকদের সম্পর্কে তিনটি কথা বলা হয়েছে। প্রথমত আখেরাত কোনদিন আদৌ হবে কিনা তা তারা জানেই না। দ্বিতীয়ত তাদের এ অজ্ঞতা এ জন্য নয় যে, তাদেরকে কখনো এ ব্যাপারে জানানো হয়নি। বরং এর কারণ হচ্ছে, তাদেরকে যে খবর দেয়া হয়েছে তা তারা বিশ্বাস করেনি বরং তার নির্ভুলতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে থেকেছে। তৃতীয়ত আখেরাত অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে যেসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তারা কখনো সেগুলো যাচাই করার প্রয়াস চালায়নি। বরং তারা সেদিক থেকে চোখ বন্ধ করে থাকাকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

৮৬. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে আখেরাতের পক্ষে দু'টি মোক্ষম যুক্তি রয়েছে এবং উপদেশও।

প্রথম যুক্তিটি হচ্ছে, দুনিয়ার যেসব জাতি আখেরাতকে উপেক্ষা করেছে তারা অপরাধী না হয়ে পারেনি। তারা দায়িত্ব জ্ঞান বর্জিত হয়ে গেছে। জুলুম নির্যাতনে অভ্যস্ত হয়েছে। ফাসেকী ও অশ্লীল কাজের মধ্যে ডুবে গেছে। নৈতিক চরিত্র বিনষ্ট হবার ফলে শেষ পর্যন্ত তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এটি মানুষের ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। দুনিয়ার

দিকে দিকে বিধ্বস্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষগুলো এর সাক্ষ দিচ্ছে। এগুলো পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, আখেরাত মানা ও না মানার সাথে মানুষের মনোভাব ও কর্মনীতি সঠিক কিনা, তার অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাকে মেনে নিলে এ মনোভাব ও কর্মনীতি সঠিক থাকে এবং তাকে না মানলে তা ভুল ও অশুদ্ধ হয়ে যায়। একে মেনে নেয়া যে প্রকৃত সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল, এটি এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ কারণে একে মেনে নিলেই মানুষের জীবন সঠিক পথে চলতে থাকে। আর একে অস্বীকার করলে প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করাই হয়। ফলে রেলগাড়ি তার বাঁধানো রেলপথ থেকে নেমে পড়ে।

দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে, ইতিহাসের এ সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অপরাধীর কাঠগড়ায় প্রবেশকারী জাতিসমূহের ধ্বংস হয়ে যাওয়া এ চিরায়ত সত্যটিই প্রকাশ করছে যে, এ বিশ্ব–জাহানে চেতনাহীন শক্তিসমূহের অন্ধ ও বধির শাসন চলছে না বরং এটি বিজ্ঞ ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা, যার মধ্যে সক্রিয় রয়েছে একটি অভ্রান্ত প্রতিদান ও প্রতিবিধানমূলক আইন। বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ওপর পুরোপুরি নৈতিকতার ভিত্তিতে সে তার শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। কোন জাতিকে এখানে অসৎ কাজ করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয় না। একবার কোন জাতির উত্থান হবার পর সে এখানে চিরকাল আয়েশ আরাম করতে থাকবে এবং অবাধে জুলুম নিপীড়ন চালিয়ে যেতে থাকবে এমন ব্যবস্থা এখানে নেই। বরং একটি বিশেষ সীমায় পৌঁছে যাবার পর একটি মহা শক্তিশালী হাত এগিয়ে এসে তাকে পাকড়াও করে লাঞ্ছনা ও অপমানের গভীরতম গহ্বরে নিক্ষেপ করে। যে ব্যক্তি এ সত্যটি অনুধাবন করবে সে কখনো এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, এ প্রতিদান ও প্রতিবিধানের আইনই এ দুনিয়ার জীবনের পরে অন্য একটি জীবনের দাবী করে। সেখানে ব্যক্তিবর্গ ও জাতিসমূহ এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্ব মানবতার প্রতি ইনসাফ করা হবে। কারণ শুধুমাত্র একটি জালেম জাতি ধ্বংস হয়ে গেলেই ইনসাফের সমস্ত দাবী পূর্ণ হয়ে যায় না। এর ফলে যেসব মজলুমের লাশের ওপর সে তার মর্যাদার প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল তাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান হয় না। ধ্বংস আসার পূর্বে যেসব জালেম লাগামহীন জীবন উপভোগ করে গেছে তারাও কোন শাস্তি পায় না। যেসব দুষ্কৃতকারী বংশ পরম্পরায় নিজেদের পরে আগত প্রজন্মের জন্য বিভ্রান্তি ও ব্যভিচারের উত্তরাধিকার রেখে চলে গিয়েছিল তাদের সে সব অসৎকাজেরও কোন জবাবদিহি হয় না। দুনিয়ায় আযাব পাঠিয়ে শুধুমাত্র তাদের শেষ বংশধরদের আরো বেশী জুলুম করার সূত্রটি ছিন্ন করা হয়েছিল। আদালতের আসল কাজ তো এখনো হয়নি। প্রত্যেক জালেমকে তার জুলুমের প্রতিদান দিতে হবে। প্রত্যেক মজলুমের প্রতি জুলুমের ফলে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তাকে তার ক্ষতিপূরণ করে দিতে হবে। আর যেসব লোক অসৎকাজের এ দুর্বার স্রোতের মোকাবিলায় ন্যায়, সত্য ও সততার পথে অবিচল থেকে সৎকাজ করার জন্য সর্বক্ষণ তৎপর থেকেছে এবং সারাজীবন এপথে কষ্ট সহ্য করেছে তাদেরকে পুরস্কার দিতে হবে। অপরিহার্যভাবে এসব কাজ কোন এক সময় হতেই হবে। কারণ দুনিয়ায় প্রতিদান ও প্রতিবিধান আইনের নিরবিচ্ছিন্ন কার্যকারিতা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, মানুষের কার্যাবলীকে তার নৈতিক মূল্যমানের ভিত্তিতে ওজন করা এবং পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করাই বিশ্ব পরিচালনার চিরন্তন রীতি ও পদ্ধতি।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾

—তারা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে এ হুমকি কবে সত্য হবে?"[৮৮] বলো বিচিত্র কি যে, আযাবের ব্যাপারে তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছো তার একটি অংশ তোমাদের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।[৮৯] আসলে তোমার রব তো মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহকারী কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর গুযারী করে না।[৯০] নিসন্দেহে তোমার রব ভালোভাবেই জানেন যা কিছু তাদের অন্তর নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে।[৯১] আকাশ ও পৃথিবীর এমন কোন গোপন জিনিস নেই যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত আকারে নেই।[৯২]

এ দু'টি যুক্তির সাথে সাথে আলোচ্য আয়াতে আরো একটি উপদেশ রয়েছে। সেটি এই যে, পূর্ববর্তী অপরাধীদের পরিণতি দেখে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং আখেরাত অস্বীকার করার যে নির্বোধসূলভ বিশ্বাস তাদেরকে অপরাধীতে পরিণত করেছিল তার ওপর টিকে থাকার চেষ্টা করো না।

৮৭. অর্থাৎ তুমি তোমার বুঝাবার দায়িত্ব পালন করেছো। এখন যদি তারা না মেনে নেয় এবং নিজেদের নির্বোধসূলভ কর্মকাণ্ডের ওপর জিদ ধরে আল্লাহর আযাবের ভাগী হতে চায়, তাহলে অনর্থক তাদের অবস্থার জন্য হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত করে নিজেকে কষ্ট দাও কেন। আবার তারা সত্যের সাথে লড়াই এবং তোমার সংশোধন প্রচেষ্টাবলীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যেসব হীন চক্রান্ত করছে সেজন্য তোমার মনঃকষ্ট পাবার কোন কারণ নেই। তোমার পেছনে আছে আল্লাহর শক্তি। তারা তোমার কথা না মানলে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে, তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৮৮. উপরের আয়াতের মধ্যে যে হুমকি প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার কথাই এখানে বলা হয়েছে। এর অর্থ ছিল এই যে, এ আয়াতে পরোক্ষভাবে আমাদের শাস্তি দেবার যে কথা বলা হচ্ছে, তা কবে কার্যকর হবে? আমরা তো তোমার আহবান প্রত্যাখ্যান করেছি এবং তোমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তাহলে এখন আমাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না কেন?

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

যথার্থই এ কুরআন বনী ইসরাঈলকে বেশির ভাগ এমন সব কথার স্বরূপ বর্ণনা করে যেগুলোতে তারা মতভেদ করে।[৯৩] আর এ হচ্ছে পথ নির্দেশনা ও রহমত মু'মিনদের জন্য।[৯৪] নিশ্চয়ই (এভাবে) তোমার রব তাদের মধ্যেও[৯৫] নিজের হুকুমের মাধ্যমে ফায়সালা করে দেবেন, তিনি পরাক্রমশালী ও সবকিছু জানেন।[৯৬] কাজেই হে নবী! আল্লাহর উপর ভরসা করো, নিশ্চয়ই তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছো। তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারো না।[৯৭] যেসব বধির পেছন ফিরে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে নিজের আহবান পৌঁছাতে পারো না[৯৮] এবং অন্ধদেরকে পথ বাতলে দিয়ে বিপথগামী হওয়া থেকে বাঁচাতে পারো না।[৯৯] তুমি তো নিজের কথা তাদেরকে শুনাতে পারো যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং তারপর অনুগত হয়ে যায়।

৮৯. এটি একটি রাজসিক বাকভংগীমা। সর্বশক্তিমানের বাণীর মধ্যে যখন "সম্ভবত", "বিচিত্র কি" এবং "অসম্ভব কি" ধরনের শব্দাবলী এসে যায় তখন তার মধ্যে সন্দেহের কোন অর্থ থাকে না বরং তার মাধ্যমে একটি বেপরোয়া ভাব ফুটে ওঠে। অর্থাৎ তাঁর শক্তি এতই প্রবল ও প্রচণ্ড যে, তাঁর কোন জিনিস চাওয়া এবং তা হয়ে যাওয়া যেন একই ব্যাপার। তিনি কোন কাজ করতে চান এবং তা করা সম্ভব হলো না এমন কোন কথা কল্পনাও করা যেতে পারে না। এজন্য তাঁর পক্ষে "এমন হওয়া বিচিত্র কি" বলা এ অর্থ প্রকাশ করে যে, যদি তোমরা সোজা না হও তাহলে এমনটি হবেই। সামান্য একজন দারোগাও যদি পল্লীর কোন অধিবাসীকে বলে তোমার দুর্ভাগ্য হাতছানি দিচ্ছে। তাহলে তার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি কাউকে বলেন, তোমার দুঃসময় তেমন দূরে নয়, তাহলে এরপরও সে কিভাবে নির্ভয়ে দিন কাটায়।

৯০. অর্থাৎ লোকেরা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেন না বরং তাদের সামলে নেবার সুযোগ দেন, এটা তো রব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ।

কিন্তু অধিকাংশ লোক এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এ সুযোগ ও অবকাশকে নিজেদের সংশোধনের জন্য ব্যবহার করে না। বরং পাকড়াও হতে দেরী হচ্ছে দেখে মনে করে এখানে কোন পাকড়াওকারী নেই, কাজেই যা মন চায় করে যেতে থাকো এবং যে বুঝাতে চায় তার কথা বুঝতে যেয়ো না।

৯১. অর্থাৎ তিনি যে শুধু তাদের প্রকাশ্য কর্মতৎপরতাই জানেন তাই নয় বরং তারা মনের মধ্যে যেসব মারাত্মক ধরনের হিংসা–বিদ্বেষ লুকিয়ে রাখে এবং যে সব চক্রান্ত ও কূট কৌশলের কথা মনে মনে চিন্তা করতে থাকে, সেগুলোও তিনি জানেন। তাই যখন তাদের সর্বনাশের সময় এসে যাবে তখন তাদেরকে পাকড়াও করা যেতে পারে এমন একটি জিনিসও বাদ রাখা হবে না। এটি ঠিক এমন এক ধরনের বর্ণনা ভংগী যেমন একজন শাসক নিজ এলাকার কোন বদমায়েশকে বলে, তোমার সমস্ত কীর্তিকলাপের খবর আমি রাখি। এর অর্থ কেবল এতটুকুই হয় না যে, তিনি যে সবকিছুই জানেন একথা তাকে শুধু জানিয়েই দিচ্ছেন বরং এই সংগে এ অর্থও হয় যে, তুমি নিজের তৎপরতা থেকে বিরত হও, নয়তো মনে রেখো, যখন পাকড়াও হবে তখন প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য তোমাকে পুরোপুরি শাস্তি দেয়া হবে।

৯২. এখানে কিতাব মানে কুরআন নয় বরং মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর রেকর্ড, যাতে ছোট বড় ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সবকিছু রক্ষিত আছে।

৯৩. পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় বক্তব্যের সাথে একথাটির সম্পর্ক রয়েছে। পূর্ববর্তী বক্তব্যের সাথে এর সম্পর্ক হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ এই অদৃশ্যজ্ঞানী আল্লাহর জ্ঞানের একটি প্রকাশ হচ্ছে এই যে, একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ থেকে এ কুরআনে এমন সব ঘটনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হচ্ছে যা বনী ইসরাঈলের ইতিহাসে ঘটেছে। অথচ বনী ইসরাঈলের আলেমদের মধ্যেও তাদের নিজেদের ইতিহাসের এসব ঘটনার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে (এর নজির এ সূরা নামলের প্রথম দিকের রুকু'গুলোতেই পাওয়া যাবে, যেমন আমরা টীকায় বলেছি)। আর পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে এর সম্পর্ক হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ যেভাবে মহান আল্লাহ ঐসমস্ত মত বিরোধের ফায়সালা করে দিয়েছেন অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বিরোধীদের মধ্যেও যে মতবিরোধ চলছে তারও ফায়সালা করে দেবেন। তাদের মধ্যে কে সত্যপন্থী এবং কে মিথ্যাপন্থী তা তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবেন। কার্যত এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর মাত্র কয়েক বছর অতিক্রান্ত হতেই এ ফায়সালা দুনিয়ার সামনে এসে গেলো। গোটা আরব ভূমিতে এবং সমগ্র কুরাইশ গোত্রে এমন এক ব্যক্তি ছিল না যে একথা মেনে নেয়নি যে, আবু জেহেল ও আবু লাহাব নয় বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের নিজেদের সন্তানরাও একথা মেনে নিয়েছিল যে, তাদের বাপদাদারা ভুল ও মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৯৪. অর্থাৎ তাদের জন্য যারা এ কুরআনের দাওয়াত গ্রহণ করে এবং কুরআন যা পেশ করছে তা মেনে নেয়। এ ধরনের লোকেরা তাদের জাতি যে গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে তা থেকে রক্ষা পাবে। এ কুরআনের বদৌলতে তারা জীবনের সহজ সরল পথ লাভ করবে এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। কুরাইশ বংশীয় কাফেররা এর কল্পনাও আজ করতে পারে না। এ অনুগ্রহের বারিধারাও মাত্র কয়েক বছর পরই দুনিয়াবাসী দেখে

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝٨٢

আর যখন আমার কথা সত্য হবার সময় তাদের কাছে এসে যাবে[১০০] তখন আমি তাদের জন্য মৃত্তিকা গর্ভ থেকে একটি জীব বের করবো। সে তাদের সাথে কথা বলবে যে, লোকেরা আমাদের আয়াত বিশ্বাস করতো না।[১০১]

নিয়েছে। দুনিয়াবাসী দেখেছে, যেসব লোক আরব মরুর এক অখ্যাত অজ্ঞাত এলাকায় অবহেলিত জীবন যাপন করছিল এবং কুফরী জীবনে বড়জোর একদল সফল নিশাচর দস্যু হতে পারতো তারাই এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনার পর সহসাই সারা দুনিয়ার নেতা, জাতি সম্পদের পরিচালক, মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষক এবং দুনিয়ার একটি বিশাল ভূখণ্ডের শাসনকর্তায় পরিণত হয়ে গেছে।

৯৫. অর্থাৎ কুরাইশ বংশীয় কাফের ও মু'মিনদের মধ্যে।

৯৬. অর্থাৎ তাঁর ফায়সালা প্রবর্তন করার পথে কোন শক্তি বাধা দিতে পারে না এবং তাঁর ফায়সালার মধ্যে কোন ভুলের সম্ভাবনাও নেই।

৯৭. অর্থাৎ এমন ধরনের লোকদেরকে, যাদের বিবেক মরে গেছে এবং জিদ এক গুয়েমী ও রসমপূজা যাদের মধ্যে সত্য মিথ্যার পার্থক্য উপলব্ধি করার কোন প্রকার যোগ্যতাই বাকি রাখেনি।

৯৮. অর্থাৎ যারা তোমার কথা শুনবে না বলে শুধু কান বন্ধ করেই ক্ষান্ত হয় না বরং যেখানে তোমার কথা তাদের কানে প্রবেশ করতে পারে বলে তারা আশংকা করে সেখান থেকে তারা পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

৯৯. অর্থাৎ তাদের হাত ধরে জোর করে সোজা পথে টেনে আনা এবং তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলা তোমার কাজ নয়। তুমি তো কেবলমাত্র মুখের কথা এবং নিজের চারিত্রিক উদাহরণের মাধ্যমেই জানাতে পারো যে, এটি সোজা পথ এবং এসব লোক যে পথে চলছে সেটি ভুল পথ। কিন্তু যে নিজের চোখ বন্ধ করে নিয়েছে এবং যে একদম দেখতেই চায় না তাকে তুমি কেমন করে পথ দেখাতে পারো।

১০০. অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হবে, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

১০১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) বক্তব্য হচ্ছে, যখন দুনিয়ার বুকে সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার মতো কোন লোক থাকবে না তখনই এ ঘটনা ঘটবে। ইবনে মারদুইয়াহ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলছেন, তিনি একথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছিলেন। এ থেকে জানা যায়, যখন মানুষ সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করবে না তখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ একটি জীবের মাধ্যমে শেষ মামলা দায়ের করবেন। এটি একটিই জীব হবে অথবা একটি বিশেষ ধরনের প্রজাতির জীব বহু সংখ্যায় সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে, একথা সুস্পষ্ট নয়।

— دابة من الارض শব্দগুলোর মধ্যে দু'ধরনের অর্থের সম্ভাবনা আছে। মোটকথা সে যে কথা বলবে তা হবে এই ঃ আল্লাহর যেসব আয়াতের মাধ্যমে কিয়ামত আসার ও আখেরাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার খবর দেয়া হয়েছিল লোকেরা সেগুলো বিশ্বাস করেনি, কাজেই এখন দেখো সেই কিয়ামতের সময় এসে গেছে এবং জেনে রাখো, আল্লাহর আয়াত সত্য ছিল। "আর লোকেরা আমাদের আয়াত বিশ্বাস করতো না" এ বাক্যাংশটি সেই জীবের নিজের উক্তির উদ্ধৃতি হতে পারে অথবা হতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উক্তির বর্ণনা। যদি এটি তার কথার উদ্ধৃতি হয়ে থাকে, তাহলে এখানে "আমাদের" শব্দটি সে ঠিক তেমনিভাবে ব্যবহার করবে যেমন প্রত্যেক সরকারী কর্মচারী "আমরা" অথবা "আমাদের" শব্দ ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ সে সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলছে, ব্যক্তিগতভাবে নিজের পক্ষ থেকে বলছে না। দ্বিতীয় অবস্থায় কথা একেবারে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তার কথাকে যেহেতু নিজের ভাষায় বর্ণনা করছেন, তাই তিনি "আমাদের আয়াত" শব্দ ব্যবহার করেছেন।

এ জীব কখন বের হবে? এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং একদিন দিন দুপুরে এ জানোয়ার বের হয়ে আসবে। এর মধ্যে যে নিদর্শনটিই আগে দেখা যাবে সেটির প্রকাশ ঘটবে অন্যটির কাছাকাছিই।" (মুসলিম) মুসলিম, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থগুলোতে অন্য যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জালের আবির্ভাব। ভূগর্ভের প্রাণীর প্রকাশ, ধোঁয়া ও সূর্যের পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া— এগুলো এমন সব নিদর্শন যা একের পর এক প্রকাশ হতে থাকবে।

এ জীবের সারবস্তু (Quiddity) ও আকৃতি-প্রকৃতি কি, কোথায় থেকে এর প্রকাশ ঘটবে এবং এ ধরনের অন্যান্য অনেক বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার বক্তব্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো পরস্পর বিভিন্ন ও বিপরীতধর্মী। এগুলোর আলোচনা কেবলমাত্র মানসিক অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে সাহায্য করবে এবং এগুলো জেনে কোন লাভও নেই। কারণ কুরআনে যে উদ্দেশ্যে এর উল্লেখ করা হয়েছে এ বিস্তারিত বর্ণনার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

এখন ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ব্যাপার হলো, একটি প্রাণী এভাবে মানুষের সাথে মানুষের ভাষায় কথা বলার হেতু কি? আসলে এটি আল্লাহর অসীম শক্তির একটি নিদর্শন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বাকশক্তি দান করতে পারেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি তো শুধুমাত্র একটি প্রাণীকে বাকশক্তি দান করবেন কিন্তু যখন কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে তখন আল্লাহর আদালতে মানুষের চোখ, কান ও তার গায়ের চামড়া পর্যন্ত কথা বলতে থাকবে। যেমন কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .... وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ (حم السجدة: ٢١-٢٠)

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾ حَتّٰٓى إِذَا جَآءُوْ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾

৭ রুকূ'

আর সেদিনের কথা একবার চিন্তা করো, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে এমন সব লোকদের এক একটি দলকে ঘেরাও করে আনবো যারা আমার আয়াত অস্বীকার করতো। তারপর তাদেরকে (তাদের শ্রেণী অনুসারে স্তরে স্তরে) বিন্যস্ত করা হবে। অবশেষে যখন সবাই এসে যাবে তখন (তাদের রব তাদেরকে) জিজ্ঞেস করবেন, "তোমরা আমার আয়াত অস্বীকার করেছো অথচ তোমরা জ্ঞানগতভাবে তা আয়ত্ত করোনি?[১০২] যদি এ না হয়ে থাকে তাহলে তোমরা আর কি করছিলে"[১০৩] আর তাদের জুলুমের কারণে আযাবের প্রতিশ্রুতি তাদের ওপর পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তারা কিছুই বলতে পারবে না। তারা কি অনুধাবন করতে পারেনি, আমি তাদের প্রশান্তি অর্জন করার জন্য রাত তৈরি করেছিলাম এবং দিনকে উজ্জ্বল করেছিলাম?[১০৪] এরি মধ্যে ছিল অনেকগুলো নিদর্শন যারা ঈমান আনতো তাদের জন্য।[১০৫]

১০২. অর্থাৎ কোন তাত্বিক গবেষণার মাধ্যমে তোমরা এ আয়াতগুলোর মিথ্যা হবার কথা জানতে পেরেছিলে, এ আয়াতগুলো অস্বীকার করার পেছনে তোমাদের এ কারণ কখনোই ছিল না। তোমরা কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-অনুসন্ধান ছাড়াই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলে।

১০৩. অর্থাৎ যদি এমন না হয়, তাহলে কি তোমরা একথা প্রমাণ করতে পারবে যে, গবেষণা-অনুসন্ধানের পর তোমরা এ আয়াতগুলোকে মিথ্যা পেয়েছিলে এবং সত্যিই কি তোমরা এ আয়াতগুলোয় যা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রকৃত সত্য নয়, এ ধরনের কোন জ্ঞান লাভ করেছিলে?

১০৪. অর্থাৎ অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে এ দু'টি নিদর্শন এমন যে, তারা হরহামেশা তা দেখে আসছিল। তারা প্রতি মুহূর্তে এগুলোর সাহায্যে লাভবান হচ্ছিল। কোন অন্ধ, বধির ও বোবার কাছেও এ দু'টি গোপন ছিল না। কেন তারা রাতের বেলা আরাম করার মুহূর্তে

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ۝٨٧ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۝٨٨

আর কি হবে সেদিন যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং ভীত–বিহবল হয়ে পড়বে আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই[১০৬]—তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ এ ভীতি–বিহবলতা থেকে রক্ষা করতে চাইবেন—আর সবাই তাঁর সামনে হাজির হবে কান চেপে ধরে। আজ তুমি দেখছো পাহাড়গুলোকে এবং মনে করছো ভালই জমাটবদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু সে সময় এগুলো মেঘের মতো উড়তে থাকবে। এ হবে আল্লাহর কুদরতের মূর্ত প্রকাশ, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে বিজ্ঞতা সহকারে সুসংবদ্ধ করেছেন? তিনি ভালোভাবেই জানেন তোমরা কি করছো।[১০৭]

এবং দিনের সুযোগে লাভবান হবার সময় একথা চিন্তা করেনি যে, এক মহাবিজ্ঞ ও বিজ্ঞানময় সত্তা এ ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন এবং তিনি তাদের যথাযথ প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছেন? এটি কোন আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না। কারণ এর মধ্যে উদ্দেশ্যমুখীনতা, বিজ্ঞানময়তা ও পরিকল্পনা গঠনের ধারা প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে। এগুলো কোন অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির গুণাবলীও হতে পারে না। আবার এগুলো বহু খোদার কার্যপ্রণালীও নয়। কারণ নিসন্দেহে এ ব্যবস্থা এমন কোন এক জনই স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক–ব্যবস্থাপক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যিনি পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য সকল গ্রহ–নক্ষত্রের ওপর কর্তৃত্ব করছেন। কেবলমাত্র এ একটি জিনিস দেখেই তারা জানতে পারতো যে, সেই একক স্রষ্টা তাঁর রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে সত্য বর্ণনা করেছেন এ রাত ও দিনের আবর্তন তারই সত্যতা প্রমাণ করছে।

১০৫. অর্থাৎ এটি কোন দুর্বোধ্য কথাও ছিল না। তাদেরই ভাই–বন্ধু তাদেরই বংশ ও গোত্রের লোক এবং তাদেরই মত মানুষরাই তো এ নিদর্শনগুলো দেখে স্বীকার করেছিল যে, নবী যে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও তাওহীদের দিকে আহবান জানাচ্ছেন তা প্রকৃত সত্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল।

১০৬. শিংগার ফুৎকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন'আম ৪৭, সূরা ইবরাহীম ৫৭, সূরা তা–হা ৭৮, সূরা হজ্জ ১, সূরা ইয়াসীন ৪৬–৪৭ এবং সূরা যুমার ৭৯ টীকা।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার চেয়ে বেশী ভালো প্রতিদান পাবে[১০৮] এবং এ ধরনের লোকেরা সেদিনের ভীতি-বিহ্বলতা থেকে নিরাপদ থাকবে।[১০৯] আর যারা অসৎকাজ নিয়ে আসবে, তাদের সবাইকে অধোমুখে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা কি যেমন কর্ম তেমন ফল—ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান পেতে পারো?[১০৯(ক)]

("হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো) আমাকে তো হুকুম দেয়া হয়েছে, আমি এ শহরের রবের বন্দেগী করবো, যিনি একে হারামে পরিণত করেছেন এবং যিনি সব জিনিসের মালিক।[১১০] আমাকে মুসলিম হয়ে থাকার এবং এ কুরআন পড়ে শুনাবার হুকুম দেয়া হয়েছে।" এখন যে হেদায়াত অবলম্বন করবে সে নিজেরই ভালোর জন্য হেদায়াত অবলম্বন করবে এবং যে গোমরাহ হবে তাকে বলে দাও, আমি তো কেবলমাত্র একজন সতর্ককারী। তাদেরকে বলো, প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, শিগ্‌গির তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে দেবেন এবং তোমরা তা চিনে নেবে। আর তোমরা যেসব কাজ করো তা থেকে তোমার রব বেখবর নন।

১০৭. এ ধরনের গুণ সম্পন্ন আল্লাহর কাছে আশা করো না যে, তাঁর দুনিয়ায় তোমাদের বুদ্ধি-জ্ঞান, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার যোগ্যতা এবং তাঁর প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষমতা দান করার পর তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বেখবর থাকবেন। তাঁর যমীনে বসবাস করে তোমরা তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতা-ইখতিয়ার কিভাবে ব্যবহার করছো তা তিনি দেখবেন না, এমনটি হতে পারে না।

১০৮. অর্থাৎ এদিক দিয়েও সে ভালো অবস্থায় থাকবে যে, যতটুকু সৎকাজ সে করবে তার তুলনায় বেশী পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। আবার এদিক দিয়েও যে, তার সৎকাজ তো ছিল সাময়িক এবং তার প্রভাবও দুনিয়ায় সীমিত কালের জন্য ছিল কিন্তু তার পুরস্কার হবে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী।

১০৯. অর্থাৎ কিয়ামত, হাশর ও বিচারের দিনের ভয়াবহতা সত্য অস্বীকারকারীদেরকে ভীত, সন্ত্রস্ত, হত–বিহবল ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় করে দিতে থাকবে এবং তাদের মাঝখানে এ সৎকর্মশীল লোকেরা নিশ্চিন্তে অবস্থান করবে। কারণ এসব কিছু ঘটবে তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী। ইতিপূর্বেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের দেয়া খবর অনুযায়ী তারা ভালোভাবেই জানতো, কিয়ামত হবে, আর একটি ভিন্ন জীবনধারা শুরু হয়ে যাবে এবং সেখানে এসব কিছুই হবে। তাই যারা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এ বিষয়গুলো অস্বীকার করে এসেছে এবং এগুলো থেকে গাফিল থেকেছে তারা যে ধরনের আতংকিত ও ভীত–সন্ত্রস্ত হবে, এ সৎকর্মশীলরা তেমনটি হবে না। তারপর তাদের নিশ্চিন্ততার আরো কারণ হবে এই যে, তারা এ দিনটির প্রত্যাশা করে এর জন্য প্রস্তুতির কথা চিন্তা করেছিল এবং এখানে সফলতা লাভ করার জন্য কিছু সাজ–সরঞ্জামও দুনিয়া থেকে সংগে করে এনেছিল। তাই তারা তেমন কোন আতংকের শিকার হবে না যেমন আতংকের শিকার হবে এমনসব লোক যারা নিজেদের জীবনের সমস্ত পুঁজি ও উপায়–উপকরণ দুনিয়াবী কামিয়াবী হাসিলের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছিল এবং কখনো একথা চিন্তা করেনি যে, পরকাল বলে একটি জীবন আছে এবং সেখানকার জন্য কিছু সাজ সরঞ্জামও তৈরী করতে হবে। অস্বীকারকারীদের বিপরীতে এ মু'মিনরা এখন নিশ্চিন্ত হবে। তারা মনে করবে, যেদিনের জন্য আমরা অবৈধ লাভ ও আনন্দ ত্যাগ করেছিলাম এবং বিপদ ও কষ্ট বরদাশ্‌ত করেছিলাম সে দিনটি এসে গেছে, কাজেই এখন এখানে আমাদের পরিশ্রমের ফল নষ্ট হবে না।

১০৯(ক). কুরআন মজীদের বহু জায়গায় একথা সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, আখেরাতে অসৎ কাজের প্রতিদান ঠিক ততটাই দেয়া হবে যতটা কেউ অসৎ কাজ করেছে এবং সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ মানুষের প্রকৃত কাজের তুলনায় অনেক বেশী দেবেন। এ সম্পর্কিত আরো বেশী দৃষ্টান্তের জন্য দেখুন সূরা ইউনুস ২৬–২৭, আল কাসাস ৮৪, আনকাবুত ৭, সাবা ৩৭–৩৮ এবং আল মু'মিন ৪০ আয়াত।

১১০. এ সূরা যেহেতু এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন ইসলামের দাওয়াত কেবলমাত্র মক্কা মু'আয্‌যমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এ দাওয়াতে কেবলমাত্র মক্কার অধিবাসীদেরকেই সম্বোধন করা হচ্ছিল। তাই বলা হয়েছে ঃ "আমাকে এ শহরের রবের বন্দেগী করার হুকুম দেয়া হয়েছে।" এ সংগে এ রবের যে বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি একে সুরক্ষিত ও পবিত্রতম স্থানে পরিণত করেছেন। এর উদ্দেশ্য মক্কার কাফেরদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া যে, চরম অশান্তি, হানাহানি, যুদ্ধবিগ্রহ, ও রক্তপাত বিধ্বস্ত আরব ভূখণ্ডের এ শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করে যে আল্লাহ তোমাদের প্রতি এ বিপুল অনুগ্রহ করেছেন এবং যাঁর অনুগ্রহে তোমাদের এ শহর সমগ্র আরব দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, তোমরা তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে চাইলে হতে পারো কিন্তু আমাকে তো হুকুম দেয়া হয়েছে আমি যেন তার

কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হই এবং তাঁরই সামনে নিজের বিনয় ও নম্রতার শির নত করি। তোমরা যাদেরকে উপাস্য বানিয়েছ তাদের কারো এ শহরকে হারামে পরিণত করার এবং আরবের যুদ্ধপ্রিয় ও লুটেরা গোত্রগুলোকে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য করার ক্ষমতা ছিল না। কাজেই আসল অনুগ্রহকারীকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তার সামনে মাথা নত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় যাদের আমার প্রতি সামান্যতমও অনুগ্রহ ও অবদান নেই।

আল কাসাস

২৮

নামকরণ

২৫ আয়াতের وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ বাক্যাংশ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরায় الْقَصَص শব্দটি এসেছে। আভিধানিক অর্থে কাসাস বলতে ধারাবাহিকভাবে ঘটনা বর্ণনা করা বুঝায়। এ দিক দিয়ে এ শব্দটি অর্থের দিক দিয়েও এ সূরার শিরোনাম হতে পারে। কারণ এর মধ্যে হযরত মূসার কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরা নাম্‌লের ভূমিকায় আমি ইবনে আব্বাস (রা) ও জাবের ইবনে যায়দের (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করে এসেছি। তাতে বলা হয়েছিল, সূরা শু'আরা, সূরা নাম্‌ল ও সূরা কাসাস একের পর এক নাযিল হয়। ভাষা, বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু থেকেও একথাই অনুভূত হয় যে, এ তিনটি সূরা প্রায় একই সময় নাযিল হয়। আবার এদিক দিয়েও এদের মধ্যে নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে যে, এ সূরাগুলোতে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনীর যে বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো পরস্পর মিলিত আকারে একটি পূর্ণ কাহিনীতে পরিণত হয়ে যায়। সূরা শু'আরায় নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ করার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করে হযরত মূসা বলেন ঃ "ফেরাউনী জাতির বিরুদ্ধে একটি অপরাধের জন্য আমি দায়ী। এ কারণে আমার ভয় হচ্ছে, সেখানে গেলেই তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।" তারপর হযরত মূসা যখন ফেরাউনের কাছে যান তখন সে বলে ঃ "আমরা কি তোমাকে আমাদের এখানে ছোট্ট শিশুটি থাকা অবস্থায় লালন পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের এখানে কয়েক বছর থাকার পর যা করে গেছো তাতো করেছই।" এ দু'টি কথার কোন বিস্তারিত বর্ণনা সেখানে নেই। এ সূরায় তার বিস্তারিত বিবরণ এসে গেছে। অনুরূপভাবে সূরা নাম্‌লে এ কাহিনী সহসা একথার মাধ্যমে শুরু হচ্ছে যে, হযরত মূসা তাঁর পরিবার পরিজনদের নিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ তিনি একটি আগুন দেখলেন। এটা কোন্‌ ধরনের সফর ছিল, তিনি কোথায় থেকে আসছিলেন এবং কোথায় যাচ্ছিলেন এর কোন বিবরণ সেখানে নেই। এর বিস্তারিত বিবরণ এ সূরায় পাওয়া যায়। এভাবে এ তিনটি সূরা মিলে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করেছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে যেসব ওজুহাত পেশ করা হচ্ছিল সেগুলো নাকচ করে দেয়া।

এ উদ্দেশ্যে প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে হযরত মূসার কাহিনী। সূরা নাযিলের সময়কালীন অবস্থার সাথে মিলে এ কাহিনী স্বতস্ফূর্তভাবেই শ্রোতার মনে কতিপয় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় :

এক : আল্লাহ যা কিছু করতে চান সে জন্য তিনি সবার অলক্ষ্যে কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। যে শিশুর হাতে শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের রাজত্বের অবসান ঘটবার কথা, তাকে আল্লাহ স্বয়ং ফেরাউনের গৃহে তার নিজের হাতেই প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন এবং ফেরাউন জানতে পারেনি সে কাকে প্রতিপালন করছেন। সেই আল্লাহর ইচ্ছার সাথে কে লড়াই করতে পারে এবং তাঁর মোকবিলায় কার কৌশল সফল হতে পারে।

দুই : কোন বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে এবং আকাশ ও পৃথিবীতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার মাধ্যমে কাউকে এ নবুওয়াত দান করা হয় না। তোমরা অবাক হচ্ছো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথা থেকে চুপিচুপি এ নবুওয়াত লাভ করলেন এবং ঘরে বসে বসে তিনি কেমন করে নবী হয়ে গেলেন। কিন্তু তোমরা নিজেরাই যে মূসা আলাইহিস সালামের বরাত দিয়ে থাক যে, لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ (৪৮ আয়াত) তিনিও এভাবে পথে চলার সময় নবুওয়াত লাভ করেছিলেন এবং সেদিন সিনাই পাহাড়ের নিঝুম উপত্যকায় কি ঘটনা ঘটে গেলো তা ঘূণাক্ষরেও কেউ জানতে পারলো না। মূসা নিজেও এক সেকেণ্ড আগে জানতেন না তিনি কি জিনিস পেতে যাচ্ছেন। যাচ্ছিলেন আগুন আনতে, পেয়ে গেলেন পয়গম্বরী।

তিন : যে বান্দার সাহায্যে আল্লাহ কোন কাজ নিতে চান, কোন দলবল-সেনাবাহিনী ও সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই তার উত্থান ঘটে থাকে। কেউ তাঁর সাহায্যকারী হয় না। বাহ্যত তার কাছে কোন শক্তির বহর থাকে না। কিন্তু বড় বড় দলবল, সেনাবাহিনী ও সাজ-সরঞ্জাম ওয়ালারা শেষ পর্যন্ত তার মোকাবিলায় ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যায়। তোমরা আজ তোমাদের ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে যে আনুপাতিক পার্থক্য দেখতে পাচ্ছো তার চেয়ে অনেক বেশী পার্থক্য ছিল মূসা আলাইহিস সালাম ও ফেরাউনের শক্তির মধ্যে। কিন্তু দেখে নাও কে জিতলো এবং কে হারলো।

চার : তোমরা বার বার মূসার বরাত দিয়ে থাকো। তোমরা বলে থাকো, মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা মুহাম্মাদকে দেয়া হলো না কেন? অর্থাৎ লাঠি, সাদা হাত ও অন্যান্য প্রকাশ্য মু'জিযাসমূহ। ভাবখানা এ রকম যেন তোমরা ঈমান আনার জন্য তৈরি হয়েই বসে আছো, এখন শুধু তোমাদেরকে সেই মু'জিযাগুলো দেখাতে হবে যা মূসা ফেরাউনকে দেখিয়েছিলেন। তোমরা তার অপেক্ষায় রয়েছো। কিন্তু যাদেরকে এসব মু'জিযা দেখানো হয়েছিল তারা কি করেছিল তা কি তোমরা জানো? তারা এগুলো দেখেও ঈমান আনেনি। তারা নির্দ্বিধায় বলেছিল, এসব জাদু। কারণ তারা সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও হঠকারিতায় লিপ্ত হয়েছিল। এই একই রোগে আজ তোমরাও ভুগছো। তোমরা কি ঐ ধরনের মু'জিযা দেখে ঈমান আনবে? তারপর তোমরা কি এ খবরও রাখো, যারা ঐ মু'জিযা দেখে সত্যকে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল? শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এখন তোমরাও কি একই প্রকার হঠকারিতা সহকারে মু'জিযার দাবী জানিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাচ্ছো?

মক্কার কুফরী ভারাক্রান্ত পরিবেশে যে ব্যক্তি হযরত মূসার এ কাহিনী শুনতো তার মনে কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই আপনা আপনিই একথাগুলো বদ্ধমূল হয়ে যেতো। কারণ সেসময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মক্কার কাফেরদের মধ্যে ঠিক তেমনি ধরনের একটি দ্বন্দ্ব–সংঘাত চলছিল যেমন ইতিপূর্বে চলেছিল ফেরাউন ও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে। এ অবস্থায় এ কাহিনী শুনাবার অর্থ ছিল এই যে, এর প্রত্যেকটি অংশ সম সাময়িক অবস্থার ওপর আপনা আপনি প্রযুক্ত হয়ে যেতে থাকবে। যদি এমন একটি কথাও না বলা হয়ে থাকে যার মাধ্যমে কাহিনীর কোন্ অংশটি সে সময়ের কোন্ অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল তা জানা যায়, তাহলেও তাতে কিছু এসে যায় না।

এরপর পঞ্চম রুকু' থেকে মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা শুরু হয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মী তথা নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও দু'হাজার বছর আগের ঐতিহাসিক ঘটনা একেবারে হুবহু শুনিয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাঁর শহর ও তাঁর বংশের লোকেরা ভালোভাবেই জানতো, তাঁর কাছে এসব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উপযুক্ত কোন উপায় উপকরণ ছিল না। প্রথমে এ বিষয়টিকে তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

তারপর তাঁকে নবুওয়াত দান করার ব্যাপারটিকে তাদের পক্ষে আল্লাহর রহমত হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ তারা গাফিলতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল এবং আল্লাহ তাদের সৎপথ দেখাবার জন্য এ ব্যবস্থা করেন।

তারপর তারা বারবার "এই নবী এমন সব মু'জিযা আনছেন না কেন? যা ইতিপূর্বে মূসা এনেছিলেন।" এ মর্মে যে অভিযোগ করছিল তার জবাব দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয়, মূসার ব্যাপারে তোমরা স্বীকার করছো যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'জিযা এনেছিলেন। কিন্তু তাঁকেই বা তোমরা কবে মেনে নিয়েছিলে? তাহলে এখন এ নবীর মু'জিযার দাবী করছো কেন? তোমরা যদি প্রবৃত্তির কামনা–বাসনার দাসত্ব না করো, তাহলে সত্য এখনো তোমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি এ রোগে ভুগতে থাকো, তাহলে যে কোন মু'জিযা আসুক না কেন তোমাদের চোখ খুলবে না।

তারপর সে সময়কার একটি ঘটনার ব্যাপারে মক্কার কাফেরদেরকে শিক্ষা ও লজ্জা দেয়া হয়েছে। ঘটনাটি ছিল ঃ সে সময় বাইর থেকে কিছু খৃস্টান মক্কায় আসেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে কুরআন শুনে ঈমান আনেন। কিন্তু মক্কার লোকেরা নিজেদের গৃহের এ নিয়ামত থেকে লাভবান তো হলোই না। উপরন্তু আবু জেহেল প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে।

সবশেষে মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা না মানার জন্য তাদের পক্ষ থেকে যে আসল ওযর পেশ করতো সে প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। তারা বলতো, যদি আরববাসীদের প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করে আমরা এ নতুন তাওহীদী ধর্ম গ্রহণ করি, তাহলে সহসাই এদেশ থেকে আমাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। তখন আমাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছুবে যার ফলে আমরা আরবের সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী গোত্রের মর্যাদা হারিয়ে বসবো এবং এ

ভূ-খণ্ডে আমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থলও থাকবে না। এটিই ছিল কুরাইশ সরদারদের সত্য বৈরিতার মূল উদ্যোক্তা। অন্যান্য সমস্ত সন্দেহ, অভিযোগ, আপত্তি ছিল নিছক বাহানাবাজী। জনগণকে প্রতারিত করার জন্য তারা সেগুলো সময়মতো তৈরী করে নিতো। তাই আল্লাহ সূরার শেষ পর্যন্ত এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এক একটি দিকের ওপর আলোকপাত করে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এমন সমস্ত মৌলিক রোগের চিকিৎসা করেছেন যেগুলোর কারণে তারা পার্থিব ও বৈষয়িক স্বার্থের দৃষ্টিতে সত্য ও মিথ্যার ফায়সালা করতো।

طسٓمٓ (١) تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ (٢) نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٣) اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ (٤)

তা–সীন–মীম। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি মূসা ও ফেরাউনের কিছু যথাযথ বৃত্তান্ত তোমাকে শুনাচ্ছি[১] এমনসব লোকদের সুবিধার্থে যারা ঈমান আনে।[২]

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ফেরাউন পৃথিবীতে বিদ্রোহ করে[৩] এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়।[৪] তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে সে লাঞ্ছিত করতো, তাদের ছেলেদের হত্যা করতো এবং মেয়েদের জীবিত রাখতো।[৫] আসলে সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তরভুক্ত ছিল।

১. তুলনামূলক অধ্যায়নের জন্য দেখুন আল বাকারাহ ৬ রুকূ', আল আ'রাফ ১৩–১৬ রুকূ', ইউনুস ৮–৯ রুকূ', হূদ ৯ রুকূ', বনী ইসরাঈল ১২ রুকূ', মারয়াম ৪ রুকূ', তা–হা ১–৪ রুকূ, আল মু'মিনুন ৩ রুকূ', আশ্ শু'আরা ২–৪ রুকূ', আন নামূল ১ রুকূ', আল আনকাবুত ৪ রুকূ, আল মুমিন ৩–৫ রুকূ, আয্ যুখ্রুফ ৫ রুকূ', আদ্ দুখান ১ রুকূ', আয্ যারিয়াত ২ রুকূ, এবং আন্নাযিআ'ত ১ রুকূ'।

২. অর্থাৎ যারা কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয় তাদেরকে কথা শুনানো তো অর্থহীন। তবে যারা মনের দুয়ারে এক গুঁয়েমীর তালা ঝুলিয়ে রাখে না। এ আলোচনায় তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

৩. মূলে عَلَا فِى الْاَرْضِ শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সে পৃথিবীতে মাথা উঠিয়েছে, বিদ্রোহাত্মক নীতি অবলম্বন করেছে, নিজের আসল মর্যাদা অর্থাৎ দাসত্বের স্থান থেকে উঠে স্বেচ্ছাচারী ও প্রভুর রূপ ধারণ করেছে, অধীন হয়ে

থাকার পরিবর্তে প্রবল হয়ে গেছে এবং স্বৈরাচারী ও অহংকারী হয়ে জুলুম করতে শুরু করেছে।

৪. অর্থাৎ তার রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী আইনের চোখে দেশের সকল অধিবাসী সমান থাকেনি এবং সবাইকে সমান অধিকারও দেয়া হয়নি। বরং সে সভ্যতা–সংস্কৃতি ও রাজনীতির এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যার মাধ্যমে রাজ্যের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হয়। একদলকে সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ অধিকার দিয়ে শাসক দলে পরিণত করা হয় এবং অন্যদলকে অধীন করে পদানত, পর্যুদস্ত, নিষ্পেষিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়।

এখানে কারো এ ধরনের সন্দেহ করার অবকাশ নেই যে, ইসলামী রাষ্ট্রেও তো মুসলিম ও জিম্মীর মধ্যে ফারাক করা হয় এবং তাদের অধিকার ও ক্ষমতাও সকল দিক দিয়ে সমান রাখা হয়নি। এ সন্দেহ এজন্য সঠিক নয় যে, ফেরাউনী বিধানে যেমন বংশ, বর্ণ, ভাষা বা শ্রেণীগত বিভেদের ওপর বৈষম্যের ভিত্ রাখা হয়েছে ইসলামী বিধানে ঠিক তেমনটি নয়। বরং ইসলামী বিধানে নীতি ও মতবাদের ওপর এর ভিত রাখা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যিম্মী ও মুসলমানের মধ্যে আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রে মোটেই কোন ফারাক নেই। সকল পার্থক্য একমাত্র রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে। আর এ পার্থক্যের কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, একটি আদর্শিক রাষ্ট্রে শাসকদল একমাত্র তারাই হতে পারে যারা হবে রাষ্ট্রের মূলনীতির সমর্থক। এদলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি শামিল হতে পারে যে এ মূলনীতি মেনে নেবে এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি এর বাইরে অবস্থান করবে যে এ মূলনীতি মেনে নেবে না। এ পার্থক্য ও ফেরাউনী ধরনের পার্থক্যের মধ্যে কোন মিল নেই। কারণ, ফেরাউনী পার্থক্যের ভিত্তিতে পরাধীন প্রজন্মের কোন ব্যক্তি কখনো শাসক দলে শামিল হতে পারে না। সেখানে পরাধীন প্রজন্মের লোকেরা রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার তো দূরের কথা মৌলিক মানবিক অধিকারও লাভ করে না। এমন কি জীবিত থাকার অধিকারও তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। সেখানে কখনো পরাধীনদের জন্য কোন অধিকারের জামানত দেয়া হয় না। সব ধরনের স্বার্থ, মুনাফা, সুযোগ–সুবিধা ও মর্যাদা একমাত্র শাসক সমাজের জন্য নির্দিষ্ট থাকে এবং এ বিশেষ অধিকার একমাত্র শাসক জাতির মধ্যে জন্মলাভকারী ব্যক্তিই লাভ করে।

৫. বাইবেলে এর নিম্নরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঃ "পরে মিসরের উপরে এক নতুন রাজা উঠিলেন, তিনি যোষেফকে জানিতেন না। তিনি আপন প্রজাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমাদের অপেক্ষা ইস্রায়েল–সন্তানদের জাতি বহু সংখ্যক ও বলবান; আইস, আমরা তাহাদের সহিত বিবেচনা পূর্বক ব্যবহার করি, পাছে তাহারা বাড়িয়া উঠে,এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারাও শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করে, এবং এদেশ হইতে প্রস্থান করে। অতএব তাহারা ভার বহন দ্বারা উহাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য উহাদের উপরে কার্য্য শাসকদিগকে নিযুক্ত করিল। আর উহারা ফরৌণের নিমিত্ত ভাণ্ডারের নগর পিথোম ও রামিষেষ গাঁথিল। কিন্তু উহারা তাহাদের দ্বারা যত দুঃখ পাইল, ততই বৃদ্ধি পাইতে ও ব্যাপ্ত হইতে লাগিল; তাই ইস্রায়েল সন্তানদের বিষয়ে তাহারা অতিশয়

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝

আমি সংকল্প করেছিলাম, যাদেরকে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবো, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করবো,[৬] তাদেরকেই উত্তরাধিকারী করবো,[৭] পৃথিবীতে তাদেরকে কর্তৃত্ব দান করবো। এবং তাদের থেকে ফেরাউন, হামান[৮] ও তার সৈন্যদেরকে সে সবকিছুই দেখিয়ে দেবো, যার আশংকা তারা করতো।

উদ্বিগ্ন হইল। আর মিস্রীয়েরা নির্দয়তা পূর্বক ইস্রায়েল সন্তানদিগকে দাস্যকর্ম করাইল, তাহারা কর্দম, ইষ্টক ও ক্ষেত্রের সমস্ত কার্যে কঠিন দাস্যকর্ম দ্বারা উহাদের প্রাণ তিক্ত করিতে লাগিল। তাহারা উহাদের দ্বারা যে যে দাস্যকর্ম-করাইত, সে সমস্ত নির্দয়তা পূর্বক করাইত। পরে মিসরের রাজা শিফ্রা নামে ও পূয়া নামে দুই ইব্রীয়া ধাত্রীকে একথা কহিলেন, যে সময়ে তোমরা ইব্রীয় স্ত্রীলোকদের ধাত্রী কার্য করিবে ও তাহাদিগকে প্রসব আধারে দেখিবে, যদি পুত্র সন্তান হয়, তাহাকে বধ করিবে; আর যদি কন্যা হয়, তাহাকে জীবিত রাখিবে।" (যাত্রাপুস্তক ১ ঃ ৮-১৬)

এ থেকে জানা যায়, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগ অতিক্রান্ত হবার পর মিসরে একটি জাতীয়তাবাদী বিপ্লব সাধিত হয়েছিল এবং কিবতীদের হাতে যখন পুনর্বার শাসন ক্ষমতা এসেছিল তখন নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার বনী ইসরাঈলের শক্তি নির্মূল করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এ ব্যাপারে শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছিত ও পদদলিত এবং তাদেরকে নিকৃষ্ট ধরনের সেবা কর্মের জন্য নির্দিষ্ট করেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি বরং এ থেকে আরো অগ্রসর হয়ে তাদের ছেলেদের হত্যা করে কেবলমাত্র মেয়েদের জীবিত রাখার নীতি অবলম্বন করা হয়, যাতে করে তাদের মেয়েরা ধীরে ধীরে কিবৃতীদের কর্তৃত্বাধীনে এসে যেতে থাকে এবং তাদের থেকে ইসরাঈলের পরিবর্তে কিবতীদের বংশ বিস্তার লাভ করে। তালমূদ এর আরো বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দিয়েছে যে, হযরত ইউসুফের ইন্তিকালের সময় থেকে একশতকের কিছু বেশী সময় অতিক্রান্ত হবার পর এ বিপ্লব আসে। সেখানে বলা হয়েছে, নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার প্রথমে বনী ইসরাঈলকে তাদের উর্বর কৃষিক্ষেত, বাসগৃহ ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। তারপর তাদেরকে বিভিন্ন সরকারী পদ থেকে বেদখল করে দেয়। এরপরও যখন কিবৃতী শাসকরা অনুভব করে যে, বনী ইসরাঈল ও তাদের সমধর্মাবলম্বী মিসরীয়রা যথেষ্ট শক্তিশালী তখন তারা ইসরাঈলীদেরকে লাঞ্ছিত ও হীনবল করতে থাকে এবং তাদের থেকে কঠিন পরিশ্রমের কাজ সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বা বিনা পারিশ্রমিকেই নিতে থাকে। কুরআনে এক

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ⑦ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ⑧ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑨

আমি[৯] মূসার মাকে ইশারা করলাম, "একে স্তন্যদান করো, তারপর যখন এর প্রাণের ভয় করবে তখন একে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে এবং কোন ভয় ও দুঃখ করবে না, তাকে তোমারই কাছে ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রসূলদের অন্তরভুক্ত করবো।"[১০] শেষ পর্যন্ত ফেরাউনের পরিবারবর্গ তাকে (দরিয়া থেকে) উঠিয়ে নিল, যাতে সে তাদের শত্রু এবং তাদের দুঃখের কারণ হয়।[১১] যথার্থই ফেরাউন, হামান ও তার সৈন্যরা (তাদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে) ছিল বড়ই অপরাধী। ফেরাউনের স্ত্রী (তাকে) বললো, "এ শিশুটি আমার ও তোমার চোখ জুড়িয়েছে। কাজেই একে হত্যা করো না, বিচিত্র কি সে আমাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেই গ্রহণ করতে পারি।"[১২] আর তারা (এর পরিণাম) জানতো না।

জায়গায় বলা হয়েছে যে, "তারা মিসরের অধিবাসীদের একটি গোষ্ঠীকে লাঞ্ছিত ও হীনবল করতো" এ বক্তব্য সেই উক্তির ব্যাখ্যা বিবেচিত হতে পারে। আর সূরা আল বাকারায় আল্লাহ যে বলেছেন, ফেরাউনের বংশধররা বনী ইসরাঈলকে কঠোর শাস্তি দিতো। يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ এরও ব্যাখ্যা এটিই।

কিন্তু বাইবেল ও কুরআনে এ ধরনের কোন আলোচনা নেই যাতে বলা হয়েছে যে, কোন জোতিষী ফেরাউনকে বলেছিল, বনী ইসরাঈলে একটি শিশু জন্ম নেবে, তার হাতে ফেরাউনী কর্তৃত্বের মৃত্যু ঘটবে এবং এ বিপদের পথ রোধ করার জন্য ফেরাউন ইসরাঈলীদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। অথবা ফেরাউন কোন ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছিল এবং তার তা'বীর এভাবে দেয়া হয়েছিল যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এ ধরনের বিশেষ গুণ বিশিষ্ট শিশু জন্ম নেবে। তালমূদ ও অন্যান্য ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে এ কাহিনী আমাদের মুফাস্সিরগণ উদ্ধৃত করেছেন। (দেখুন জুয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, নিবন্ধ "মূসা" এবং The Talmud selections. P.123-24)

৬. অর্থাৎ তাদেরকে দুনিয়ায় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দান করবো।

৭. অর্থাৎ তাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকার দান করবো এবং তারা হবে রাষ্ট্র পরিচালক ও শাসনকর্তা।

৮. পশ্চিমা প্রাচ্যবিদরা এ বিষয়টি নিয়ে বেশ ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন যে, হামান তো ছিল ইরানের বাদশাহ আখৃসোবীরাস অর্থাৎ খাশিয়ারশার (Xerxes) দরবারের একজন আমীর। আর এ বাদশাহর আমল হযরত মূসার শত শত বছর পরে খৃঃ পূঃ ৪৮৬ ও ৪৬৫ সালে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআন তাকে মিসরে নিয়ে গিয়ে ফেরাউনের মন্ত্রী বানিয়ে দিয়েছে। তাদের বিবেকবুদ্ধি যদি বিদ্বেষের আবরণে আচ্ছাদিত না থাকতো, তাহলে তারা নিজেরাই এ বিষয়টি ভেবে দেখতে পারতো। আখসোবীরাসের সভাসদ হামানের পূর্বে দুনিয়ায় এ নামে আর কোন ব্যক্তি কোথাও ছিল কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলার মতো তাদের কাছে কি এমন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে? যে ফেরাউনের আলোচনা এখানে হচ্ছে যদি তার সমস্ত মন্ত্রী, আমীর–উমরাহ ও সভাসদদের কোন পূর্ণাঙ্গ তালিকা একেবারে নির্ভরযোগ্য সূত্রে কোন প্রাচ্যবিদ সাহেব পেয়ে গিয়ে থাকেন, যাতে হামানের নাম নেই, তাহলে তিনি তা লুকিয়ে রেখেছেন কেন? এখনই তার ফটোকপি তাঁর ছাপিয়ে দেয়া উচিত। কারণ কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য এর চেয়ে বড় প্রভাবশালী অস্ত্র আর তিনি পাবেন না।

৯. মাঝখানে এ আলোচনা উহ্য রাখা হয়েছে যে, এ অবস্থায় এক ইসরাইলী পরিবারে একটি শিশুর জন্ম হয়, সারা দুনিয়া যাকে মূসা আলাইহিস সালাম বলে জানে। বাইবেল ও তালমুদের বর্ণনা অনুযায়ী এটি ছিল হযরত ইয়াকুবের পুত্র লাভীর সন্তানদের মধ্য থেকে কারোর পরিবার। ঐ গ্রন্থ দু'টিতে হযরত মূসার পিতার নাম বলা হয়েছে ঈমরাম। কুরআন একেই ঈমরান শব্দের মাধ্যমে উচ্চারণ করেছে। মূসা আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে তাঁদের আরো দু'টি সন্তান হয়েছিল। সবচেয়ে বড় মেয়েটির নাম ছিল মারয়াম (Miriam)। তার আলোচনা সামনের দিকে আসছে। তার ছোট ছিল হযরত হারুন। সম্ভবত বনী ইসরাঈলী পরিবারে কোন পুত্র সন্তান জন্ম নিলে তাকে হত্যা করতে হবে—এই ফেরাউনী নির্দেশনামা জারী হবার পূর্বে হযরত হারুনের জন্ম হয়েছিল। তাই তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। এরপর এ আইন জারী হয় এবং ভয়ংকর পরিবেশে তৃতীয় সন্তানের জন্ম হয়।

১০. অর্থাৎ জন্মের সাথে সাথেই সাগরে ভাসিয়ে দেবার হুকুম দেয়া হয়নি। বরং বলা হয়, যতক্ষণ ভয়ের কারণ না থাকে শিশুকে স্তন্য দান করতে থাকো। যখন গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে গেছে বলে মনে হবে এবং আশংকা দেখা দেবে শিশুর আওয়াজ শুনে বা অন্য কোনভাবে শত্রুরা তার জন্মের কথা জানতে পারবে অথবা স্বয়ং বনী ইসরাঈলীদের কোন নীচ ব্যক্তি গোয়েন্দাগিরী করবে, তখন নির্ভয়ে ও নিশংকচিত্তে একটি বাক্সের মধ্যে রেখে তাকে সাগরে ভাসিয়ে দেবে। বাইবেলের বর্ণনা মতে জন্মের পর তিন মাস পর্যন্ত হযরত মূসার মা তাকে লুকিয়ে রাখেন। তালমুদ এর ওপর আরো বাড়তি খবর দিয়েছে যে, ফেরাউন সরকার সে সময় নারী গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিল। তারা নিজেদের সাথে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে ইসরাঈলী পরিবারে যেতো এবং কোন না কোনভাবে তাদেরকে সেখানে কাঁদাতো। এর ফলে কোন ইসরাঈলী যদি সেখানে কোন শিশুকে লুকিয়ে রেখে থাকতো, তাহলে অন্য শিশুর কান্না শুনে সেও কাঁদতো। এই নতুন ধরনের গোয়েন্দাগিরী

হযরত মূসার মাকে পেরেশান করে দেয়। তিনি নিজ পুত্রের প্রাণ বাঁচাবার জন্য জন্মের তিন মাস পরে তাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেন। এ পর্যন্ত এ দু'টি গ্রন্থের বর্ণনা কুরআনের সাথে মিলে যায়। আর দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবার অবস্থাও তারা ঠিক একই ধরনের বর্ণনা করেছে যা কুরআনে বলা হয়েছে। সূরা তা-হা এ বলা হয়েছে : اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ "শিশুকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও।" বাইবেল ও তালমূদ এরি সমর্থন করে। তাদের বর্ণনা হচ্ছে, হযরত মূসার মাতা নলখাগড়ার একটি ঝুড়ি বানিয়ে তার গায়ে তৈলাক্ত মাটি ও আলকাতরা লেপন করে তাদের পানি থেকে সংরক্ষিত করে। তারপর হযরত মূসাকে তার মধ্যে শায়িত করে নীল নদের বুকে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে তার কোন উল্লেখ ইসরাঈলী বর্ণনাগুলোতে নেই। অর্থাৎ হযরত মূসার মাতা আল্লাহর ইশারায় এ কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ পূর্বেই তাঁকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা দান করেছিলেন যে, এভাবে কাজ করলে শুধু তোমার পুত্রের প্রাণের কোন আশংকাই থাকবে না তাই নয় বরং আমি শিশুকে আবার তোমার কাছেই ফিরিয়ে আনবো এবং তোমার এ শিশু ভবিষ্যতে রসূলের মর্যাদা লাভ করবে।

১১. এটা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না বরং এ ছিল তাদের কাজের পরিণাম। যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। তারা এমন এক শিশুকে উঠাচ্ছিল যার হাতে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস হতে হবে।

১২. এ বর্ণনা থেকে বিষয়টির যে চিত্র স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, সিন্দুক বা ঝুড়ি নদীতে ভাসতে ভাসতে যখন ফেরাউনের প্রাসাদের কাছে চলে আসে তখন ফেরাউনের চাকর বাকররা তা ধরে ফেলে এবং উঠিয়ে নিয়ে বাদশাহ ও বেগমের সামনে পেশ করে। সম্ভবত বাদশাহ ও বেগম সে সময় নদীর কিনারে পরিভ্রমণ রত ছিলেন এমন সময় ঝুড়িটি তাদের চোখে পড়ে এবং তাদের হুকুমে সেটিকে নদী থেকে উঠানো হয়। তার মধ্যে একটি শিশু রাখা আছে দেখে অতি সহজে এ অনুমান করা যেতে পারতো যে, নিসন্দেহে এটি কোন ইসরাঈলীর সন্তান হবে। কারণ ইসরাঈলী জনবসতির দিক থেকে ঝুড়িটি আসছিল এবং সে সময় তাদের পুত্র সন্তানদেরকেই হত্যা করা হচ্ছিল। তাদের সম্পর্কেই ধারণা করা যেতে পারতো যে, কেউ তার সন্তানকে লুকিয়ে কিছুদিন লালন পালন করার পর এখন যখন দেখছে আর লুকানো যাবে না তখন এ আশায় তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে যে, হয়তো এ ভাবে সে প্রাণে বেঁচে যাবে এবং কেউ তাকে উঠিয়ে নিয়ে লালন পালন করবে। এ কারণে কিছু অতি বিশ্বস্ত গোলাম পরামর্শ দেয় যে, হুজুর! একে এখনই হত্যা করুন, এটাও তো কোন সাপেরই বাচ্চা। কিন্তু ফেরাউনের স্ত্রী তো ছিলেন একজন নারীই এবং হয়তো তিনি নিসন্তান ছিলেন। তারপর শিশুও ছিল বড়ই মিষ্টি চেহারার। যেমন সূরা তা-হা-য় আল্লাহ নিজেই হযরত মূসাকে বলছেন : وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي (আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করে দিয়েছিলাম) অর্থাৎ তোমাকে এমন প্রিয় দর্শন ও মনোমুগ্ধকর চেহারা দান করেছিলাম যে, দর্শনকারীরা স্বতস্ফূর্তভাবে তোমাকে আদর করতো। তাই মহিলা আত্ম সম্বরণ করতে পারেননি। তিনি বলে ওঠেন, একে হত্যা করো না বরং উঠিয়ে নিয়ে প্রতিপালন করো। সে যখন আমাদের এখানে প্রতিপালিত হবে এবং আমরা তাকে নিজের পুত্র করে

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ⑩ وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ؗ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ⑪ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ⑫ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑬

ওদিকে মূসার মায়ের মন অস্থির হয়ে পড়েছিল। সে তার রহস্য প্রকাশ করে দিতো যদি আমি তার মন সুদৃঢ় না করে দিতাম, যাতে সে (আমার অংগীকারের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপনকারীদের একজন হয়। সে শিশুর বোনকে বললো, এর পিছনে পিছনে যাও। কাজেই সে তাদের (শত্রুদের) অজ্ঞাতসারে তাকে দেখতে থাকলো।[১৩] আর আমি পূর্বেই শিশুর জন্য স্তন্য দানকারিনীদের স্তন পান হারাম করে রেখেছিলাম।[১৪] (এ অবস্থা দেখে) সে মেয়েটি তাদেরকে বললো, "আমি তোমাদের এমন পরিবারের সন্ধান দেবো যারা এর প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে এবং এর কল্যাণকামী হবে?"[১৫] এভাবে আমি মূসাকে[১৬] তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে তার চোখ শীতল হয়, সে দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয় এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য বলে জেনে নেয়।[১৭] কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা জানে না।

নেবো তখন সে যে ইসরাঈলী সেকথা সে আর কেমন করে জানবে। সে নিজেকে ফেরাউন বংশেরই একজন মনে করবে এবং তার যোগ্যতাগুলো বনী ইসরাঈলের পরিবর্তে আমাদের কাজে লাগবে।

বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা মতে যে ভদ্রমহিলা হযরত মূসাকে লালন পালন করা ও পুত্রে পরিণত করার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন তিনি ফেরাউনের স্ত্রী নন বরং তাঁর কন্যা ছিলেন। কিন্তু কুরআন পরিষ্কার ভাষায় তাকে বলছে امرأة فرعون (ফেরাউনের স্ত্রী)। আর একথা সুস্পষ্ট যে, শত শত বছর পরে মুখে মুখে রটে যাওয়া লোক কাহিনীর তুলনায় সরাসরি আল্লাহর বর্ণিত ঘটনাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য হতে পারে। অযথা ইসরাঈলী বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য আরবী পরিভাষা ও প্রচলিত বাকরীতির বিরুদ্ধে امرأة فرعون এর অর্থ "ফেরাউনী পরিবারের মেয়ে" করার কোন কারণ দেখি না।

১৩. অর্থাৎ মেয়েটি এমনভাবে ঝুড়ির ওপর নজর রাখে যার ফলে ভাসমান ঝুড়ির সাথে সাথে সে চলতেও থাকে এবং তার প্রতি নজর রাখতেও থাকে। আবার শত্রু যাতে না বুঝতে পারে তার কোন সম্পর্ক ঝুড়ির শিশুটির সাথে আছে সেদিকেও খেয়াল রাখে। ইসরাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী সে সময় হযরত মূসার বোনের বয়স ছিল দশ বারো বছর। সে বড়ই সতর্কতার সাথে ভাইয়ের অনুসরণ করে এবং সে যে ফেরাউনের মহলে পৌছে গেছে তা বুঝতে পারে, এ থেকে তার বুদ্ধিমত্তা আন্দাজ করা যায়।

১৪. অর্থাৎ ফেরাউনের স্ত্রী যে ধাত্রীকে স্তন্যদান করার জন্য ডাকতেন শিশু তার স্তনে মুখ লাগাতো না।

১৫. এ থেকে জানা যায়, ভাই ফেরাউনের মহলে পৌছে যাবার পর বোন ঘরে বসে থাকেনি। বরং সে একই প্রকার সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে মহলের আশেপাশে চক্কর দিতে থাকে। তারপর যখন জানতে পারে শিশু কারো স্তন মুখে নিচ্ছে না এবং বাদশাহ–বেগম শিশুর পছন্দনীয় ধাত্রীর সন্ধানলাভের জন্য পেরেশান হয়ে পড়েছে তখন সেই বুদ্ধিমতী মেয়ে সোজা রাজমহলে পৌছে যায় এবং ঘটনাস্থলে গিয়ে বলে, আমি একজন ভালো ধাত্রীর সন্ধান দিতে পারি, যে বড়ই স্নেহ ও মমতা সহকারে এ শিশুর লালন পালন করতে পারবে।

এ প্রসংগে একথাও বুঝে নিতে হবে, প্রাচীন কালে বড় ও অভিজাত বংশীয় লোকেরা নিজেদের শিশু সন্তান নিজেদের কাছে লালন পালন করার পরিবর্তে সাধারণত ধাত্রীদের হাতে সোপর্দ করে দিতো এবং তারাই নিজেদের কাছে রেখেই তাদের লালন পালন করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন কাহিনীতেও এ কথার উল্লেখ আছে যে, মক্কার আশপাশের মহিলারা মাঝে মাঝে মক্কায় আসতো ধাত্রীর সেবা দান করার জন্য এবং সরদারদের সন্তানদেরকে মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুধপান করাবার জন্য নিয়ে যেতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও হালীমা সা'দীয়ার গৃহে মরুভূমির বুকে প্রতিপালিত হয়েছেন। মিসরেও ছিল এই একই রেওয়াজ। এ কারণে হযরত মূসার বোন একথা বলেননি, "আমি একজন ভালো ধাত্রী এনে দিচ্ছি" বরং বলেন, এমন গৃহের সন্ধান দিচ্ছি যার অধিবাসীরা এর প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে এবং তারা কল্যাণকামিতার সাথে একে লালন পালন করবে।"

১৬. বাইবেল ও তালমূদ থেকে জানা যায়, শিশুর মূসা নাম ফেরাউনের গৃহেই রাখা হয়। এটি হিব্রু নয় বরং কিবৃতী ভাষার শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে, আমি তাকে পানি থেকে বের করলাম। প্রাচীন মিসরীয় ভাষা থেকেও হযরত মূসার নামের এ অর্থকরণ সঠিক প্রমাণিত হয়। সে ভাষায় 'মু' মানে পানি এবং 'উশা' এর মানে হয় উদ্ধার প্রাপ্ত।

১৭. আর আল্লাহর এ কুশলী ব্যবস্থার ফলে এ লাভটিও হয় যে, হযরত মূসা প্রকৃতপক্ষে ফেরাউনের শাহজাদা হতে পারেননি বরং নিজের মা-বাপ-ভাই-বোনদের মধ্যে প্রতিপালিত হবার কারণে নিজের আসল পরিচয় তিনি ভালোভাবেই অবহিত থাকতে পেরেছেন। নিজের পারিবারিক ঐতিহ্য ও পিতৃ পুরুষের ধর্ম এবং নিজের জাতি থেকে তাঁর সম্পর্কচ্যুতি ঘটতে পারেনি। তিনি ফেরাউন পরিবারের একজন সদস্য হওয়ার পরিবর্তে নিজের মানসিক আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তাধারার দিক দিয়ে পুরোপুরিভাবে বনী ইসরাঈলেরই একজন সদস্যে পরিণত হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদীসে বলেছেন ঃ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦ ۖ فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

২ রুকূ'

মূসা যখন পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেলো এবং তার বিকাশ পূর্ণতা লাভ করলো[১৮] তখন আমি তাকে হুকুম ও জ্ঞান দান করলাম,[১৯] সৎলোকদেরকে আমি এ ধরনেরই প্রতিদান দিয়ে থাকি। (একদিন) সে শহরে এমন সময় প্রবেশ করলো যখন শহরবাসীরা উদাসীন ছিল।[২০] সেখানে সে দেখলো দু'জন লোক লড়াই করছে। একজন তার নিজের সম্প্রদায়ের এবং অন্যজন তার শত্রু সম্প্রদায়ের। তার সম্প্রদায়ের লোকটি শত্রু সম্প্রদায়ের লোকটির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার জন্য ডাক দিল। মূসা তাকে একটি ঘুঁষি মারলো[২১] এবং তাকে মেরে ফেললো। (এ কাণ্ড ঘটে যেতেই) মূসা বললো, "এটা শয়তানের কাজ, সে ভয়ংকর শত্রু এবং প্রকাশ্য পথভ্রষ্টকারী।"[২২]

مثل الذى يعمل ويحتسب فى صنعته الخير كمثل ام موسى ترضع ولدها وتاخذ اجرها –

"যে ব্যক্তি নিজের রুজি রোজগারের জন্য কাজ করে এবং সে কাজে লক্ষ থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তার দৃষ্টান্ত হযরত মূসার মায়ের মতো ঃ তিনি নিজেরই সন্তানকে দুধ পান করান আবার তার বিনিময়ও লাভ করেন।" অর্থাৎ এ ধরনের লোক যদিও নিজের ও নিজের সন্তানদের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেয়ার জন্য কাজ করে কিন্তু যেহেতু সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ঈমানদারীর সাথে কাজ করে, যার সাথেই কাজ কারবার করে তার হক যথাযথভাবে আদায় করে এবং হালাল রিজিকের মাধ্যমে নিজের ও নিজের পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণকে আল্লাহর ইবাদাত মনে করে, তাই নিজের জীবিকা উপার্জনের জন্যও সে আল্লাহর কাছে পুরস্কারলাভের অধিকারী হয়। অর্থাৎ একদিকে জীবিকা ও উপার্জন করা হয় এবং অন্যদিকে আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব ও প্রতিদানও লাভ করা হয়।

১৮. অর্থাৎ যখন তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয়ে গেলো। ইহুদী বিবরণসমূহে এ সময় হযরত মূসার বিভিন্ন বয়সের কথা বলা হয়েছে। কোথাও ১৮, কোথাও ২০ আবার কোথাও ৪০ বছরও বলা হয়েছে। রাইবেলের নূতন নিয়মে ৪০ বছর বলা হয়েছে (প্রেরিতদের কার্য বিবরণ ৭ ঃ ২৩) কিন্তু কুরআন কোন বয়স নির্দেশ করেনি। যে উদ্দেশ্যে কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে সেজন্য কেবলমাত্র এতটুকু জেনে নেয়াই যথেষ্ট যে, সামনের দিকে যে ঘটনার কথা বলা হচ্ছে তা এমন এক সময়ের, যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম পূর্ণ যৌবনে পৌছে গিয়েছিলেন।

১৯. হুক্‌ম অর্থ হিকমত, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা–ধী–শক্তি ও বিচারবুদ্ধি। আর জ্ঞান বলতে বুঝানো হয়েছে দীনী ও দুনিয়াবী উভয় ধরনের তত্ত্বজ্ঞান। কারণ নিজের পিতামাতার সাথে সম্পর্ক–সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে তিনি নিজের বাপ–দাদা তথা হযরত ইউসুফ, ইয়াকুব ও ইসহাক আলাইহিমুস সালামের শিক্ষার সাথে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। আবার তদানীন্তন বাদশাহর পরিবারে রাজপুত্র হিসেবে প্রতিপালিত হবার কারণে সমকালীন মিসরবাসীদের মধ্যে প্রচলিত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ হুক্‌ম ও জ্ঞানদান অর্থ নবুওয়াত দান নয়। কারণ নবুওয়াত তো হযরত মূসাকে এর কয়েক বছর পরে দান করা হয়। সামনের দিকে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সূরা শু'আরায়ও (২১ আয়াত) এ বর্ণনা এসেছে।

এ রাজপুত্র থাকাকালীন সময়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে বাইবেলের নূতন নিয়মের প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে ঃ "আর মোশি মিস্রীয়দের সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষিত হইলেন, এবং তিনি বাক্যে ও কার্যে পরাক্রমী ছিলেন।" (৭ঃ২২) তালমূদের বর্ণনা মতে মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের গৃহে একজন সুদর্শন যুবা পুরুষ হিসেবে বড় হয়ে ওঠেন। রাজপুত্রদের মতো পোশাক পরতেন। রাজপুত্রের মতো বসবাস করতেন। লোকেরা তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। তিনি প্রায়ই জুশান এলাকায় যেতেন। সেখানে ছিল ইসরাঈলীদের বসতি, তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের সাথে কিবতী সরকারের কর্মচারীরা যেসব দুর্ব্যবহার ও বাড়াবাড়ি করতো সেসব নিজের চোখে দেখতেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ফেরাউন ইসরাঈলীদের জন্য সপ্তাহে একদিন ছুটির বিধান করে। তিনি ফেরাউনকে বলেন, চিরকাল দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত কাজ করতে থাকলে এরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এর ফলে সরকারেরই কাজের ক্ষতি হবে। এদের শক্তির পুনর্বহালের জন্য সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা করা দরকার। এভাবে নিজের বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তিনি এমনি আরো বহু কাজ করেছিলেন যার ফলে সারা মিসর দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। (তালমূদের বিবরণ ১২৯ পৃঃ)

২০. হতে পারে এটা ছিল একেবারে ভোর বেলা অথবা গরমকালের দুপুরের সময় কিংবা শীতকালে রাতের বেলা। মোটকথা, তখন সময়টা এমন ছিল যখন পথঘাট ছিল জন কোলাহল মুক্ত এবং সারা শহর ছিল নীরব নিঝুম।

"শহরে প্রবেশ করলো" এ শব্দগুলো থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রাজপ্রাসাদ সাধারণ জনবসতি থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। হযরত মূসা যেহেতু রাজপ্রাসাদে থাকতেন তাই শহরে বের হলেন, না বলে বলা হয়েছে, শহরে প্রবেশ করলেন।

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾

তারপর সে বলতে লাগলো, "হে আমার রব! আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও।"[২৩] তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন তিনি ক্ষমাশীল মেহেরবান।[২৪] মূসা শপথ করলো, "হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি এই যে অনুগ্রহ করেছো[২৫] এরপর আমি আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না"।[২৬]

দ্বিতীয় দিন অতি প্রত্যূষে সে ভয়ে ভয়ে এবং সর্বদিক থেকে বিপদের আশংকা করতে করতে শহরের মধ্যে চলছিল। সহসা দেখলো কি, সেই ব্যক্তি যে গতকাল সাহায্যের জন্য তাকে ডেকেছিল আজ আবার তাকে ডাকছে। মূসা বললো, "তুমি তো দেখছি স্পষ্টতই বিভ্রান্ত।"[২৭]

২১. মূলে وكز শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ চড় মারাও হতে পারে আবার ঘুঁষি মারাও হতে পারে। চড়ের তুলনায় ঘুষির আঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশী। তাই আমি এখানে অনুবাদে ঘুষি শব্দ গ্রহণ করেছি।

২২. এ থেকে অনুমান করা যায়, ঘুষি খেয়ে মিসরীয়টি যখন পড়ে গেলো এবং পড়ে গিয়ে মারা গেলো তখন কী ভীষণ লজ্জা ও শংকার মধ্যে হযরত মূসার মুখ থেকে কথাগুলো বের হয়ে গিয়ে থাকবে। হত্যা করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘুঁষি মারাও হয়নি। কেউ এটা আশাও করে না, একটি ঘুষি খেয়েই একজন সুস্থ সবল লোক মারা যাবে। তাই হযরত মূসা বললেন, এটা শয়তানের কোন খারাপ পরিকল্পনা বলে মনে হচ্ছে। সে একটি বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটাবার জন্য আমার হাত দিয়ে একাজ করিয়েছে। ফলে আমার বিরুদ্ধে একজন ইসরাঈলীকে সাহায্য করার জন্য একজন কিবৃতীকে হত্যা করার অভিযোগ আসবে এবং শুধু আমার বিরুদ্ধে নয় বরং সমগ্র ইসরাঈলী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মিসরে একটি বিরাট হাংগামা সৃষ্টি হবে। এ ব্যপারে বাইবেলের বর্ণনা কুরআন থেকে ভিন্ন। বাইবেল হযরত মূসার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ এনেছে। তার বর্ণনা মতে মিসরীয় ও ইসরাঈলীকে লড়াই করতে দেখে হযরত মূসা "এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে ঐ মিস্রীয়কে বধ করিয়া বালির মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলেন।" (যাত্রা পুস্তক ২ঃ১২) তালমূদেও একই কথা বলা হয়েছে। এখন বনী ইসরাঈল কিভাবে নিজেদের মনীষীদের চরিত্রে নিজেরাই কলংক লেপন করেছে

এবং কুরআন কিভাবে তাঁদের ভূমিকা পরিচ্ছন্ন ও কলংকমুক্ত করেছে তা যে কোন ব্যক্তি বিচার করতে পারে। সাধারণ বিবেক বুদ্ধিও এ কথাই বলে, একজন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তি, পরবর্তীকালে যাঁকে হতে হবে একজন মহিমান্বিত পয়গম্বর এবং মানুষকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি মর্যাদাশালী আইন ব্যবস্থা দান করা হবে যাঁর দায়িত্ব, তিনি এমন একজন অন্ধ জাতীয়তাবাদী হতে পারেন না যে, নিজের জাতির একজনকে অন্য জাতির কোন ব্যক্তির সাথে মারামারি করতে দেখে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে স্বেচ্ছায় বিপক্ষীয় ব্যক্তিকে মেরে ফেলবেন। ইসরাঈলীকে মিসরীয়দের কব্জায় দেখে তাকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য হত্যা করা যে, বৈধ হতে পারে না, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

২৩. মূল শব্দ হচ্ছে "মাগফিরাত" এর অর্থ ক্ষমা করা ও মাফ করে দেয়াও হয় আবার গোপনীয়তা রক্ষা করাও হয়। হযরত মূসার (আ) দোয়ার অর্থ ছিল, আমার এ গোনাহ (যা তুমি জানো, আমি জেনে–বুঝে করিনি) তুমি মাফ করে দাও এবং এর ওপর আবরণ দিয়ে ঢেকে দাও, যাতে শত্রুরা জানতে না পারে।

২৪. এরও দুই অর্থ এবং দু'টিই এখানে প্রযোজ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর এ ত্রুটি মাফ করে দেন এবং হযরত মূসার গোপনীয়তাও রক্ষা করেন। অর্থাৎ কিবৃতী জাতির কোন ব্যক্তি এবং কিবৃতী সরকারের কোন লোকের সে সময় তাদের আশেপাশে বা ধারে কাছে গমনাগমন হয়নি। ফলে তারা কেউ এ হত্যাকাণ্ড দেখেনি। এভাবে হযরত মূসার পক্ষে নির্বিঘ্নে ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়ার সুযোগ ঘটে।

২৫. অর্থাৎ আমার কাজটি যে গোপন থাকতে পেরেছে, শত্রু জাতির কোন ব্যক্তি যে আমাকে দেখতে পায়নি এবং আমার সরে যাওয়ার যে সুযোগ ঘটেছে, এই অনুগ্রহ।

২৬. হযরত মুসার এ অংগীকার অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলীর মাধ্যমে সাধিত হয়েছে। এর অর্থ কেবল এই নয় যে, আমি কোন অপরাধীর সহায়ক হবো না বরং এর অর্থ এটাও হয় যে, আমার সাহায্য–সহায়তা কখনো এমন লোকদের পক্ষে থাকবে না যারা দুনিয়ায় জুলুম ও নিপীড়ন চালায়। ইবনে জারীর এবং অন্য কয়েকজন তাফসীরকার এভাবে এর একেবারে সঠিক অর্থ নিয়েছেন যে, সেই দিনই হযরত মূসা ফেরাউন ও তার সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অংগীকার করেন। কারণ ফেরাউনের সরকার ছিল একটি জালেম সরকার এবং সে আল্লাহর এ সরযমীনে একটি অপরাধমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল। তিনি অনুভব করেন, কোন ঈমানদার ব্যক্তি একটি জালেম সরকারের হাতিয়ারে পরিণত হতে এবং তার শক্তি ও পরাক্রম বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করতে পারে না।

মুসলিম আলেমগণ সাধারণভাবে হযরত মূসার এ অংগীকার থেকে একথা প্রমাণ করেছেন যে, একজন মু'মিনের কোন জালেমকে সাহায্য করা থেকে পুরোপুরি দূরে থাকা উচিত। সে জালেম কোন ব্যক্তি, দল, সরকার বা রাষ্ট্র যেই হোক না কেন। প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহর কাছে এক ব্যক্তি বলে, আমার ভাই বনী উমাইয়া সরকারের অধীনে কূফার গভর্ণরের কাতিব (সচিব), বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করা তার কাজ নয়, তবে যেসব ফায়সালা করা হয় সেগুলো তার কলমের সাহায্যেই জারী হয়। এ চাকরী না করলে সে ভাতে মারা যাবে। হযরত আতা জবাবে এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, তোমার ভাইয়ের নিজের কলম ছুঁড়ে ফেলে দেয়া উচিত, রিযিকদাতা হচ্ছেন আল্লাহ।

فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِالْاَمْسِ ۖ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿۱۹﴾ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۫ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿۲۰﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۫ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۱﴾

তারপর মূসা যখন শত্রু সম্প্রদায়ের লোকটিকে আক্রমণ করতে চাইলো[২৮] তখন সে চিৎকার করে উঠলো,[২৯] "হে মূসা! তুমি কি আজকে আমাকে ঠিক তেমনিভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছো যেভাবে গতকাল একজনকে হত্যা করেছিলে? তুমি তো দেখছি এদেশে স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকতে চাও, সংস্কারক হতে চাও না? এরপর এক ব্যক্তি নগরীর দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এলো[৩০] এবং বললো, "হে মূসা! সরদারদের মধ্যে তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ চলছে। এখান থেকে বের হয়ে যাও। আমি তোমার মঙ্গলাকাংখী।" এ খবর শুনতেই মূসা ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লো এবং সে দোয়া করলো, "হে আমার রব! আমাকে জালেমদের হাত থেকে বাঁচাও।"

আর একজন কাতিব 'আমের শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, "হে আবু 'আমর! আমি শুধুমাত্র হুকুমনামা লিখে তা জারী করার দায়িত্ব পালন করি মূল ফায়সালা করার দায়িত্ব আমার নয়। এ জীবিকা কি আমার জন্য বৈধ?" তিনি জবাব দেন, "হতে পারে কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যার ফায়সালা করা হয়েছে এবং তোমার কলম দিয়ে তা জারী হবে। হতে পারে, কোন সম্পদ নাহক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অথবা কারো গৃহ ধসানোর হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তা তোমার কলম দিয়ে জারী হচ্ছে"। তারপর ইমাম এ আয়াতটি পাঠ করেন। আয়াতটি শুনেই কাতিব বলে ওঠেন, "আজকের পর থেকে আমার কলম বনী উমাইয়ার হুকুমনামা জারী হবার কাজে ব্যবহৃত হবে না।" ইমাম বললেন, "তাহলে আল্লাহও তোমাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

আবদুর রহমান ইবনে মুসলিম যাহ্হাককে শুধুমাত্র বুখারায় গিয়ে সেখানকার লোকদের বেতন বন্টন করে দেবার কাজে পাঠাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

৩ রুকূ'

(মিসর থেকে বের হয়ে) যখন মূসা মাদ্‌য়ানের দিকে রওয়ানা হলো[৩১] তখন সে বললো, "আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথে চালিত করবেন।"[৩২] আর যখন সে মাদ্‌য়ানের কুয়ার কাছে পৌঁছুল,[৩৩] সে দেখলো, অনেক লোক তাদের পশুদের পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের থেকে আলাদা হয়ে একদিকে দু'টি মেয়ে নিজেদের পশুগুলো আগলে রাখছে। মূসা মেয়ে দু'টিকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের সমস্যা কি?" তারা বললো, "আমরা আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ না এ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলো সরিয়ে নিয়ে যায়, আর আমাদের পিতা একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি।"[৩৪]

করতেও অস্বীকার করেন। তাঁর বন্ধুরা বলেন, এতে ক্ষতি কি? তিনি বলেন, আমি জালেমদের কোন কাজেও সাহায্যকারী হতে চাই না। (রুহুল মা'আনী ৩ খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবু হানীফার একটি ঘটনা তাঁর নির্ভরযোগ্য জীবনীকারগণ আল মুওয়াফ্‌ফাক আল মক্কী, ইবনুল বায্‌যার আল কারওয়ারী, মুল্লা আলী কারী প্রমুখ সবাই তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে, তারই পরামর্শক্রমে বাদশাহ মনসূরের প্রধান সেনাপতি হাসান ইবনে কাহ্‌তুবাহ একথা বলে নিজের পদ থেকে ইস্তেফা দেন যে, আজ পর্যন্ত আমি আপনার রাষ্ট্রের সমর্থনে যা কিছু করেছি এ যদি আল্লাহর পথে হয়ে থাকে তাহলে এতটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু এ যদি জুলুমের পথে হয়ে থাকে তাহলে আমার আমল নামায় আমি আর কোন অপরাধের সংখ্যা বাড়াতে চাই না।

২৭. অর্থাৎ তুমি ঝগড়াটে স্বভাবের বলে মনে হচ্ছে। প্রতিদিন কারো না কারো সাথে তোমার ঝগড়া হতেই থাকে। গতকাল একজনের সাথে ঝগড়া বাধিয়েছিলে, আজ আবার আর একজনের সাথে বাধিয়েছো।

২৮. বাইবেলের বর্ণনা এখানে কুরআন থেকে আলাদা। বাইবেল বলে, দ্বিতীয় দিনের ঝগড়া ছিল দু'জন ইসরাঈলীর মধ্যে। কিন্তু কুরআন বলছে, এ ঝগড়াও ইসরাঈলী ও মিসরীয়ের মধ্যে ছিল। এ দ্বিতীয় বর্ণনাটিই যুক্তি সংগত বলে মনে হয়। কারণ প্রথম দিনের হত্যা রহস্য প্রকাশ হবার যে কথা সামনের দিকে আসছে মিসরীয় জাতির একজন লোক

সে ঘটনা জানতে পারলেই তা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হতো। একজন ইসরাঈলী তা জানতে পারলে সে সঙ্গে সঙ্গেই নিজের জাতির পালক–রাজপুত্রের এত বড় অপরাধের খবর ফেরাউনী সরকারের গোচরীভূত করবে এটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

২৯. যে ইসরাঈলীকে সাহায্য করার জন্য হযরত মূসা এগিয়ে গিয়েছিলেন, এ ছিল তারই চিৎকার। তাকে ধমক দেবার পর যখন তিনি মিসরীয়টিকে মারতে উদ্যত হলেন তখন ইসরাঈলীটি মনে করলো হযরত মূসা বুঝি তাকে মারতে আসছেন। তাই সে চিৎকার করতে থাকলো এবং নিজের বোকামির জন্য গতকালের হত্যা রহস্যও প্রকাশ করে দিল।

৩০. অর্থাৎ এ দ্বিতীয় ঝগড়ার ফলে হত্যা রহস্য প্রকাশ হয়ে যাবার পর সংশ্লিষ্ট মিসরীয়টি যখন গিয়ে সরকারকে জানিয়ে দিল তখন এ পরামর্শের ঘটনা ঘটে।

৩১. হযরত মূসার মিসর থেকে বের হয়ে মাদ্‌য়ানের দিকে যাবার ব্যাপারে বাইবেলের বর্ণনা কুরআনের সাথে মিলে যায়। কিন্তু তালমূদ এ প্রসংগে এক ভিত্তিহীন কাহিনী বর্ণনা করেছে। সেটি এই যে, হযরত মূসা মিসর থেকে হাবৃশায় পালিয়ে যান এবং সেখানে গিয়ে বাদশাহর পারিষদে পরিণত হন। তারপর বাদশাহর মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁকেই নিজেদের বাদশাহের সিংহাসনে বসায় এবং বাদশাহর বিধবা স্ত্রীর সাথে তাঁর বিয়ে দেন। ৪০ বছর তিনি সেখানে রাজত্ব করেন। কিন্তু এ সুদীর্ঘ সময়কালে তিনি কখনো নিজের হাবশী স্ত্রীর নিকটবর্তী হননি। ৪০ বছর অতিক্রান্ত হবার পর ঐ ভদ্র মহিলা হাবশার জনগণের কাছে এ মর্মে অভিযোগ করে যে, চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত এ ব্যক্তি আমার সাথে স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করেনি এবং কখনো হাবশার দেবতাদের পূজা করেনি। এ কথায় রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাঁকে পদচ্যুত করে বিপুল পরিমাণ ধন–সম্পদ দিয়ে সসম্মানে বিদায় করে দেয়। তখন তিনি হাবশা ত্যাগ করে মাদ্‌য়ানে পৌঁছে যান এবং সেখানে সামনে যেসব ঘটনার কথা বলা হয়েছে সেগুলো ঘটে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৭ বছর।

এ কাহিনীটি যে ভিত্তিহীন এর একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এসময় আসিরীয়ায় (উত্তর ইরাক) হাবশার শাসন চলছিল এবং আসিরীয়বাসীদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য হযরত মূসা ও তাঁর পূর্ববর্তী বাদশাহরাও সামরিক অভিযান চালান। সামান্যতম ইতিহাস–ভূগোল জ্ঞান যার আছে সে পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে একটু নজর দিলেই দেখতে পাবে যে, আসিরীয়ার ওপর হাবশার শাসন বা হাবশী সেনাদলের আক্রমণের ব্যাপারটি কেবলমাত্র তখনই ঘটতে পারতো যখন মিসর, ফিলিস্তীন ও সিরিয়া তার দখলে থাকতো অথবা সমগ্র আরব দেশ তার কর্তৃত্বাধীন হতো কিংবা হাবশার নৌবাহিনী এতই শক্তিশালী হতো যে, তা ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগর অতিক্রম করে ইরাক দখল করতে সক্ষম হতো। এদেশগুলোয় কখনো হাবশীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অথবা তাদের নৌশক্তি কখনো এত বিপুল শক্তির অধিকারী ছিল এ ধরনের কোন কথা ইতিহাসে নেই। এ থেকে বুঝা যায় যে, নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের জ্ঞান কতটা অপরিপক্ক ছিল এবং কুরআন তাদের ভুলগুলো সংশোধন করে কেমন সুস্পষ্ট আকারে সঠিক ঘটনাবলী পেশ করছে। কিন্তু

ইহুদী ও খৃষ্টান প্রাচ্যবিদগণ একথা বলতে লজ্জা অনুভব করেন না যে, কুরআন এসব কাহিনী বনী ইসরাঈল থেকে সংগ্রহ করেছে।

৩২. অর্থাৎ এমন পথ যার সাহায্যে সহজে মাদ্‌য়ানে পৌঁছে যাবো।

উল্লেখ্য, সে সময় মাদ্‌য়ান ছিল ফেরাউনের রাজ্য–সীমার বাইরে। সমগ্র সিনাই উপদ্বীপে মিসরের কর্তৃত্ব ছিল না। বরং তার কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিম ও দক্ষিণ এলাকা পর্যন্ত। আকাবা উপসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম তীরে ছিল বনী মাদ্‌য়ানের বসতি এবং এ এলাকা ছিল মিসরীয় প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এ কারণে হযরত মূসা মিসর থেকে বের হয়েই মাদ্‌য়ানের পথ ধরেছিলেন। কারণ এটাই ছিল নিকটতম জনবসতিপূর্ণ স্বাধীন এলাকা। কিন্তু সেখানে যেতে হলে তাঁকে অবশ্যই মিসর অধিকৃত এলাকা দিয়েই এবং মিসরীয় পুলিশ ও সেনা–চৌকিগুলোর নজর এড়িয়ে যেতে হতো। তাই তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আমাকে এমন পথে নিয়ে যাও যেপথ দিয়ে আমি সহি–সালামতে মাদ্‌য়ান পৌঁছে যেতে পারি।

৩৩. এ স্থানটি, যেখানে হযরত মূসা পৌঁছেছিলেন, এটি ছিল আরবীয় বর্ণনা অনুযায়ী আকাবা উপসাগরের পশ্চিম তীরে মানকা থেকে কয়েক মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। বর্তমানে এ জায়গাটিকে আল বিদ্‌'আ বলা হয়। সেখানে একটি ছোট মতো শহর গড়ে উঠেছে। আমি ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তাবুক থেকে আকাবায় যাওয়ার পথে এ জায়গাটি দেখেছি। স্থানীয় অধিবাসীরা আমাকে জানিয়েছে, বাপ–দাদাদের আমল থেকে আমরা শুনে আসছি মাদ্‌য়ান এখানেই অবস্থিত ছিল। ইউসিফুস থেকে নিয়ে বার্টন পর্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদগণও সাধারণভাবে এ স্থানটিকেই মাদ্‌য়ান বলে চিহ্নিত করেছেন। এর সন্নিকটে সামান্য দূরে একটি স্থানকে বর্তমানে "মাগায়েরে শু'আইব" বা "মাগারাতে শু'আইব" বলা হয়। সেখানে সামূদী প্যাটার্নের কিছু ইমারত রয়েছে। আর এর প্রায় এক মাইল দু' মাইল দূরে কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এর মধ্যে আমরা দেখেছি দু'টি অন্ধকূপ। স্থানীয় লোকেরা আমাদের জানিয়েছে, নিশ্চিতভাবে আমরা কিছু বলতে পারি না, তবে আমাদের এখানে একথাই প্রচলিত যে, এদু'টি কূয়ার মধ্য থেকে একটি কূয়ায় হযরত মূসা তাঁর ছাগলদের পানি পান করিয়েছেন। একথাটিই আবুল ফিদা (মৃত্যু ৭৩২ হিঃ) তাকবীমুল বুলদানে এবং ইয়াকুত মু'জামুল বুলদানে আবু যায়েদ আনসারীর (মৃত্যু ২১৬ হিঃ) বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ এলাকার অধিবাসীরা এ স্থানেই হযরত মূসার ঐ কূয়াটি চিহ্নিত করে থাকে। এ থেকে জানা যায়, এ বর্ণনাটি শত শত বছর থেকে সেখানকার লোকদের মুখে মুখে বংশানুক্রমে চলে আসছে এবং এরি ভিত্তিতে দৃঢ়তার সাথে বলা যেতে পারে, কুরআন মজীদে যে স্থানটির কথা বলা হয়েছে এটা সেই স্থান। পাশের পাতায় এ স্থানটির কিছু ছবি দেখতে পাবেন।

৩৪. অর্থাৎ আমরা মেয়েমানুষ। এ রাখালদের সাথে টক্কর দিয়ে ও সংঘর্ষ বাধিয়ে নিজেদের জানোয়ারগুলোকে আগে পানি পান করাবার সামর্থ আমাদের নেই। অন্যদিকে আমাদের পিতাও এত বেশী বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন যে, তিনি নিজে আর কষ্টের কাজ করতে পারেন না। আমাদের পরিবারে আর দ্বিতীয় কোন পুরুষ নেই। তাই আমরা মেয়েরাই এ কাজ করতে বের হয়েছি। সব রাখালদের তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে নিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। মেয়ে দু'টি শুধুমাত্র
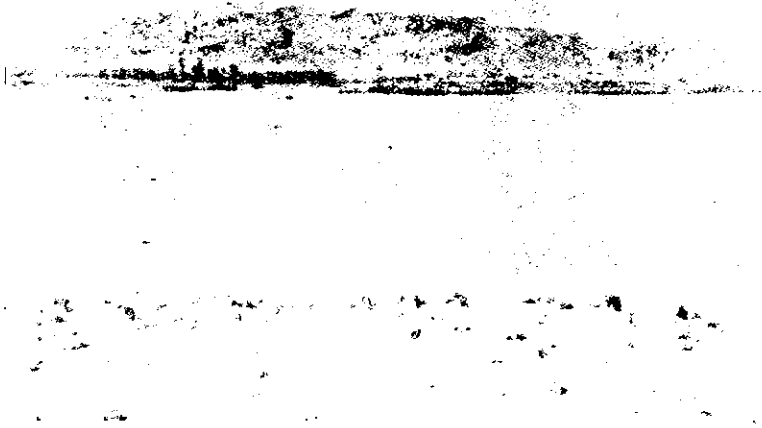
মাদয়ান উপত্যকা

একটি কূপ। কথিত আছে যে, মূসা (আ) এ কূপে ছাগলকে পানি পান করান

একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে এ সমস্ত বক্তব্য উপস্থাপন করে। এ থেকে একদিকে তাদের লজ্জাশীলতার প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ একজন পর পুরুষের সাথে তারা বেশী কথা বলতেও চাচ্ছিল না। আবার এটাও পছন্দ করছিল না যে, এ ভিন দেশী অপরিচিত লোকটি তাদের ঘরানা সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা পোষণ করুক এবং মনে মনে ভাবুক যে, এরা কেমন লোক যাদের পুরুষরা ঘরে বসে রয়েছে আর ঘরের মেয়েদেরকে একাজ করার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এ মেয়েদের বাপের ব্যাপারে আমাদের এখানে একথা প্রচার হয়ে গেছে যে, তিনি ছিলেন হযরত শু'আইব আলাইহিস সালাম। কিন্তু কুরআন মজীদে ইশারা ইংগিতে কোথাও এমন কথা বলা হয়নি যা থেকে বুঝা যেতে পারে তিনি শু'আইব আলাইহিস সালাম ছিলেন। আথচ শু'আইব আলাইহিস সালাম কুরআনের একটি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। এ মেয়েদের পিতা যদি তিনিই হতেন তাহলে এখানে একথা সুস্পষ্ট না করে দেয়ার কোন কারণই ছিল না। নিসন্দেহে কোন কোন হাদীসে তাঁর নাম স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর উভয়ে এ ব্যাপারে একমত যে, এগুলোর কোনটিরও সনদ তথা বর্ণনা সূত্র নির্ভুল নয়। তাই ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, আবু উবাইদাহ ও সাঈদ ইবনে জুবাইরের ন্যায় বড় বড় তাফসীরকার বনী ইসরাঈলের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে তালমূদ ইত্যাদি গ্রন্থে এ মনীষীর যে নাম উল্লেখিত হয়েছে সেটিই বলেছেন। অন্যথায় বলা নিষ্প্রয়োজন, যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হযরত শু'আইবের নাম স্পষ্ট করে বলা হতো তাহলে তাঁরা কখনো অন্য নাম উল্লেখ করতেন না।

বাইবেলের এক জায়গায় এ মণীষীর নাম বলা হয়েছে রূয়েল এবং অন্য জায়গায় বলা হয়েছে যিথ্রো। এবং বলা হয়েছে তিনি মাদ্‌য়ানের যাজক ছিলেন। (যাত্রা পুস্তক ২ ঃ ১৬–১৮, ৩ ঃ ১ এবং ১৮ ঃ ৫) তালমূদীয় সাহিত্যে রূয়েল, যিথ্রো ও হুবাব তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম বলা হয়েছে। আধুনিক ইহুদী আলেমগণের মতে যিথ্রো ছিল 'হিজ এক্সেলেন্সী' এর সমার্থক একটি উপাধী এবং আসল নাম ছিল রূয়েল বা হুবাব। অনুরূপভাবে কাহেন বা যাজক (Kohen Midian) শব্দটির ব্যাখ্যার ব্যাপারেও ইহুদী আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একে পুরোহিত (Priest) এর সমার্থক হিসেবে নিয়েছেন আবার কেউ কেউ রইস বা আমীর (Prince) অর্থে নিয়েছেন।

তালমূদে তাঁর যে জীবনবৃতান্ত বর্ণনা করা হয়েছে তাহচ্ছে এই যে, হযরত মূসার জন্মের পূর্বে ফেরাউনের কাছে তাঁর যাওয়া–আসা ছিল। ফেরাউন তাঁর জ্ঞানও বিচক্ষণতার প্রতি আস্থা রাখতো। কিন্তু যখন বনী ইসরাঈলের ওপর জুলুম–শোষণ চালাবার জন্য মিসরের রাজ পরিষদে পরামর্শ হতে লাগলো এবং তাদের সন্তানদের জন্মের পরপরই হত্যা করার সিদ্ধান্ত হলো তখন তিনি ফেরাউনকে এ অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য বহু প্রচেষ্টা চালালেন। তাকে এ জুলুমের অশুভ পরিণামের ভয় দেখালেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, এদের অস্তিত্ব যদি আপনার কাছে এতই অসহনীয় হয়ে থাকে তাহলে এদেরকে মিসর থেকে বের করে এদের পিতৃ পুরুষের দেশ কেনানের দিকে পাঠিয়ে দিন। তাঁর এ ভূমিকায় ফেরাউন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অপদস্থ করে নিজের দরবার থেকে বের করে দিয়েছিল। সে সময় থেকে তিনি নিজের দেশ মাদ্‌য়ানে চলে এসে সেখানেই অবস্থান করছিলেন।

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ز قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ط فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لا قَالَ لَا تَخَفْ قف نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

একথা শুনে মূসা তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল। তারপর সে একটি ছায়ায় গিয়ে বসলো এবং বললো, "হে আমার প্রতিপালক! যে কল্যাণই তুমি আমার প্রতি নাযিল করবে আমি তার মুখাপেক্ষী।" (বেশিক্ষণ অতিবাহিত হয়নি এমন সময়) ঐ দু'টি মেয়ের মধ্য থেকে একজন লজ্জাজড়িত পদ বিক্ষেপে তার কাছে এলো[৩৫] *এবং বলতে লাগলো, "আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি আমাদের জানোয়ারগুলোকে যে পানি পান করিয়েছেন আপনাকে তার পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য।"*[৩৬] *মূসা যখন তার কাছে পৌঁছুল এবং নিজের সমস্ত কাহিনী তাকে শুনালো তখন সে বললো, "ভয় করো না, এখন তুমি জালেমদের হাত থেকে বেঁচে গেছো।"*

তাঁর ধর্ম সম্পর্কে অনুমান করা হয়, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মতো তিনিও ইবরাহীমী দীনের অনুসারী ছিলেন। কেননা, যেভাবে হযরত মূসা ছিলেন ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের (আলাইহিমাস সালাম) আউলাদ ঠিক তেমনি তিনিও ছিলেন মাদ্য়ান ইবনে ইবরাহীমের বংশধর। এ সম্পর্কের কারণেই সম্ভবত তিনি ফেরাউনকে বনী ইসরাঈলের ওপর জুলুম–নির্যাতন–নিপীড়ন করতে নিষেধ করেন এবং তার বিরাগভাজন হন। কুরআন ব্যাখ্যাতা নিশাপুরী হযরত হাসান বাসরীর বরাত দিয়ে লিখেছেন :

اِنَّهٗ كَانَ رَجُلًا مُسْلِمًا قَبِلَ الدِّيْنَ مِنْ شُعَيْبٍ

"তিনি একজন মুসলমান ছিলেন। হযরত শু'আইবের দীন তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।"

তালমূদে বলা হয়েছে, তিনি মাদ্য়ানবাসীদের মূর্তি পূজাকে প্রকাশ্যে নির্বুদ্ধিতা বলে সমালোচনা করতেন। তাই মাদ্য়ানবাসীরা তাঁর বিরোধী হয়ে গিয়েছিল।

৩৫. হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বাক্যাংশটির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন :

جائت تمشى على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء دلاجة ولاجة خراجة –

قَالَتْ إِحْدٰىهُمَا يٰٓأَبَتِ اسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَـْٔجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰىٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوٰنَ عَلَىَّ ۖ وَاللَّهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

মেয়ে দু'জনের একজন তার পিতাকে বললো, "আব্বাজান! একে চাকরিতে নিয়োগ করো, কর্মচারী হিসেবে এমন ব্যক্তিই উত্তম হতে পারে যে বলশালী ও আমানতদার।"৩৭ তার পিতা (মূসাকে) বললো,৩৮ "আমি আমার এ দু'মেয়ের মধ্য থেকে একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই। শর্ত হচ্ছে, তোমাকে আট বছর আমার এখানে চাকরি করতে হবে। আর যদি দশ বছর পুরো করে দাও, তাহলে তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার ওপর কড়াকড়ি করতে চাই না। তুমি ইনশাআল্লাহ আমাকে সৎলোক হিসেবেই পাবে। মূসা জবাব দিল, "আমার ও আপনার মধ্যে একথা স্থিরীকৃত হয়ে গেলো, এ দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেটাই আমি পূরণ করে দেবো তারপর আমার ওপর যেন কোন চাপ দেয়া না হয়। আর যা কিছু দাবী ও অঙ্গীকার আমরা করছি আল্লাহ তার তত্বাবধায়ক।"৩৯

"সে নিজের মুখ ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে লজ্জাজড়িত পায়ে হেঁটে এলো। সেই সব ধিংগি চপলা মেয়েদের মতো হন হন করে ছুটে আসেনি, যারা যেদিকে ইচ্ছা যায় এবং যেখানে খুশী ঢুকে পড়ে।"

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত কয়েকটি রেওয়ায়াত সাঈদ ইবনে মানসুর, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনুল মুনযির নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত উমর থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, সাহাবায়ে কেরামের যুগে কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বদৌলতে এ মনীষীগণ লজ্জাশীলতার ইসলামী ধারণা লাভ করেছিলেন তা অপরিচিত ও ভিন্ পুরুষদের সামনে চেহারা খুলে রেখে ঘোরাফেরা করা এবং বেপরোয়াভাবে ঘরের বাইরে চলাফেরা করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। হযরত উমর (রা) পরিষ্কার ভাষায় এখানে চেহারা ঢেকে রাখাকে লজ্জাশীলতার চিহ্ন এবং তা ভিন পুরুষের সামনে উন্মুক্ত রাখাকে নির্লজ্জতা গণ্য করেছেন।

৩৬. একথাও সে বলে লজ্জা–শরমের কারণে। কেননা, নির্জনে একজন ভিন পুরুষের কাছে একাকী আসার কোন কারণ বলা জরুরী ছিল। অন্যথায় একথা সুস্পষ্ট, একজন ভদ্রলোক যদি কোন মেয়ে মানুষকে পেরেশান দেখে তাকে কোন সাহায্য করে থাকে, তাহলে তার প্রতিদান দেবার কথা বলা কোন ভালো কথা ছিল না। তারপর এ প্রতিদানের নাম শোনা সত্ত্বেও হযরত মূসার মতো একজন মহানুভব ব্যক্তির উঠে এগিয়ে যাওয়া একথা প্রমাণ করে যে, তিনি সে সময় চরম দুরবস্থায় পতিত ছিলেন। একেবারে খালি হাতে অকস্মাত মিসর থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। মাদ্‌য়ান পর্যন্ত পৌঁছতে কমপক্ষে আটদিন লাগার কথা। ক্ষুধা, পিপাসা এবং সফরের ক্লান্তিতে অবস্থা কাহিল না হয়ে পারে না। বিদেশে–পরবাসে কোন থাকার জায়গা পাওয়া যায় কিনা এবং এমন কোন সমব্যথী পাওয়া যায় কিনা যার কাছে আশ্রয় নেয়া যেতে পারে, এ চিন্তা সম্ভবত তাকে সবচেয়ে বেশী পেরেশান করে দিয়েছিল। এ অক্ষমতার কারণেই এত সামান্য সেবা কর্মের পারিশ্রমিক দেবার জন্য ডাকা হচ্ছে শুনে হযরত মূসা যাওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করেননি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, আল্লাহর কাছে এখনই আমি যে দোয়া করেছি তা কবুল করার এ ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে, তাই এখন অনর্থক আত্মমর্যাদার ভান করে আল্লাহর দেয়া আতিথ্যের আহবান প্রত্যাখ্যান করা সংগত নয়।

৩৭. হযরত মূসার সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় মেয়েটি তার বাপকে একথা বলেছিল কিনা এটা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে বেশির ভাগ সম্ভাবনা এটাই যে, তার বাপ অপরিচিত মুসাফিরকে দু–একদিন নিজের কাছে রেখে থাকবেন এবং এ সময়ের মধ্যে কখনো মেয়ে তার বাপকে এ পরামর্শ দিয়ে থাকবে। এ পরামর্শের অর্থ ছিল, আপনার বার্ধক্যের কারণে বাধ্য হয়ে আমাদের মেয়েদের বিভিন্ন কাজে বাইরে বের হতে হয়। বাইরের কাজ করার জন্য আমাদের কোন ভাই নেই। আপনি এ ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করুন। সুঠাম দেহের অধিকারী বলশালী লোক। সবরকমের পরিশ্রমের কাজ করতে পারবে। আবার নির্ভরযোগ্যও। নিছক নিজের ভদ্রতা ও আভিজাত্যের কারণে সে আমাদের মতো মেয়েদেরকে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমাদের সাহায্য করেছে এবং আমাদের দিকে কখনো চোখ তুলে তাকায়ওনি।

৩৮. একথাও জরুরী নয় যে, মেয়ের কথা শুনেই বাপ সংগে সংগেই হযরত মূসাকে একথা বলে থাকবেন। সম্ভবত তিনি মেয়ের পরামর্শ সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করার পর এই মত স্থির করেছিলেন যে, লোকটি ভদ্র ও অভিজাত, একথা ঠিক। কিন্তু ঘরে যেখানে জোয়ান মেয়ে রয়েছে সেখানে একজন জোয়ান, সুস্থ, সবল লোককে এমনি কর্মচারী হিসেবে রাখা ঠিক নয়। এ ব্যক্তি যখন ভদ্র, শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও অভিজাত বংশীয় (যেমন হযরত মূসার মুখে তাঁর কাহিনী শুনে তিনি মনে করে থাকবেন) তখন একে জামাতা করেই ঘরে রাখা হোক। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কোন উপযুক্ত সময়ে তিনি হযরত মূসাকে একথা বলে থাকবেন।

এখানে দেখুন বনী ইসরাঈলের আর একটি কীর্তি। তারা তাদের মহান মর্যাদাসম্পন্ন নবী এবং নিজেদের সবচেয়ে বড় হিতকারী ও জাতীয় হিরোর কী দুর্গতি করেছে! তালমুদে বলা হয়েছে, "মূসা রূয়েলের বাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন। তিনি নিজের মেজবানের মেয়ে সাফুরার প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি দিচ্ছিলেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে বিয়ে করলেন।" আর একটি ইহুদী বর্ণনা জুয়িশ ইনসাইক্লোপিডিয়ায় উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে

বলা হয়েছে, "হযরত মূসা যখন যিথ্রোকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন এ ব্যক্তির হাতেই ফেরাউনের রাজ্য ধ্বংস হবার ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছিল। তাই তিনি সংগে সংগেই হযরত মূসাকে বন্দী করে ফেললেন, যাতে তাঁকে ফেরাউনের হাতে সোপর্দ করে দিয়ে পুরস্কার লাভ করতে পারেন। সাত বা দশ বছর পর্যন্ত তিনি তার বন্দীশালায় থাকলেন। ভূ-গর্ভস্থ একটি অন্ধকার কুঠরিতে তিনি বন্দী ছিলেন। কিন্তু যিথ্রোর মেয়ে যাফূরা (বা সাফূরা), যার সাথে কূয়ার পাড়ে তাঁর প্রথম সাক্ষাত হয়েছিল, চুপি চুপি তাঁর সাথে কারাগৃহে সাক্ষাত করতে থাকে। সে তাকে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করতো। তাদের দু'জনের মধ্যে বিয়ের গোপন চুক্তি হয়ে গিয়েছিল। সাত বা দশ বছর পরে যাফূরা তার বাপকে বললো, এত দীর্ঘকাল হয়ে গেলো আপনি এক ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তারপর তার কোন খবরও নেননি। এতদিন তার মরে যাওয়ারই কথা। কিন্তু যদি জীবিত থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সে কোন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি। যিথ্রো তার একথা শুনে কারাগারে গেলেন। সেখানে হযরত মূসাকে জীবিত থাকতে দেখে তার মনে বিশ্বাস জন্মালো অলৌকিকতার মাধ্যমে এ ব্যক্তি জীবিত আছে। তখন তিনি যাফূরার সাথে তাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন।"

যেসব পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ কুরআনী কাহিনীগুলোর উৎস খুঁজে বেড়ান, কুরআনী বর্ণনা ও ইসরাঈলী বর্ণনার মধ্যে এই যে সুস্পষ্ট পার্থক্য এখানে দেখা যাচ্ছে তা কি কখনো তাদের চোখে পড়ে?

৩৯. কেউ কেউ হযরত মূসার সাথে মেয়ের বাপের এ কথাবার্তাকে বিয়ের ইজাব কবুল মনে করে নিয়েছেন। এ প্রসংগে তাঁরা এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, বাপের সেবা মেয়ের বিয়ের মোহরানা হিসেবে গণ্য হতে পারে কিনা? এবং বিয়ে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাইরের শর্ত শামিল হতে পারে কি? অথচ আলোচ্য আয়াতের ভাষ্য থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, এটি বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল না। বরং এটি ছিল প্রাথমিক কথাবার্তা, বিয়ের পূর্বে বিয়ের প্রস্তাব আসার পর সাধারণভাবে দুনিয়ায় যে ধরনের কথাবার্তা হয়ে থাকে। এটা কেমন করে বিয়ের ইজাব কবুল হতে পারে যখন একথাই স্থিরীকৃত হয়নি দু'টি মেয়ের মধ্য থেকে কোন্‌টির সাথে বিয়ে দেয়া হচ্ছে? কথাবার্তা শুধু এতটুকু হয়েছিল যে ঃ "আমার মেয়েদের মধ্য থেকে একটির সাথে আমি তোমার বিয়ে দিতে চাই। তবে শর্ত হচ্ছে, তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, আট দশ বছর আমার এখানে থেকে আমার কাজে সাহায্য করতে হবে। কারণ এ আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপনের পেছনে আমার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি বৃদ্ধ লোক কোন ছেলে সন্তান আমার নেই, যে আমার সম্পত্তি দেখাশুনা ও ব্যবস্থাপনা করতে পারে। আমার আছে মেয়ে। বাধ্য হয়ে তাদেরকে আমি বাইরে পাঠাই। আমি চাই আমার জামাতা আমার দক্ষিণ হস্ত হয়ে থাকবে। এ দায়িত্ব যদি তুমি পালন করতে পারো এবং বিয়ের পরেই স্ত্রীকে নিয়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছা না থাকে তাহলে আমার মেয়ের বিয়ে আমি তোমার সাথে দেবো। হযরত মূসা নিজেই এসময় একটি আশ্রয়ের সন্ধানে ছিলেন। তিনি এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, বিয়ের পূর্বে বর পক্ষ ও কণে পক্ষের মধ্যে যেসব চুক্তি হয়ে থাকে এটি ছিল সে ধরনের একটি চুক্তি। এরপর যথারীতি আসল বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকবে এবং তাতে মোহরানাও নির্ধারিত হয়ে থাকবে। সে বিয়েতে সেবা কর্মের কোন শর্ত শামিল হওয়ার কোন কারণ ছিল না।

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۖ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

৪ রুকূ'

মূসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করে দিল।[৪০] এবং নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে চললো তখন তূর পাহাড়ের দিক থেকে একটি আগুন দেখতে পেলো।[৪১] সে তার পরিবারবর্গকে বললো, "থামো, আমি একটি আগুন দেখেছি, হয়তো আমি সেখান থেকে কোন খবর আনতে পারি অথবা সেই আগুন থেকে কোন অংগারই নিয়ে আসতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।" সেখানে পৌঁছার পর উপত্যকার ডান কিনারায় [৪২] পবিত্র ভূখণ্ডে [৪৩] একটি বৃক্ষ থেকে আহবান এলো, "হে মূসা! আমিই আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের অধিপতি।"

৪০. হযরত হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, হযরত মূসা (আ) আট বছরের জায়গায় দশ বছরের মেয়াদ পুরা করেছিলেন। ইবনে আববাসের বর্ণনা মতে এ বক্তব্যটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, قضى موسى اتم الاجلين واطيبهما عشر سنين অর্থাৎ "মূসা আলাইহিস সালাম দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেটি বেশী পরিপূর্ণ এবং তাঁর শ্বশুরের জন্য বেশী সন্তোষজনক সেটি পূর্ণ করেছিলেন অর্থাৎ দশ বছর।"

৪১. এ সফরে হযরত মূসার তূর পাহাড়ের দিকে যাওয়া দেখে অনুমান করা যায় তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে সম্ভবত মিসরের দিকে যেতে চাচ্ছিলেন। কারণ মাদ্য়ান থেকে মিসরের দিকে যে পথটি গেছে তূর পাহাড় তার ওপর অবস্থিত। সম্ভবত হযরত মূসা মনে করে থাকবেন, দশটি বছর চলে গেছে, যে ফেরাউনের শাসনামলে তিনি মিসর থেকে বের হয়েছিলেন সে মারা গেছে, এখন যদি আমি নীরবে সেখানে চলে যাই এবং নিজের পরিবারের লোকজনদের সাথে অবস্থান করতে থাকি তাহলে হয়তো আমার কথা কেউ জানতেই পারবে না।

ঘটনা বিন্যাসের দিক দিয়ে বাইবেলের বর্ণনা এখানে কুরআন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাইবেল বলে, হযরত মূসা তাঁর শ্বশুরের ছাগল চরাতে চরাতে "প্রান্তরের পশ্চাদভাগে

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾

আর (হুকুম দেয়া হলো) ছুঁড়ে দাও তোমার লাঠিটি। যখনই মূসা দেখলো লাঠিটি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে তখনই সে পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো এবং একবার ফিরেও তাকালো না। বলা হলো, "হে মূসা! ফিরে এসো এবং ভয় করো না, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তোমার হাত বগলে রাখো উজ্জল হয়ে বের হয়ে আসবে কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই।[৪৪] এবং ভীতিমুক্ত হবার জন্য নিজের হাত দু'টি চেপে ধরো।[৪৫] এ দু'টি উজ্জল নিদর্শন তোমার রবের পক্ষ থেকে ফেরাউন ও তার সভাসদদের সামনে পেশ করার জন্য, তারা বড়ই নাফরমান।[৪৬]

মেষপাল লইয়া গিয়া হোরেবে ঈশ্বরের পর্বতে" চলে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি নিজের শ্বশুরের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। এবং তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজের সন্তান সন্ততি সহকারে মিসরের পথে যাত্রা করেছিলেন। (যাত্রা পুস্তক ৩ ঃ ১ এবং ৪ ঃ ১৮) অপর দিকে কুরআন বলে, হযরত মূসা মেয়াদ পুরা করার পর নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে মাদ্‌য়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং এ সফরে আল্লাহর সাথে কথাবার্তা এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

বাইবেল ও তালমূদের সম্মিলিত বর্ণনা হচ্ছে, যে ফেরাউনের পরিবারে হযরত মূসা প্রতিপালিত হয়েছিলেন তাঁর মাদ্‌য়ানে অবস্থানকালে সে মারা গিয়েছিল এবং তারপর অন্য একজন ফেরাউন ছিল মিসরের শাসক।

৪২. অর্থাৎ হযরত মূসার ডান হাতের দিকে যে কিনারা ছিল সেই কিনারায়।

৪৩. অর্থাৎ আল্লাহর দ্যুতির আলোকে যে ভূখণ্ড আলোকিত হচ্ছিল।

৪৪. এ মু'জিযা দু'টি তখন হযরত মূসাকে দেখানোর কারণ হচ্ছে, প্রথমত যাতে তার মনে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, প্রকৃতপক্ষে যে সত্তা বিশ্ব–জাহানের সমগ্র ব্যবস্থার স্রষ্টা, অধিপতি, শাসক ও পরিচালক তিনিই তাঁর সাথে কথা বলছেন। দ্বিতীয়ত এ মু'জিযাগুলো দেখে তিনি এ মর্মে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন যে, তাঁকে ফেরাউনের কাছে যে ভয়াবহ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে সেখানে তিনি একেবারে খালি হাতে তার মুখোমুখি হবেন না বরং প্রচণ্ড শক্তিশালী অস্ত্র নিয়ে যাবেন।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿٣٣﴾ وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْٓ ۡ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿٣٥﴾

মূসা নিবেদন করলো, "হে আমার প্রভু! আমি যে তাদের একজন লোককে হত্যা করে ফেলেছি, ভয় হচ্ছে, তারা আমাকে মেরে ফেলবে।[৪৭] আর আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে বেশী বাকপটু, তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠাও, যাতে সে আমাকে সমর্থন দেয়, আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে"। বললেন, তোমার ভাইয়ের সাহায্যে আমি তোমার শক্তি বৃদ্ধি করবো এবং তোমাদের দু'জনকে এমনই প্রতিপত্তি দান করবো যে, তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার নিদর্শনগুলোর জোরে তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই বিজয় লাভ করবে।"[৪৮]

৪৫. অর্থাৎ যখন কোন ভয়াবহ মুহূর্ত আসে, যার ফলে তোমার মনে ভীতির সঞ্চার হয় তখন নিজের বাহু চেপে ধরো। এর ফলে তোমার মন শক্তিশালী হবে এবং ভীতি ও আশংকার কোন রেশই তোমার মধ্যে থাকবে না।

বাহু বা হাত বলতে সম্ভবত ডান হাত বুঝানো হয়েছে। কারণ সাধারণভাবে হাত বললে ডান হাতই বুঝানো হয়। চেপে ধরা দু'রকম হতে পারে। এক, হাত পার্শ্বদেশের সাথে লাগিয়ে চাপ দেয়া। দুই, এক হাতকে অন্য হাতের বগলের মধ্যে রেখে চাপ দেয়া। এখানে প্রথম অবস্থাটি প্রযোজ্য হবার সম্ভাবনা বেশী। কারণ এ অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তি অনুভব করতে পারবে না যে, এ ব্যক্তি মনের ভয় দূর করার জন্য কোন বিশেষ কাজ করছে।

হযরত মূসাকে যেহেতু একটি জালেম সরকারের মোকাবিলা করার জন্য কোন সৈন্য সামন্ত ও পার্থিব সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই পাঠানো হচ্ছিল তাই তাঁকে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়। বারবার এমন ভয়ানক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল যাতে একজন মহান দৃঢ়চেতা নবীও আতংকমুক্ত থাকতে পারতেন না। মহান আল্লাহ বলেন, এ ধরনের কোন অবস্থা দেখা দিলে তুমি স্রেফ এ কাজটি করো, ফেরাউন তার সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করেও তোমার মনের জোর শিথিল করতে পারবে না।

৪৬. এ শব্দগুলোর মধ্যে এ বক্তব্য নিহিত রয়েছে যে, এ নিদর্শনগুলো নিয়ে ফেরাউনের কাছে যাও এবং আল্লাহর রসূল হিসেবে নিজেকে পেশ করে তাকে ও তার রাষ্ট্রীয় প্রশাসকবৃন্দকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও বন্দেগীর দিকে আহবান

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُوا۟ مَا هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝

তারপর মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে পৌঁছুলো তখন তারা বললো, এসব বানোয়াট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।[৪৯] *আর এসব কথা তো আমরা আমাদের বাপ দাদার কালে কখনো শুনিনি।*[৫০] *মূসা জবাব দিল, "আমার রব তার অবস্থা ভালো জানেন, যে তার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশনা নিয়ে এসেছে এবং কার শেষ পরিণতি ভালো হবে তাও তিনিই ভালো জানেন, আসলে জালেম কখনো সফলকাম হয় না।"*[৫১]

জানাও। তাই এখানে তাঁর এ নিযুক্তির বিষয়টি সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বলা হয়নি। তবে কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা ত্বা–হা ও সূরা নাযি'আতে বলা হয়েছে اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى "ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে।" সূরা আশ্ শূ'আরায় বলা হয়েছে ঃ

اِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰۤى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

"যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বললেন, যাও জালেম জাতির কাছে, ফেরাউনের জাতির কাছে।"

৪৭. এর অর্থ এ ছিল না যে, এ ভয়ে আমি সেখানে যেতে চাই না। বরং অর্থ ছিল, আপনার পক্ষ থেকে এমন কোন ব্যবস্থা থাকা উচিত যার ফলে আমার সেখানে পৌঁছার সাথে সাথেই কোন প্রকার কথাবার্তা ও রিসালাতের দায়িত্বপালন করার আগেই তারা যেন আমাকে হত্যার অপরাধে গ্রেফতার করে না নেয়। কারণ এ অবস্থায় তো আমাকে যে উদ্দেশ্যে এ অভিযানে সেখানে পাঠানো হচ্ছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। পরবর্তী ইবারত থেকে একথা স্বতস্ফূর্তভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত মূসার এ আবেদনের উদ্দেশ্য মোটেই এরূপ ছিল না যে, তিনি ভয়ে নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ এবং ফেরাউনের কাছে যেতে অস্বীকার করতে চাচ্ছিলেন।

৪৮. আল্লাহর সাথে হযরত মূসার এ সাক্ষাত ও কথাবার্তার অবস্থা এর চাইতেও বিস্তারিতভাবে সূরা ত্বা–হার ৯ থেকে ৪৮ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মজীদ এ ব্যাপারে যে বর্ণনা দিয়েছে তাকে যে ব্যক্তি বাইবেলের যাত্রা পুস্তকের ৩ ও ৪ অধ্যায়ের

এতদসংক্রান্ত বর্ণনার সাথে তুলনা করবে, সে যদি কিছুটা ভারসাম্য পূর্ণ রুচির অধিকারী হয়ে থাকে তাহলে এ দু'য়ের মধ্য থেকে কোন্‌টি আল্লাহর কালাম এবং কোন্‌টিকে মানুষের তৈরি গল্প বলা যাবে তা সে নিজেই উপলব্ধি করতে পারবে। তাছাড়া কুরআনের এ বর্ণনা নাউযুবিল্লাহ বাইবেল ও ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে নকল করা হয়েছে, না যে আল্লাহ হযরত মূসাকে তাঁর সাথে সাক্ষাত করিয়েছিলেন তিনি নিজেই আসল ঘটনা বর্ণনা করছেন, এ ব্যাপারেও সে সহজে নিজের মত স্থির করতে পারবে। (আরো বেশী জানতে হলে দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা, ১৯ টীকা)

৪৯. মূলে বলা হয়েছে سِحْرٌ مُّفْتَرًى "বানোয়াট যাদু।" এ বানোয়াটকে যদি মিথ্যা অর্থে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, এ লাঠির সাপে পরিণত হওয়া এবং হাতের ঔজ্জ্বল্য বিকীরণ করা মূল জিনিসের মধ্যে প্রকৃত পরিবর্তন নয় বরং এটা হচ্ছে নিছক একটি লোক দেখানো প্রতারণামূলক কৌশল, একে মু'জিযা বলে এ ব্যক্তি আমাদের ধোকা দিচ্ছে। আর যদি একে বানোয়াট অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, এ ব্যক্তি কোন কৌশল অবলম্বন করে এমন একটি জিনিস তৈরি করে এনেছে, যা দেখতে লাঠির মতো কিন্তু যখন সে সেটাকে ছুঁড়ে দেয় তখন সাপের মতো দেখায়। আর নিজের হাতেও সে এমন কিছু জিনিস মাখিয়ে নিয়েছে যার ফলে তা বগল থেকে বের হবার পর হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ কৃত্রিম যাদু সে নিজেই তৈরি করেছে কিন্তু আমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছে এ বলে যে, এটি আল্লাহ প্রদত্ত একটি মু'জিযা।

৫০. রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হযরত মূসা যেসব কথা বলেছিলেন সে দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য জায়গায় এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। আন-নাযি'আতে বলা হয়েছে, হযরত মূসা তাকে বলেন ঃ

هَلْ لَّكَ اِلَى اَنْ تَزَكّٰى ○ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى-

"তুমি কি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নীতি অবলম্বন করতে আগ্রহী? এবং আমি তোমাকে তোমার রবের পথ বাতলে দিলে কি তুমি ভীত হবে?" (আন-নাযি'আত-১৮-১৯)

সূরা ত্বা-হায়ে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ط وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ○ اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى -(طٰهٰ : ٤٧-٤٨)

"আমরা তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আর যে ব্যক্তি সঠিক পথের অনুসারী হয় তার জন্য রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা। আমাদের প্রতি অহী নাযিল করা হয়েছে এ মর্মে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।" আর اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ "আমরা তোমার রবের পয়গম্বর, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও।" এ কথাগুলো সম্পর্কেই ফেরাউন বলে, আমাদের বাপ দাদারাও কখনো একথা শোনেনি যে, মিসরের ফেরাউনের উপরেও কোন কর্তৃত্বশালী সত্তা আছে, যে তাকে হুকুম করার ক্ষমতা রাখে, তাকে শাস্তি দিতে পারে, তাকে নির্দেশ দেবার জন্য কোন লোককে তার দরবারে পাঠাতে

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى يَـٰهَـٰمَـٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ۝٣٨

আর ফেরাউন বললো, "হে সভাসদবর্গ! তো আমি নিজেকে ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রভু আছে বলে জানি না।৫২ ওহে হামান! আমার জন্য ইট পুড়িয়ে একটি উঁচু প্রাসাদ তৈরি করো, হয়তো তাতে উঠে আমি মূসার প্রভুকে দেখতে পাবো, আমিতো তাকে মিথ্যুক মনে করি।।"৫৩

পারে এবং যাকে ভয় করার জন্য মিসরের বাদশাহকে উপদেশ দেয়া যেতে পারে। এ সম্পূর্ণ অভিনব কথা আমরা আজ এক ব্যক্তির মুখে শুনছি।

৫১. অর্থাৎ তুমি আমাকে যাদুকর ও মিথ্যুক গণ্য করছো কিন্তু আমার রব আমার অবস্থা ভালো জানেন। তিনি জানেন তাঁর পক্ষ থেকে যাকে রসূল নিযুক্ত করা হয়েছে সে কেমন লোক। পরিণামের ফায়সালা তাঁরই হাতে রয়েছে। আমি মিথ্যুক হলে আমার পরিণাম খারাপ হবে এবং তুমি মিথ্যুক হলে ভালোভাবে জেনে রাখো তোমার পরিণাম ভালো হবে না। মোট কথা জালেমের মুক্তি নেই, এ সত্য অপরিবর্তনীয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূল নয় এবং মিথ্যা রসূল সেজে নিজের কোন স্বার্থোদ্ধার করতে চায় সেও জালেম এবং সেও মুক্তি ও সাফল্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। আর যে ব্যক্তি নানা ধরনের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সত্য রসূলকে মিথ্যা বলে এবং ধোকাবাজদের সাহায্যে সত্যকে দমন করতে চায় সেও জালেম এবং সেও কখনো মুক্তি ও সাফল্য লাভ করবে না।

৫২. এ উক্তির মাধ্যমে ফেরাউন যে বক্তব্য পেশ করেছে তার অর্থ এ ছিল না এবং এ হতেও পারতো না যে, আমিই তোমাদের এবং পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা। কারণ কেবলমাত্র কোন পাগলের মুখ দিয়েই এমন কথা বের হতে পারতো। অনুরূপভাবে এ অর্থ এও ছিল না এবং হতে পারতো না যে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। কারণ মিসরবাসীরা বহু দেবতার পূজা করতো এবং স্বয়ং ফেরাউনকেই যেভাবে উপাস্যের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল তাও শুধুমাত্র এই ছিল যে, তাকে সূর্য দেবতার অবতার হিসেবে স্বীকার করা হতো। সবচেয়ে বড় সাক্ষী কুরআন মজীদ নিজেই। কুরআনে বলা হয়েছে ফেরাউন নিজে বহু দেবতার পূজারী ছিল ঃ

وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُۥ لِيُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ –

"আর ফেরাউনের জাতির সরদাররা বললো, তুমি কি মূসা ও তার জাতিকে অবাধ ছাড়পত্র দিয়ে দেবে যে, তারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করুক এবং তোমাকে ও তোমার উপাস্যদেরকে ত্যাগ করুক?" (আল আ'রাফ : ১২৭)

তাই ফেরাউন এখানে অবশ্যই "ইলাহ" শব্দটি নিজের জন্য স্রষ্টা ও উপাস্য অর্থে নয় বরং সার্বভৌম ও স্বয়ং সম্পূর্ণ শাসক এবং তাকে আনুগত্য করতে হবে, এ অর্থে ব্যবহার করেছিল। তার বলার উদ্দেশ্য ছিল, আমিই মিসরের এ সরযমীনের মালিক। এখানে আমারই হুকুম চলবে। আমারই আইনকে এখানে আইন বলে মেনে নিতে হবে। আমারই সত্তাকে এখানে আদেশ ও নিষেধের উৎস বলে স্বীকার করতে হবে। এখানে অন্য কেউ তার হুকুম চালাবার অধিকার রাখে না। এ মূসা কে? সে রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি সেজে দাঁড়িয়েছে এবং আমাকে এমনভাবে হুকুম শুনাচ্ছে যেন সে আসল শাসনকর্তা এবং আমি তার হুকুমের অধীন? এ কারণে সে তার দরবারের লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল :

يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ

"হে আমার জাতি! মিসরের বাদশাহী কি আমারই নয় এবং এ নদীগুলো কি আমার অধীনে প্রবাহিত নয়?" (আয্ যুখ্রুফ: ৫১)

আর এ কারণেই সে বারবার হযরত মূসাকে বলছিল :

اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ـ

"তুমি কি এসেছো আমাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে যে পদ্ধতি চলে আসছে তা থেকে আমাদের সরিয়ে দিতে এবং যাতে এদেশে তোমাদের দু'ভাইয়ের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়?" (ইউনুস :৭৮)

اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ـ

"হে মূসা ! তুমি কি নিজের যাদুবলে আমাদের ভূখণ্ড থেকে আমাদের উৎখাত করতে এসেছো? (ত্বা-হা : ৫৭)

اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ ـ

"আমি ভয় করছি এ ব্যক্তি তোমাদের দীন পরিবর্তিত করে দেবে অথবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।" (আল মু'মিন : ২৬)

এদিক দিয়ে চিন্তা করলে যেসব রাষ্ট্র আল্লাহর নবী প্রদত্ত শরীয়াতের অধীনতা প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের তথাকথিত রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বের দাবীদার, ফেরাউনের অবস্থা তাদের থেকে ভিন্নতর ছিল না। তারা আইনের উৎস এবং আদেশ নিষেধের কর্তা হিসেবে অন্য কোন বাদশাকে মানুক অথবা জাতির ইচ্ছার আনুগত্য

করুক, যতক্ষণ তারা এরূপ নীতি অবলম্বন করে চলবে যে, দেশে আল্লাহ ও তার রসূলের নয় বরং আমাদের হুকুম চলবে, ততক্ষণ তাদের ও ফেরাউনের নীতি ও ভূমিকার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য থাকবে না। এটা ভিন্ন কথা যে, অবুঝ লোকেরা একদিকে ফেরাউনকে অভিসম্পাত করতে থাকে, অন্যদিকে ফেরাউনী রীতিনীতির অনুসারী এসব শাসককে বৈধতার ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যের জ্ঞান রাখে, সে শব্দ ও পরিভাষা নয়, অর্থ ও প্রাণশক্তি দেখবে। ফেরাউন নিজের জন্য "ইলাহ" শব্দ ব্যবহার করেছিল এবং এরা সেই একই অর্থে "সার্বভৌমত্বের" পরিভাষা ব্যবহার করছে, এতে এমন কী পার্থক্য সৃষ্টি হয়! (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা–হা ২১ টীকা)

৫৩. বর্তমান যুগের রুশীয় কম্যুনিষ্টরা একই ধরনের মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে যাচ্ছে। তারা স্পুটনিক ও লুনিকে চড়ে মহাশূন্যে উঠে দুনিয়াবাসীকে খবর দিচ্ছে, আমাদের মহাশূন্য যাত্রীরা উপরে কোথাও আল্লাহর সন্ধান পায়নি।* ওদিকে এ নির্বোধটিও মিনারে উঠে আল্লাহকে দেখতে চাচ্ছিল। এ থেকে জানা যায়, বিভ্রান্ত লোকদের মানসিকতা সাড়ে তিন হাজার বছর আগে যেমনটি ছিল আজও তেমনটিই আছে। এদিক দিয়ে তারা এক ইঞ্চি পরিমাণও উন্নতি করতে পারেনি। জানিনা কোন্ আহাম্মক তাদেরকে এ খবর দিয়েছিল যে, আল্লাহ বিশ্বাসী লোকেরা যে রব্বুল আলামীনকে মানে তিনি তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী উপরে কোথাও বসে আছেন। আর এ কূলকিনারাহীন মহাবিশ্বে কয়েক হাজার ফুট বা কয়েক লাখ মাইল উপরে উঠে যদি তারা তাঁর সাক্ষাত না পায় তাহলে যেন এ কথা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, তিনি কোথাও নেই।

কুরআন এখানে একথা বলছে না যে, ফেরাউন সত্যিসত্যিই একটি ইমারত এ উদ্দেশ্যে বানিয়েছিল এবং তাতে উঠে আল্লাহকে দেখার চেষ্টা করেছিল। বরং কুরআন শুধুমাত্র তার এ উক্তি উদ্ধৃত করছে। এ থেকে আপাত দৃষ্টে মনে হয় সে কার্যত এ বোকামি করেনি। এ কথাগুলোর মাধ্যমে কেবলমাত্র মানুষকে বোকা বানানোই ছিল তার উদ্দেশ্য।

ফেরাউন সত্যিই বিশ্ব–জাহানের মালিক ও প্রভূ আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো, না নিছক জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে নাস্তিক্যবাদী কথা বার্তা বলতো, তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। তার উক্তিগুলো থেকে ঠিক একই ধরনের মানসিক অস্থিরতার সন্ধান পাওয়া যায় যেমন রুশ কম্যুনিষ্টদের কথাবার্তায় পাওয়া যায়। কখনো সে আকাশে উঠে দুনিয়াবাসীকে জানাতে চাইতো, আমি উপরে সব দেখে এসেছি, মূসার আল্লাহ কোথাও নেই। আবার কখনো বলতো–

فَلَوْلَآ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ

"যদি সত্যিই মূসা আল্লাহর প্রেরিত হয়ে থাকে, তাহলে কেন তার জন্য সোনার কাঁকন অবতীর্ণ হয়নি অথবা ফেরেশতারা তার আরদালী হয়ে আসেনি কেন?"

* অবশ্য ১৯৯১ তে এসে রুশী কম্যুনিষ্টদের আর আল্লাহর সন্ধানে স্পুটনিকে ও লুনিকে চড়তে হচ্ছে না। এখন বাস্তবতার প্রচণ্ড আঘাতে তারা কম্যুনিজম ত্যাগ করে আল্লাহকে স্বীকৃতি দেবার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। –অনুবাদক

সে এবং তার সৈন্যরা পৃথিবীতে কোন সত্য ছাড়াই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করলো ৫৪ এবং মনে করলো তাদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না।৫৫ শেষে আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সাগরে নিক্ষেপ করলাম।৫৬ এখন এ জালেমদের পরিণাম কি হয়েছে দেখে নাও। তাদেরকে আমি জাহান্নামের দিকে আহবানকারী নেতা করেছিলাম৫৭ এবং কিয়ামতের দিন তারা কোথাও থেকে কোন সাহায্য লাভ করতে পারবে না। এ দুনিয়ায় আমি তাদের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে বড়ই ঘৃণার্হ ও ধিকৃত।৫৮

এ কথাগুলো রাশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভের কথা থেকে মোটেই ভিন্নতর নয়। তিনি কখনো আল্লাহকে অস্বীকার করতেন আবার কখনো বারবার আল্লাহর নাম নিতেন এবং তাঁর নামে কসম খেতেন। আমাদের অনুমান, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তাঁর খলীফাদের যুগ শেষ হবার পর মিসরে কিবৃতী জাতীয়তাবাদের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং স্বদেশপ্রীতির ভিত্তিতে দেশে রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়। এ সময় নতুন নেতৃত্ব জাত্যাভিমানের আবেগে আল্লাহর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হযরত ইউসুফ ও তাঁর অনুসারী ইসরাঈলী এবং মিসরীয় মুসলমানরা তাদেরকে আল্লাহকে মেনে চলার দাওয়াত দিয়ে আসছিলেন। তারা মনে করলো, আল্লাহকে মেনে নিয়ে আমরা ইউসুফীয় সংস্কৃতির প্রভাব মুক্ত হতে পারবো না এবং এ সংস্কৃতি জীবিত থাকলে আমাদের রাজনৈতিক প্রভাবও শক্তিশালী হতে পারবে না। তারা আল্লাহকে স্বীকৃতি দেবার সাথে মুসলিম কর্তৃত্বকে অংগাংগীভাবে জড়িত মনে করছিল। তাই একটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য অন্যটিকে অস্বীকার করা তাদের জন্য জরুরী ছিল, যদিও তার অস্বীকৃতি তাদের অন্তরের ভেতর থেকে বের হয়েও বের হচ্ছিল না।

৫৪. অর্থাৎ এ বিশ্ব-জাহানে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কিন্তু ফেরাউন এবং তার সৈন্যরা পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র অংশে সামান্য একটু কর্তৃত্বের

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٥﴾

৫ রুকূ'

পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোকে ধ্বংস করার পর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম লোকদের জন্য আত্মজ্ঞান লাভের সহায়ক। পথনির্দেশনা ও রহমত হিসেবে, যাতে লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করে।[৫৯] (হে মুহাম্মাদ!) তুমি সে সময় পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না[৬০] যখন আমি মূসাকে এ শরীয়াত দান করেছিলাম এবং তুমি সাক্ষীদের অন্তরভুক্তও ছিলে না।[৬১] বরং এরপর (তোমার যুগ পর্যন্ত) আমি বহু প্রজন্মের উদ্ভব ঘটিয়েছি এবং তাদের ওপর অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।[৬২] তুমি মাদ্‌য়ানবাসীদের মধ্যেও উপস্থিত ছিলে না, যাতে তাদেরকে আমার আয়াত শুনাতে পারতে[৬৩] কিন্তু আমি সে সময়কার এসব তথ্য জানাচ্ছি।

অধিকারী হয়ে মনে করে বসলো এখানে একমাত্র তারাই শ্রেষ্ঠ এবং তাদেরই সর্বময় কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিরাজিত।

৫৫. অর্থাৎ তারা নিজেদের ব্যাপারে মনে করলো তাদেরকে কোথাও জিজ্ঞাসিত হতে হবে না। আর তাদেরকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না মনে করে তারা স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ করতে লাগলো।

৫৬. এ শব্দগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাদের মিথ্যা অহমিকার মোকাবিলায় তাদের নিকৃষ্টতা ও হীনতার চিত্র তুলে ধরেছেন। তারা নিজেদেরকে অনেক বড় কিছু মনে করে বসেছিল। কিন্তু সঠিক পথে আসার জন্য আল্লাহ তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছিলেন তা যখন খতম হয়ে গেলো তখন তাদেরকে এমনভাবে সাগরে নিক্ষেপ করা হলো যেমন খড়কুটা ও ময়লা–আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়।

৫৭. অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তারা একটি দৃষ্টান্ত কায়েম করে গেছে। জুলুম কিভাবে করা হয়, সত্য অস্বীকার করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার ওপর কিভাবে অবিচল থাকা যায় এবং সত্যের মোকাবিলায় বাতিলের জন্য লোকেরা কেমন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾

আর তুমি তূর পাহাড়ের পাশেও তখন উপস্থিত ছিলে না যখন আমি (মূসাকে প্রথমবার) ডেকেছিলাম। কিন্তু এটা তোমার রবের অনুগ্রহ (যার ফলে তোমাকে এসব তথ্য দেয়া হচ্ছে)[৬৪] যাতে তুমি তাদেরকে সতর্ক করো যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি,[৬৫] হয়তো তারা সচেতন হয়ে যাবে।

করতে পারে, এসব তারা করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। দুনিয়াবাসীকে এসব পথ দেখিয়ে দিয়ে তারা জাহান্নামের দিকে এগিয়ে গেছে। এখন তাদের উত্তরসূরীরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে সেই মনযিলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

৫৮. মূলে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন তারা "মাকবূহীন"দের অন্তরভুক্ত হবে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তারা হবে প্রত্যাখ্যাত ও বহিস্কৃত। আল্লাহর রহমত থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে। তাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় করে দেয়া হবে। তাদের চেহারা বিকৃত করে দেয়া হবে।

৫৯. অর্থাৎ পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলো যখন পূর্বের নবীদের শিক্ষাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার অশুভ পরিণাম ভোগ করেছিল এবং ফেরাউন ও তার সৈন্যরা যে পারিণতি দেখেছিল তাই হলো তাদের শেষ পরিণতি। তখন তার পরে মূসা আলাইহিস সালামকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, যাতে মানব জাতির একটি নব যুগের সূচনা হয়।

৬০. পশ্চিম প্রান্ত বলতে সিনাই উপদ্বীপের যে পাহাড়ে হযরত মূসাকে শরীয়াতের বিধান দেয়া হয়েছিল সেই পাহাড় বুঝানো হয়েছে। এ এলাকাটি হেজাযের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

৬১. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের সত্তর জন প্রতিনিধি যাদেরকে শরীয়াতের বিধান মেনে চলার অংগীকার করার জন্য হযরত মূসার সাথে ডাকা হয়েছিল। (সূরা আ'রাফের ১৫৫ আয়াতে এ প্রতিনিধিদের ডেকে নেবার কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং বাইবেলের যাত্রা পুস্তকের ২৪ অধ্যায়েও এর আলোচনা করা হয়েছে।)

৬২. অর্থাৎ সরাসরি এ তথ্যগুলো লাভ করার কোন উপায় তোমাদের ছিল না। আজ দু'হাজার বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পরও যে, তোমরা এ ঘটনাবলীকে এমনভাবে বর্ণনা করছো যেন তোমাদের চোখে দেখা ঘটনা, আল্লাহর অহীর মাধ্যমে এসব তথ্য তোমাদের সরবরাহ করা হচ্ছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া এর আর কোন কারণ নেই।

৬৩. অর্থাৎ যখন হযরত মূসা মাদ্‌য়ানে পৌছেন, তাঁর সাথে সেখানে যা কিছু ঘটে এবং দশ বছর অতিবাহিত করে যখন তিনি সেখান থেকে রওয়ানা দেন তখন সেখানে কোথাও তোমার কোন পাত্তাই ছিল না। তুমি আজ মক্কার অলিতে গলিতে যে কাজ করে

বেড়াচ্ছো সে সময় মাদ্‌য়ানের জনবসতিগুলোতে সে কাজ করতে না। তুমি চোখে দেখে এ ঘটনাবলীর উল্লেখ করছো না বরং আমার অহীর মাধ্যমেই তোমারা এ জ্ঞানও লাভ করছো।

৬৪. এ তিনটি কথাই পেশ করা হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে। যখন একথাগুলো পেশ করা হয়েছিল তখন মক্কার সমস্ত সরদার ও সাধারণ কাফেররা কোন প্রকারে তাঁকে অ–নবী এবং নাউযুবিল্লাহ নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ইয়াহুদী উলামা ও খৃষ্টান 'রাহিব' তথা সংসারত্যাগী–যোগী সন্ন্যাসীরাও হেজাযের জনপদগুলোতে উপস্থিত ছিল। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কোন মহাশূন্য থেকে এসে কুরআন শুনিয়ে যেতেন না। বরং তিনি ছিলেন সেই মক্কারই বাসিন্দা। তাঁর জীবনের কোন একটি দিকও তাঁর জনপদ ও গোত্রের লোকদের কাছে গোপন ছিল না। এ কারণেই যখন এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের আকারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ এ তিনটি কথা বলা হলো তখন মক্কা, হেজায এবং সারা আরবের কোন এক ব্যক্তিও উঠে এমন বেহুদা কথা বলেনি যা আজকের পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদরা বলছেন। যদিও মিথ্যা তৈরি করার ব্যাপারে তারা এদের চেয়ে কম যেতো না তবুও যে ডাহা মিথ্যা এক মুহূর্তের জন্যও চলতে পারে না তা তারা বলতো কেমন করে। তারা কেমন করে বলতো, হে মুহাম্মাদ, তুমি অমুক অমুক ইহুদী আলেম ও খৃষ্টান রাহেবের কাছ থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করে এনেছো! কারণ সারা দেশে এ উদ্দেশ্যে তারা কোন একজনেরও নাম নিতে পারতো না। তারা কারো নাম নেবার সাথে সাথেই প্রমাণ হয়ে যেতো যে, নবী (সা) তার কাছ থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করেননি। তারা কেমন করে বলতো, হে মুহাম্মাদ! বিগত ইতিহাস এবং সাহিত্য ও যাবতীয় বিদ্যার গ্রন্থরাজি সম্বলিত একটি লাইব্রেরী তোমার আছে! সেই গ্রন্থরাজির সহায়তায় তুমি এসব বক্তৃতা দিচ্ছো। কারণ লাইব্রেরী তো দূরের কথা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশে পাশে কোথাও থেকে তারা এসব তথ্য সম্বলিত একটি কাগজের টুকরোও বের করতে সক্ষম ছিল না। মক্কার প্রতিটি শিশুও জানতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখাপড়া জানা লোক নন। আবার কেউ একথাও বলতে পারতো না যে, তিনি কিছু অনুবাদক নিযুক্ত করে রেখেছেন, তারা হিব্রু, সুরিয়ানী ও গ্রীক গ্রন্থরাজী থেকে তরজমা করে তাঁকে দেয়। তারপর তাদের সবচেয়ে বড় বেহায়া লোকটিও এ দাবী করার সাহস করতো না যে, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের বাণিজ্য সফরে গিয়ে আপনি এ তথ্যাবলী সংগ্রহ করে এনেছিলেন। কারণ এ সফরে তিনি একা ছিলেন না। মক্কারই বাণিজ্যিক কাফেলা প্রত্যেক সফরে তাঁর সাথে থাকতো। যদি তখন কেউ এ ধরনের দাবী করতো তাহলে শত শত জীবিত সাক্ষী এ সাক্ষ দিতো যে, সেখানে তিনি কারো কাছ থেকে কোন পাঠ নেননি। আর তাঁর ইন্তিকালের পর তো দু'বছরের মধ্যেই রোমানদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যদি মিথ্যামিথ্যাই সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে কোন খৃষ্টান রাহেব বা ইহুদী রব্বির সাথে নবী (সা) কোন আলাপ আলোচনা করে থেকে থাকতেন তাহলে রোমান সরকার তিলকে তাল করে দিতো এবং এ প্রপাগাণ্ডা করতে একটুও পিছপাও হতো না যে, মুহাম্মাদ (সা) (নাউযুবিল্লাহ) সবকিছু এখান থেকে শিখে গেছেন এবং এখান থেকে মক্কায় গিয়ে নবী সেজে বসেছেন। মোটকথা যে যুগে কুরআনের

এ চ্যালেঞ্জ কুরাইশদের কাফের ও মুশরিকদের জন্য মৃত্যুর বারতা ঘোষণা করতো এবং তাকে মিথ্যা বলার প্রয়োজন বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদদের তুলনায় তাদের জন্য ছিল অনেক বেশী, সে যুগে কোন ব্যক্তিও কোথাও থেকে এমন কোন উপাদান সংগ্রহ করে আনতে পারেনি যা থেকে একথা প্রমাণ হতে পারতো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী ছাড়া এ তথ্যগুলো সংগ্রহ করার দ্বিতীয় এমন কোন মাধ্যম আছে যার উল্লেখ করা যেতে পারে।

একথাও জেনে রাখা উচিত, কুরআন এই চ্যালেঞ্জ শুধু এখানেই দেয়নি বরং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাহিনী প্রসঙ্গে দিয়েছে। হযরত যাকারিয়া ও হযরত মারয়ামের কাহিনী বর্ণনা করে বলেছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ -

"এ হচ্ছে অদৃশ্য খবরের অন্তরভুক্ত, যা আমি অহীর মাধ্যমে তোমাকে দিচ্ছি। তুমি তাদের আশেপাশে কোথাও ছিলে না যখন তারা মারয়ামের তত্বাবধানের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে একথা জানার জন্য তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল। তুমি তখনও উপস্থিত ছিলে না যখন তারা ঝগড়া করছিল। (আলে ইমরান ঃ ৪৪)

হযরত ইউসুফের কাহিনী বর্ণনা করার পর বলা হচ্ছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ -

"এ হচ্ছে গায়েবের খবরের অন্তরভুক্ত, যা আমি অহীর মাধ্যমে তোমাকে দিচ্ছি। তুমি তাদের (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইদের) আশেপাশে কোথাও উপস্থিত ছিলে না যখন তারা নিজেদের করণীয় সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেছিল এবং যখন তারা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল।" (ইউসুফ ঃ ১০২)

অনুরূপভাবে হযরত নূহের বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ ۚ مَاكُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا -

"এ কথাগুলো গায়েবের খবরের অন্তরভুক্ত, যা আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়েছি। তোমার ও তোমার জাতির ইতিপূর্বে এর কোন জ্ঞান ছিল না।"

(হূদ ঃ ৪৯)

এ জিনিসটির বারবার পুনরাবৃত্তি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কিতাব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا۟ لَوْلَآ أُوتِىَ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ مُوسَىٰٓ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا۟ سِحْرَانِ تَظَٰهَرَا وَقَالُوٓا۟ إِنَّا بِكُلٍّ كَٰفِرُونَ ﴿٤٨﴾

(আর এ আমি এজন্য করেছি যাতে) এমনটি যেন না হয় যে, তাদের নিজেদের কৃতকর্মের বদৌলতে কোন বিপদ তাদের ওপর এসে যায়, আর তারা বলে, "হে আমাদের রব! তুমি কেন আমাদের কাছে কোন রসূল পাঠাওনি? তাহলে তো আমরা তোমার আয়াত মেনে চলতাম এবং ঈমানদারদের অন্তরভুক্ত হতাম।[৬৬]

কিন্তু যখন আমার কাছ থেকে সত্য তাদের কাছে পৌঁছে গেলো তখন তারা বলতে লাগলো, মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল কেন তাকে সে সব দেয়া হলো না?[৬৭] *এর আগে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি?*[৬৮] *তারা বললো, "দু'টোই যাদু,*[৬৯] *যা একে অন্যকে সাহায্য করে।" আর বললো, "আমরা কোনটাই মানি না।"*

যে, আল্লাহর রসূল তার একটি প্রধান যুক্তি এই ছিল যে, শত শত হাজার হাজার বছর আগে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা আসছে একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ থেকে। অহী ছাড়া সেগুলো জানার কোন উপায় তাঁর করায়ত্ব নেই। যেসব গুরুত্বপূর্ণ কারণের ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন লোকেরা বিশ্বাস করতে চলেছিল যে, যথার্থই তিনি আল্লাহর নবী এবং তাঁর কাছে আল্লাহর অহী আসে এ জিনিসটি ছিল তার অন্যতম। এখন যে কোন ব্যক্তি নিজেই ধারণা করতে পারে, ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীদের জন্য সে যুগে এ চ্যালেঞ্জের প্রতিবাদ করা কতটা গুরুত্বহ হয়ে থাকতে পারে এবং তারা এর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য কিভাবে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া এটাও অনুমান করা যেতে পারে যে, যদি এ চ্যালেঞ্জের মধ্যে সামান্যতমও কোন দুর্বলতা থাকতো তাহলে তাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ–প্রমাণ সংগ্রহ করা সমকালীন লোকদের জন্য কঠিন হতো না।

৬৫. আরবে হযরত ইসমাঈল ও হযরত শো'আইব আলাইহিমাস সালাম ছাড়া আর কোন নবী আসেননি। প্রায় দু'হাজার বছরের এ সুদীর্ঘ সময়ে বাইরের নবীদের দাওয়াত অবশ্যই সেখানে পৌঁছেছে। যেমন হযরত মূসা, হযরত সুলাইমান ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালামের দাওয়াত। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোন নবীর আবির্ভাব সেখানে ঘটেনি।

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَٰبٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٠﴾

(হে নবী?) তাদেরকে বলো, "বেশ, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে আনো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কিতাব, যা এ দু'টির চাইতে বেশী হিদায়াতদানকারী হবে; আমি তারই অনুসরণ করবো।[৭০] *এখন যদি তারা তোমার এ দাবী পূর্ণ না করে, তাহলে জেনে রাখো, তারা আসলে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হিদায়াত ছাড়াই নিছক নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হবে? আল্লাহ এ ধরনের জালেমদেরকে কখনো হিদায়াত দান করেন না।*

৬৬. এ জিনিসটিকেই কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে রসূল পাঠাবার কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছে। কিন্তু এ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছানো সঠিক হবে না যে, এ উদ্দেশ্যে সব সময় প্রত্যেক জায়গায় একজন রসূল আসা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ায় একজন রসূলের পয়গাম তার সঠিক আকৃতিতে বিদ্যমান থাকে এবং লোকদের কাছে তা পৌছে যাবার মাধ্যমও অপরিবর্তিত থাকে ততক্ষণ কোন নতুন রসূলের প্রয়োজন হয় না। তবে যদি আগের নবীর আনীত শরীয়াতের মধ্যে কোন কিছু বৃদ্ধি করার এবং কোন নতুন বিধান দেবার প্রয়োজন হয় তাহলে নতুন রসূল আসেন। অবশ্যই যখন নবীদের পয়গাম বিলুপ্ত হয়ে যায় অথবা গোমরাহীর মধ্যে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যায় যে, তা থেকে হিদায়াত লাভের কোন উপায় থাকে না। তখন লোকদের জন্য এ ওজর পেশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আমাদের হক ও বাতিলের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন করার ও সঠিক পথ দেখাবার কোন ব্যবস্থাই আদতে ছিল না, এ অবস্থায় আমরা কেমন করে হিদায়াত লাভ করতে পারতাম! এ অজুহাত দেখানোর পথ বন্ধ করার জন্য মহান আল্লাহ এ ধরনের অবস্থায় নবী পাঠান, যাতে এর পর যে ব্যক্তিই ভুল পথে চলবে তাকে সে জন্য দায়ী করা সম্ভব না হয়।

৬৭. অর্থাৎ হযরত মূসাকে (আ) যেসব মু'জিযা দেয়া হয়েছিল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সে সবগুলো দেয়া হলো না কেন? ইনিও লাঠিকে সাপ বানিয়ে আমাদের দেখাতেন। এঁর হাতও বগল থেকে বের করার পর সূর্যের মতো উজ্জ্বল্য বিকীরণ করতো। এঁর ইশারায়ও অস্বীকারকারীদের ওপর একের পর এক তুফান এবং আকাশ ও পৃথিবীর বালা-মুসীবত নাযিল হতো। ইনিও পাথরের গায়ে লিখিত বিধান এনে আমাদের দিতেন।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

৬ রুকূ'

আর আমি তো অনবরত তাদের কাছে (উপদেশ বাণী) পৌছিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা গাফলতি থেকে সজাগ হয়ে যায়।[৭১]

যাদেরকে আমি এর আগে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এর (কুরআন) প্রতি ঈমান আনে।[৭২] আর যখন তাদেরকে এটা শুনানো হয়, তারা বলে, "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এটি যথার্থই সত্য আমাদের রবের পক্ষ থেকে, আমরা তো আগে থেকেই মুসলিম।"[৭৩]

৬৮. এ হচ্ছে তাদের অভিযোগের জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, এসব মু'জিযা সত্ত্বেও তোমরা কি মূসার (আ) প্রতি ঈমান এনেছিলে? তাহলে আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সেগুলোর দাবী করছো কেন? তোমরা নিজেরাই বলছো, মূসাকে এসব মু'জিযা দেয়া হয়েছিল কিন্তু তার পরও তোমরা তাঁকে নবী বলে মেনে নিয়ে কোনদিন তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করোনি। সূরা সাবার ৩১ আয়াতেও মক্কার কাফেরদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ "আমরা এই কুরআনও মানবো না, এর আগের কিতাবগুলোকেও মানবো না।"

৬৯. অর্থাৎ কুরআন ও তাওরাত।

৭০. অর্থাৎ আমাকে তো হিদায়াতের অনুসরণ করতে হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, তা কারো মনগড়া হলে হবে না। বরং হতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকৃত ও যথার্থ হিদায়াত। যদি তোমাদের কাছে এমন কোন কিতাব থাকে যা কুরআন ও তাওরাতের চাইতে ভালো পথ নির্দেশনা দিতে পারে তাহলে তোমরা তাকে লুকিয়ে রেখেছো কেন? তাকে সবার সামনে নিয়ে এসো। আমি বিনা দ্বিধায় তার বিধান মেনে চলবো।

৭১. অর্থাৎ উপদেশের ব্যাপারে আমি কোন কসুর করিনি। এ কুরআনে আমি অনবরত উপদেশ বিতরণ করে এসেছি। কিন্তু যে জিদ ও একগুঁয়েমী পরিহার করে হৃদয়কে বিদ্বেষমুক্ত রেখে সত্যকে সোজাসুজি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় সে-ই একমাত্র হিদায়াত লাভ করতে পারে।

৭২. এর অর্থ এটা নয় যে, সমস্ত আহ্‌লি কিতাব (ইহুদী ও ঈসায়ী) এর প্রতি ঈমান আনে। বরং এ সূরা নাযিল হবার সময় যে ঘটনা ঘটেছিল এখানে আসলে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মক্কাবাসীদেরকে এই মর্মে লজ্জা দেয়াই উদ্দেশ্য যে, তোমাদের

নিজেদের গৃহে যে নিয়ামত এসেছে তাকে তোমরা প্রত্যাখ্যান করছো। অথচ দূর দেশ থেকে লোকেরা এর খবর শুনে আসছে এবং এর মূল্য অনুধাবন করে এ থেকে লাভবান হচ্ছে।

ইবনে হিশাম ও বাইহাকী এবং অন্যরা এ ঘটনাকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ আবিসিনিয়ায় হিজরাতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তি এবং তার দাওয়াতের খবর যখন সেই দেশে ছড়িয়ে পড়লো তখন সেখান থেকে প্রায় ২০ জনের একটি খৃষ্টান প্রতিনিধি দল প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য মক্কা মু'আযৃযমায় এলো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে হারামে সাক্ষাত করলো। কুরাইশদের বহু লোকও এ ব্যাপার দেখে আশপাশে দাঁড়িয়ে গেলো। প্রতিনিধি দলের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু প্রশ্ন করলেন। তিনি সেগুলোর জবাব দিলেন। তারপর তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআন মজীদের আয়াত তাদের সামনে পাঠ করলেন। কুরআন শুনে তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। তারা একে আল্লাহর বাণী বলে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করলেন এবং নবীর (সা) প্রতি ঈমান আনলেন। মজলিস শেষ হবার পর আবু জেহেল ও তার কয়েকজন সাথী প্রতিনিধিদলের লোকদেরকে পথে ধরলো এবং তাদেরকে যাচ্ছে তাই বলে তিরস্কার করলো। তাদেরকে বললো, "তোমাদের সফরটাতো বৃথাই হলো। তোমাদের স্বধর্মীয়রা তোমাদেরকে এজন্য পাঠিয়েছিল যে, এ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে তোমরা যথাযথ অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকৃত ও যথার্থ ঘটনা তাদেরকে জানাবে। কিন্তু তোমরা সবেমাত্র তার কাছে বসেছিলে আর এরি মধ্যেই নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে তার প্রতি ঈমান আনলে? তোমাদের চেয়ে বেশী নির্বোধ কখনো আমরা দেখিনি।" একথায় তারা জবাব দিল, "ভাইয়েরা, তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা তোমাদের সাথে জাহেলী বিতর্ক করতে চাই না। আমাদের পথে আমাদের চলতে দাও এবং তোমরা তোমাদের পথে চলতে থাকো। আমরা জেনেবুঝে কল্যাণ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করতে পারি না।" (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা এবং আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৩ খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা শু'আরা, ১২৩ টীকা)

৭৩. অর্থাৎ এর আগেও আমরা নবীদের ও আসমানী কিতাবের আনুগত্য করে এসেছি। তাই ইসলাম ছাড়া আমাদের অন্য কোন দীন ছিল না। এখন যে নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এনেছেন তাকেও আমরা মেনে নিয়েছি। কাজেই মূলত আমাদের দীনের কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং আগেও যেমন আমরা মুসলমান ছিলাম তেমনি এখনও মুসলমান আছি।

একথা থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন কেবলমাত্র তার নামই ইসলাম নয় এবং "মুসলিম" পরিভাষাটি শুধুমাত্র নবী করীমের (সা) অনুসারীগণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সব সময় এ ইসলামই ছিল সকল নবীর দীন এবং সব জামানায় তাঁদের সবার অনুসারীগণ মুসলমানই ছিলেন। এ মুসলমানরা যদি কখনো পরবর্তীকালে আগত কোন সত্য নবীকে মানতে অস্বীকার করে থাকে তাহলে কেবল তখনই তারা কাফের হয়ে গিয়ে থাকবে।

কিন্তু যারা পূর্বের নবীকে মানতো এবং পরে আগত নবীকেও মেনে নিয়েছে তাদের ইসলামে কোন ছেদ পড়েনি। তারা পূর্বেও যেমন মুসলমান ছিল, পরেও তেমনি থেকেছে।

আশ্চর্যের কথা, বড় বড় জ্ঞানীগুণী ও আলেমদের মধ্যেও কেউ কেউ এ সত্যটি অনুধাবন করতে অক্ষম হয়েছেন। এমনকি এ সুস্পষ্ট আয়াতটি দেখেও তাঁরা নিশ্চিন্ত হননি। আল্লামা সুয়ূতী "মুসলিম" পরিভাষাটি কেবলমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের সাথেই বিশেষভাবে জড়িত এ মর্মে বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত একটি বই লিখেছেন। তারপর যখন এ আয়াতটি সামনে এসেছে তখন নিজেই বলেছেন, এখন তো আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। কিন্তু এরপর বলছেন, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম এ মর্মে যে, এ ব্যাপারে আমার হৃদয় প্রসারিত করে দাও। শেষে নিজের অভিমত প্রত্যাহার করার পরিবর্তে তিনি তারই ওপর জোর দিয়েছেন এবং এ আয়াতটির কয়েকটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। এ ব্যাখ্যাগুলোর একটি অন্যটির চেয়ে বেশী ওজনহীন। যেমন তাঁর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে ঃ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমরা কুরআন আসার আগেই মুসলিম হয়ে যাবার সংকল্প পোষণ করতাম। কারণ আমাদের কিতাবসমূহ থেকে আমরা এর আসার খবর পেয়ে গিয়েছিলাম এবং আমাদের সংকল্প ছিল, তিনি আসলেই আমরা ইসলাম গ্রহণ করে নেবো। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে, এ বাক্যাংশে مُسْلِمِيْنَ শব্দের পরে بِهٖ শব্দ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ আগে থেকেই আমরা কুরআন মানতাম। কারণ আমরা তাঁর আগমনের আশা পোষণ করতাম এবং পূর্বাহ্নেই তাঁর প্রতি ঈমান এনে বসেছিলাম। তাই তাওরাত ও ইন্‌জিল মানার ভিত্তিতে নয় বরং কুরআনকে তার নাযিল হবার পূর্বে যথার্থ সত্য বলে মেনে নেবার জন্যই আমরা মুসলিম ছিলাম। তৃতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে ঃ আল্লাহর তাকদীরে পূর্বেই আমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের আগমনে আমরা ইসলাম গ্রহণ করে নেবো। তাই আসলে আমরা আগে থেকেই মুসলিম ছিলাম। এই ব্যাখ্যাগুলোর মধ্য থেকে কোনটি দেখেও আল্লাহ প্রদত্ত হৃদয়ের প্রশস্ততার কোন প্রভাব সেখানে আছে বলে মনে হচ্ছে না।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, কুরআন কেবলমাত্র এই একটি স্থানেই নয় বরং অসংখ্য জায়গায় এ সত্যটি বর্ণনা করেছে। কুরআন বলছে, আসল দীন হচ্ছে একমাত্র "ইসলাম" (আল্লাহর আনুগত্য) এবং আল্লাহর বিশ্ব-জাহানে আল্লাহর সৃষ্টির জন্য এছাড়া দ্বিতীয় কোন দীন ও ধর্ম হতে পারে না। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে যে নবীই মানুষকে পথ নির্দেশ দেবার জন্য এসেছেন তিনি এ দীন নিয়েই এসেছেন। আর নবীগণ হামেশাই নিজেরা মুসলিম থেকেছেন, নিজেদের অনুসারীদেরকে মুসলিম হয়ে থাকার তাকিদ করেছেন এবং তাঁদের যেসব অনুসারী নবুওয়াতের মাধ্যমে আগত আল্লাহর ফরমানের সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছেন তারাও প্রতি যুগে মুসলিমই ছিলেন। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুধুমাত্র গুটিকয় আয়াত পেশ করছি ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

"আসলে আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র দীন।" (আলে ইমরান ঃ ১৯)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ –

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অবলম্বন করে তা কখনো গৃহীত হবে না।" (আলে ইমরান ঃ ৮৫)

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বলেন ঃ

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

"আমার প্রতিদান দেবার দায়িত্ব তো আল্লাহর এবং আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে আমি যেন মুসলিমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাই।" (ইউনুস ঃ ৭২)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সন্তানদের সম্পর্কে বলা হয় ঃ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَٰلَمِينَ ○ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ۚ يَٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ۖ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۚ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ -

"যখন তার রব তাকে বললেন, মুসলিম (ফরমানের অনুগত) হয়ে যাও, সে বললো আমি মুসলিম হয়ে গেলাম রব্বুল আলামীনের জন্য। আর এ জিনিসটিরই অসিয়াত করে ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকুবও ঃ হে আমার সন্তানরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দীনটিই পছন্দ করেছেন। কাজেই মুসলিম না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না। তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকূবের মৃত্যুর সময় এসে গিয়েছিল, যখন সে তার পুত্রদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার বন্দেগী করবে? তারা জবাব দিয়েছিল আমরা বন্দেগী করবো আপনার মাবুদের এবং আপনার বাপ–দাদা ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের মাবুদের তাঁকে একক মাবুদ হিসেবে মেনে নিয়ে। আর আমরা তাঁরই অনুগত– মুসলিম।" (আল বাকারাহ ঃ ১৩১–১৩৩)

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ۚ

"ইবরাহীম ইহুদী ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না বরং ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম।" (আলে ইমরান ঃ ৬৭)

হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) নিজেই দোয়া করেন ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ -

"হে আমাদের রব! আমাকে তোমার মুসলিম (অনুগত) করো এবং আমাদের বংশ থেকে একটি উম্মত সৃষ্টি করো যে হবে তোমার মুসলিম।" (আল বাকারাহ ঃ ১২৮)

হযরত লূতের কাহিনীতে বলা হচ্ছে ঃ

فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"আমরা লূতের জাতির জনপদে একটি ঘর ছাড়া মুসলমানদের আর কোন ঘর পাইনি।" (আয্–যারিয়াত ঃ ৩৬)

হযরত ইউসুফ (আ) মহিমান্বিত রবের দরবারে নিবেদন করেন ঃ

تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ –

"আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান করো এবং সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিয়ে দাও।" (ইউসুফ ঃ ১০১)

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর নিজের জাতিকে বলেন ঃ

يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ –

"হে আমার জাতি! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকো, তাহলে তাঁরই ওপর ভরসা করো যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো।" (ইউনুস ঃ ৮৪)

বনী ইসরাঈলের আসল ধর্ম ইহুদীবাদ নয় বরং ইসলাম ছিল। বন্ধু ও শত্রু সবাই একথা জানতো। কাজেই ফেরাউন সাগরে ডুবে যেতে যেতে যে শেষ কথাটি বলে তা হচ্ছে ঃ

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآئِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"আমি মেনে নিলাম বনী ইসরাইল যার প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তরভুক্ত।" (ইউনুস ঃ ৯০)

বনী ইসরাঈলদের সকল নবীর দীনও ছিল এ ইসলাম ঃ

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا ،

"আমি তাওরাত নাযিল করেছি, যাতে ছিল হিদায়াত ও আলো, সে অনুযায়ী সে নবীগণ যারা মুসলিম ছিল তাদের বিষয়াদির ফায়সালা করতো যারা ইহুদী হয়ে গিয়েছিল।" (আল মায়েদাহ ঃ ৪৪)

এটিই ছিল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দীন। সেজন্য সাবার রাণী তাঁর প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে বলছেন ঃ

اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মুসলিম হয়ে গেলাম" (আন্ নাম্ল ঃ ৪৪)

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

তারা এমন লোক যাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক দেয়া হবে[৭৪] এমন অবিচলতার প্রতিদানে যা তারা দেখিয়েছে।[৭৫] তারা ভালো দিয়ে মন্দের মোকাবিলা করেছে[৭৬] এবং আমি তাদেরকে যা কিছু রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[৭৭] আর যখন তারা বাজে কথা শুনেছে,[৭৮] একথা বলে তা থেকে আলাদা হয়ে গেছে যে, "আমাদের কর্মকাণ্ড আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্মকাণ্ড তোমাদের জন্য, তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা মূর্খদের মতো পথ অবলম্বন করতে চাই না।" হে নবী! তুমি যাকে চাও তাকে হিদায়াত দান করতে পারো না কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন এবং যারা হিদায়াত গ্রহণ করে তাদেরকে তিনি খুব ভাল করেই জানেন।[৭৯]

আর এটি-ই ছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর হাওয়ারীদের (সহযোগী) দীন ঃ

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۚ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ -

"আর যখন আমি হওয়ারীদের কাছে অহী পাঠালাম এ মর্মে যে, ঈমান আনো আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি তখন তারা বললো, আমরা ঈমান এনেছি এবং সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম।" (আল মায়েদাহ ঃ ১১১)

যদি সন্দেহ পোষণ করা হয় যে, আরবী ভাষার "ইসলাম" ও "মুসলিম" শব্দ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় কেমন করে ব্যবহৃত হতে পারতো, তাহলে বলতে হয় যে, এটা নিছক একটা অজ্ঞতাপ্রসূত কথা। কারণ এ আরবী শব্দগুলো আসল বিবেচ্য নয়, আরবী ভাষায় এ শব্দগুলো যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেটিই মূল বিবেচ্য বিষয়। আসলে এ আয়াতগুলোতে যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে

প্রকৃত দীনটি এসেছে তা খৃষ্টবাদ, মূসাবাদ বা মুহাম্মাদবাদ নয় বরং তা হচ্ছে নবীগণ ও আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে আগত আল্লাহর ফরমানের সামনে আনুগত্যের শির নত করে দেয়া এবং এ নীতি আল্লাহর যে বান্দা যেখানেই যে যুগেই অবলম্বন করেছে সে হয়েছে একই বিশ্বজনীন, আদি ও চিরন্তন সত্যদীনের অনুসারী। যারা এ দীনকে যথার্থ সচেতনতা ও আন্তরিকতা সহকারে গ্রহণ করেছে তাদের জন্য মূসার পরে ঈসাকে এবং ঈসার পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে নেয়া ধর্ম পরিবর্তন করা হবে না বরং হবে প্রকৃত ও আসল ধর্মের অনুসরণ করার স্বাভাবিক ও ন্যায়সংগত দাবী। পক্ষান্তরে যারা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের উম্মতের মধ্যে না জেনে বুঝে ঢুকে পড়েছে অথবা তাঁদের দলে জন্ম নিয়েছে এবং জাতীয় ও বংশীয় স্বার্থপ্রীতি যাদের জন্য আসল ধর্মে পরিণত হয়ে গেছে তারা ইহুদী ও খৃষ্টান হয়ে রয়ে গেছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনে তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে গেছে। কারণ তারা আল্লাহর শেষ নবীকে অস্বীকার করেছে। আর এটা করে তারা শুধু যে নিজেদের ভবিষ্যতে মুসলিম হয়ে থাকাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাই নয় বরং নিজেদের এ কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা আসলে ইতিপূর্বেও "মুসলিম" ছিল না নিছক একজন নবীর বা কয়েকজন নবীর ব্যক্তিত্বের ভক্ত ও অনুরক্ত ছিল। অথবা পিতা–প্রপিতার অন্ধ অনুকরণকে ধর্মীয় আচারে পরিণত করে রেখেছিল।

৭৪. অর্থাৎ একটি পারিশ্রমিক দেয়া হবে সাইয়েদিনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি ইতিপূর্বে যে ঈমান রাখতো সেজন্য এবং দ্বিতীয় পারিশ্রমিকটি দেয়া হবে এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার জন্য। একথাটিই একটি হাদীসে ব্যক্ত করা হয়েছে। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

ثلثه لهم اجران ، رجل من اهل الكتاب امن بنبيه و امن بمحمد.....

"তিন ব্যক্তি দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। তাদের একজন হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে আহ্‌লি কিতাবের আন্তরভুক্ত ছিল এবং নিজের নবীর প্রতি ঈমান রাখতো, তারপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিও ঈমান আনে।"

৭৫. অর্থাৎ তাদের এ দ্বিগুণ প্রতিদান লাভ করার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা জাতীয়, বংশীয়, দলীয় ও স্বদেশের স্বার্থপ্রীতি মুক্ত থেকে সত্য দীনের ওপর অবিচল ছিল এবং নতুন নবীর আগমনে যে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাতে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, আসলে তারা ঈসা পূজারী নয় বরং আল্লাহ পূজারী ছিল। তারা ব্যক্তি ঈসার ভক্ত–অনুরক্ত ছিল না বরং ছিল "ইসলামের" আনুগত্যকারী। একারণে ঈসার পর যখন অন্য নবী ঈসার মত সেই একই ইসলাম নিয়ে এলেন তখন তারা দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর নেতৃত্বে ইসলামের পথ অবলম্বন করলো এবং যারা খৃষ্টবাদের ওপর অবিচল ছিল তাদের পথ পরিহার করলো।

৭৬. অর্থাৎ তারা মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে নয় বরং ভালো দিয়ে দেয়। মিথ্যার মোকাবিলায় মিথ্যা নয় বরং সত্য নিয়ে আসে। জুলুমকে জুলুম দিয়ে নয় বরং ইনসাফ দিয়ে প্রতিরোধ করে। দুষ্টামির মুখোমুখি দুষ্টামির সাহায্যে নয় বরং ভদ্রতার সাহায্যে হয়।

৭৭. অর্থাৎ তারা সত্যের পথে সম্পদ উৎসর্গও করে। সম্ভবত এখানে এদিকেও ইংগিত করা হয়েছে যে, তারা নিছক সত্যের সন্ধানে হাবৃশা থেকে সফর করে মক্কায় এসেছিল। এ পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের পেছনে তাদের কোন বৈষয়িক লাভের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা যখন শুনলো মক্কায় এক ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করেছেন তখন তারা নিজেরা সশরীরে এসে অনুসন্ধান চালানো জরুরী মনে করলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে অনুসন্ধানের পর যদি প্রমাণিত হয় তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন সত্য নবী, তাহলে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর থেকে পথ-নির্দেশনা লাভ করা থেকে বঞ্চিত থাকবে না।

৭৮. আবু জেহেল ও তার সাথীরা হাবৃশার খৃস্টান প্রতিনিধিদলের সাথে যেসব আজে বাজে কথা বলেছিল সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। উপরে ৭২ টীকায় এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

৭৯. আলোচনার প্রেক্ষাপট থেকে একথা প্রকাশিত হয় যে, হাবৃশার খৃস্টানদের ঈমান ও ইসলামের কথা উল্লেখ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল আসলে মক্কার কাফেরদেরকে লজ্জা দেয়া। বক্তব্য ছিল ঃ অভাগার দল! তোমরা নিজেদের কপাল কিভাবে পুড়াচ্ছ তা ভেবে দেখো। অন্যেরা কোথায় কোন্ দূরদেশ থেকে এসে এ নিয়ামতের কল্যাণ লাভে ধন্য হচ্ছে আর তোমরা তোমাদের নিজেদের গৃহ অভ্যন্তরে এই যে কল্যাণের স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে এ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছো। কিন্তু কথাটা এভাবে বলা হয়েছে ঃ হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তুমি চাচ্ছো তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, তোমার ভাই-বন্ধু, বান্ধবরা, তোমার আত্মীয়-স্বজনরা এই আবেহায়াতের সঞ্জীবনী ধারায় লাভবান হোক কিন্তু তুমি চাইলে কি হবে, হিদায়াত তো আল্লাহর হাতে, যেসব লোকের মধ্যে তিনি এ হিদায়াত গ্রহণ করার আগ্রহ দেখতে পান তাদেরকেই এ কল্যাণ ধারায় অবগাহন করান। তোমার আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে যদি এই আগ্রহ না দেখা যায় তাহলে এ কল্যাণ তাদের ভাগ্যে কেমন করে জুটতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা অনুসারে এ আয়াতটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালেবের প্রসংগে নাযিল হয়। তাঁর শেষ সময় উপস্থিত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সামর্থ মোতাবেক কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর প্রতি তাঁর ঈমান আনাবার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা চালান। তিনি চাচ্ছিলেন তাঁর চাচা ঈমানের মধ্য দিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করুন। কিন্তু চাচা তা গ্রহণ না করে আবদুল মুত্তালিবের অনুসৃত ধর্মের মধ্যে অবস্থান করে জীবন দেয়াকে অগ্রাধিকার দেন। এ ঘটনায় আল্লাহ বলেন, انك لا تهدى من احببت "তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে হিদায়াত করতে পারো না।" কিন্তু মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণের পরিচিত পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, একটি আয়াত নবীর জামানায় যে বিশেষ ঘটনা বা ব্যাপারের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় তাকে তাঁরা আয়াতটির শানে নুযুল বা নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ও কার্যকারণ হিসেবে বর্ণনা করেন। তাই এ হাদীসটি এবং এ বিষয়বস্তু সম্বলিত তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ ইত্যাদিতে আবু হুরাইরাহ (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ইবনে উমর (রা), প্রমুখ সাহাবীগণ বর্ণিত অন্যান্য হাদীসগুলো থেকে অনিবার্যভাবে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না যে, সূরা আল

وَقَالُوٓا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُجْبٰٓى إِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِينَ ﴿٥٨﴾

তারা বলে, "যদি আমরা তোমার সাথে এ হেদায়াতের অনুসরণ করি তাহলে নিজেদের দেশ থেকে আমাদেরকে উৎখাত করে দেয়া হবে।[৮০]

এটা কি সত্য নয়, একটি নিরাপদ হারমকে আমি তাদের জন্য অবস্থান স্থলে পরিণত করেছি, যেদিকে সব ধরনের ফলমূল চলে আসে আমার পক্ষ থেকে রিযিক হিসেবে? কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।[৮১]

আর এমন কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি যেখানকার লোকেরা তাদের সম্পদ–সম্পত্তির দম্ভ করতো। কাজেই দেখে নাও, ঐসব তাদের ঘরবাড়ি পড়ে আছে, যেগুলোর মধ্যে তাদের পরে কদাচিত কেউ বসবাস করেছে, শেষ পর্যন্ত আমিই হয়েছি উত্তরাধিকারী।[৮২]

কাসাসের এ আয়াতটি আবু তালেবের ইন্তেকালের সময় নাযিল হয়েছিল। বরং এ থেকে শুধুমাত্র এতটুকু জানা যায় যে, এ আয়াতের বিষয়বস্তুর সত্যতা ও বাস্তবতা এ ঘটনার সময়ই সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত হয়। যদিও আল্লাহর প্রত্যেকটি বান্দাকে সঠিক পথে নিয়ে আসা ছিল নবী করীমের (সা) আন্তরিক ইচ্ছা, তথাপি কোন ব্যক্তির কুফরীর উপর মৃত্যু বরণ করা যদি তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী কষ্টকর হতো এবং ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও সম্পর্কের ভিত্তিতে যদি কোন ব্যক্তির হিদায়াত লাভ করার তিনি সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ও আকাংখা পোষণ করতেন তাহলে তিনি ছিলেন আবু তালেব। কিন্তু তাঁকেই হিদায়াত দান করার শক্তি যখন তিনি লাভ করলেন না তখন একথা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, কাউকে হিদায়াত দান করা এবং কাউকে তা থেকে বঞ্চিত করা নবীর কাজ নয়। এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। আর আল্লাহর কাছ থেকে এ সম্পদটি কোন আত্মীয়তা ও পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নয় বরং মানুষের সত্যানুরাগ, সত্যপ্রীতি ও সত্যাগ্রহী মানসিকতার ভিত্তিতেই দান করা হয়।

৮০. কুরাইশ বংশীয় কাফেররা ইসলাম গ্রহণ না করার ওজুহাত হিসেবে একথাটি বলতো। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে জানা যাবে, এটিই ছিল তাদের কুফরীর সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কারণ। একথাটি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে আমাদের দেখতে হবে ঐতিহাসিকভাবে সেসময় কুরাইশদের কি মর্যাদা ছিল, যার ওপর আঘাত আসার আশংকা ছিল।

গুরুতে আরবে যে জিনিসটির জন্য কুরাইশ গোষ্ঠী গুরুত্ব লাভ করে, সেটি হচ্ছে তাদের হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর হওয়ার বিষয়টি আরবীয় বংশধারার দিক দিয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ছিল। এ কারণে তাদের বংশটি ছিল আরবদের দৃষ্টিতে পীরজাদার বংশ। তারপর যখন কুসাই ইবনে কিলাবের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার কারণে তারা কাবা গৃহের মুতাওয়াল্লী ও পরিচালকে পরিণত হলো এবং মক্কায় তাদের আবাস গড়ে উঠলো তখন তাদের গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশী বেড়ে গেলো। কারণ এখন তারা ছিল আরবের সবচেয়ে বড় তীর্থ স্থানের পরিচালক। আরবের সকল গোত্রের মধ্যে তারা ধর্মীয় পুরোহিতের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর হজ্জের কারণে আরবের এমন কোন গোত্র ছিল না যারা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতো না। এ কেন্দ্রীয় মর্যাদাকে পুঁজি করে কুরাইশরা ক্রমান্বয়ে ব্যবসায়িক উন্নতি লাভ করতে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে রোম ও ইরানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব তাদেরকে আন্তরজাতিক বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দান করে। সেসময় রোম, গ্রীস, মিসর ও সিরিয়ার যত প্রকার বাণিজ্য চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার সাথে চলতো তার সমস্ত পথই ইরান বন্ধ করে দিয়েছিল। লোহিত সাগরের পথটিই ছিল সর্বশেষ পথ। একমাত্র এ পথটিই খোলা ছিল। পরে ইরান যখন ইয়ামন দখল করে নিল, তখন সে এ পথটিও বন্ধ করে দিল। এখন আরব বণিকরা একদিকে রোম অধিকৃত এলাকার পণ্য সম্ভার আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরের বন্দরসমূহে পৌছিয়ে দিতে লাগলো এবং অন্যদিকে একই বন্দরসমূহ থেকে পূর্বদেশীয় বাণিজ্যপণ্য নিয়ে রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পৌছাতে থাকলো। এছাড়া এ বাণিজ্যটি চালু রাখার আর কোন পথ খোলা ছিল না। এ অবস্থার ফলে মক্কা আন্তরজাতিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হলো। এ সময় কুরাইশরাই বলতে গেলে এ ব্যবসায়ের ইজারাদারী লাভ করে বসেছিল। কিন্তু যেসব উপজাতীয় এলাকার মধ্য দিয়ে এ বাণিজ্য পথগুলো গিয়েছিল তাদের সাথে আরবদের গভীর বন্ধুত্ব সম্পর্ক ছাড়া আরবের রাজনৈতিক অরাজকতার পরিবেশে এ ব্যবসায়িক আদান প্রদান সম্ভবপর ছিল না। এ উদ্দেশ্যে কুরাইশ সরদাররা শুধুমাত্র নিজেদের ধর্মীয় প্রভাবের ওপর নির্ভর করতে পারতো না। এজন্য তারা সকল উপজাতির সাথে সন্ধিচুক্তি সাক্ষর করে রেখেছিল। ব্যবসায়িক মুনাফায়ও তাদেরকে অংশীদার করতো। উপজাতীয় শেখ ও প্রভাবশালী সদারদেরকে মূল্যবান তোহ্ফা দিয়েও তুষ্ট করতো। এই সংগে পাতা ছিল সূদী ব্যবসায়ের জাল। এতে জড়িয়ে পড়েছিল প্রায় সকল প্রতিবেশী উপজাতীয় ব্যবসায়ী ও সরদারবৃন্দ।

এ অবস্থায় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াত সম্প্রসারিত হতে লাগলো তখন বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি অন্ধপ্রীতির চাইতে বড় হয়ে যে জিনিসটি কুরাইশদেরকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠার কারণ হয়ে দেখা দিল সেটি ছিল এই যে, এ দাওয়াতের ফলে তারা নিজেদের স্বার্থহানির আশংকা করছিল। তারা মনে করছিল, যুক্তিপূর্ণ দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে শিরক ও মূর্তিপূজা মিথ্যা এবং তাওহীদ সঠিক প্রমাণিত হয়ে গেলেও তো তাকে পরিত্যাগ করে একে গ্রহণ করে নেয়া আমাদের জন্য ধ্বংসকর হবে। এমনটি করার সাথে সাথেই সমগ্র আরবের অধিবাসীরা আমাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে

ফেটে পড়বে। কাবাগৃহের পরিচালনার দায়িত্ব থেকে আমাদের সরিয়ে দেবে। সন্ধি চুক্তির ফলে মূর্তিপূজক উপজাতিগুলোর সাথে আমাদের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যার ভিত্তিতে আমাদের বাণিজ্য কাফেলা দিনরাত আরবের বিভিন্ন অংশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা সবই ছিন্ন হয়ে যাবে। এভাবে এ দীনটি আমাদের ধর্মীয় প্রভাব–প্রতিপত্তি এবং এই সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিরও অবসান ঘটাবে। বরং বিচিত্র নয় যে, আরবের সমস্ত উপজাতি মিলে আমাদের মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করবে।

এখানে এসে দুনিয়া পূজারীদের প্রজ্ঞা ও অন্তরদৃষ্টির অভাবের এক বিস্ময়কর চিত্র মানুষের সামনে ফুটে ওঠে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার তাদেরকে এ নিশ্চয়তা দান করছিলেন যে, তোমাদের সামনে আমি যে কালেমা পেশ করছি তা মেনে নাও, আরব ও আজম তোমাদের পদানত হয়ে যাবে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সা'দ, ভূমিকা ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি) কিন্তু তারা এর মধ্যে নিজেদের মৃত্যু দেখছিল। তারা মনে করছিল, আমরা আজ যে সম্পদ ও প্রভাব–প্রতিপত্তি লাভ করেছি এও খতম হয়ে যাবে। তারা আশংকা করছিল, এ কালেমা গ্রহণ করার সাথে সাথেই আমরা এ সরযমীনে এমনই বন্ধু–বান্ধব ও সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়বো যে, চিল–কাকেরা আমাদের গায়ের গোশ্‌ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে তারা এ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল না যে, মাত্র কয়েক বছর পরেই সমগ্র আরব ভূখণ্ড মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতাভুক্ত হতে যাচ্ছিল। তারপর এ একই প্রজন্মের জীবনকালেই ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিসর সব দেশই এক এক করে এ রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতাধীন হতে চলছিল। আর এ উক্তির পরে এক শতক অতিক্রান্ত হবার আগেই কুরাইশ বংশীয় খলিফাগণই সিন্ধু থেকে স্পেন এবং কাফ্‌কাজ থেকে ইয়ামনের উপকূলীয় এলাকা পর্যন্ত দুনিয়ার একটি বৃহত্তম অংশের শাসন পরিচালনা করতে যাচ্ছিল।

৮১. এটি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের আপত্তির প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, যে হারমের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং কেন্দ্রীয় গুরুত্বের বদৌলতে আজ তোমরা এমন যোগ্যতার অধিকারী হয়েছো, যার ফলে সারা দুনিয়ার বাণিজ্যপণ্যের স্রোত এহেন অনুর্বর ধূলিবিবর্ণ উপত্যকায় চলে আসছে, তার এই নিরাপদ ও কেন্দ্রীয় মর্যাদা কি তোমাদের কোন কৌশল অবলম্বনের ফলে অর্জিত হয়েছে? আড়াই হাজার বছর আগে আল্লাহর এক বান্দা জনশূন্য পাহাড়ের মাঝখানে এ পানি ও বৃক্ষলতাহীন উপত্যকায় তাঁর স্ত্রী ও দুধের বাচ্চাকে নিয়ে এখানে আসেন। তিনি এখানে পাথর ও কাদা দিয়ে একটি কক্ষ নির্মাণ করেন এবং ডাক দিয়ে বলেন, আল্লাহ একে হারমে পরিণত করেছেন, এসো এ ঘরের দিকে এবং একে প্রদক্ষিণ করো। এখন ২৫ শত বছর থেকে এ জায়গাটি আরবের কেন্দ্র হয়ে রয়েছে, মারাত্মক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশে দেশের এ একটিমাত্র স্থানে নিরাপত্তা লাভ করা যায়, আরবের আবালবৃদ্ধবণিতা একে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এবং প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ একে প্রদক্ষিন করার জন্য চলে আসে। এসব আল্লাহ প্রদত্ত বরকত ও সমৃদ্ধি নয়তো আর কি হতে পারে? এ নিয়ামত লাভের ফলেই তো তোমরা আরবের সরদার হয়ে গেছো এবং বিশ্ব বাণিজ্যের একটি বড় অংশ তোমাদের করতলগত হয়েছে। এখন কি তোমরা মনে করো, যে আল্লাহ তোমাদেরকে এ নিয়ামত দান করেছেন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তোমরা সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে আর তাঁর দীনের অনুগত হয়ে চললেই ধ্বংস হয়ে যাবে?

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

আর তোমার রব জনপদগুলো ধ্বংস করেন না যতক্ষণ না তাদের কেন্দ্রে একজন রসূল পাঠান, যে তাদের কাছে আমার আয়াত শুনায়। আর আমি জনপদগুলো ধ্বংস করি না যতক্ষণ না সেগুলোর বাসিন্দারা জালেম হয়ে যায়।[৮৩]

তোমাদের যা কিছুই দেয়া হয়েছে তা নিছক দুনিয়ার জীবনের সাজ-সরঞ্জাম এবং তার সৌন্দর্য-শোভা আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা হচ্ছে তার চেয়ে ভালো এবং অধিকতর স্থায়ী। তোমরা কি বিবেচনা করবে না?

৮২. এটি তাদের আপত্তির দ্বিতীয় জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, যে ধনদৌলত ও সমৃদ্ধির জন্য তোমরা অহংকারী হয়ে উঠেছো এবং যার বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশংকায় বাতিলের উপরে টিকে থাকতে ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছো সেই জিনিসই এক সময় আদ, সামূদ, সাবা, মাদ্‌য়ান ও লূতের জাতির লোকদেরকে দেয়া হয়েছিল। এ জিনিস কি তাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল? মোট কথা জীবন যাপনের উন্নত মানই তো একমাত্র কাম্যবস্তু নয়, যে মানুষ সত্য-মিথ্যার পরোয়া না করে শুধুমাত্র তারই পেছনে পড়ে থাকবে এবং এ সঠিক পথ অবলম্বন করলে এ ইপ্সিত মুক্তোখণ্ডটি হস্তচ্যুত হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে বলেই তা অবলম্বন করতে অস্বীকার করবে। যেসব অসৎ ও ভ্রষ্টতামূলক কাজ অতীতের সমৃদ্ধিশালী জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে তার ওপর টিকে থাকার প্রচেষ্টা চালিয়ে তোমরা রক্ষা পেয়ে যাবে এবং তাদের মতো তোমাদের ওপর কখনো ধ্বংস নেমে আসবে না এর কোন গ্যারান্টি কি তোমাদের কাছে আছে?

৮৩. এটি হচ্ছে তাদের আপত্তির তৃতীয় জবাব। পূর্বে যেসব জাতি ধ্বংস হয়েছিল তাদের লোকেরা জালেম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করার পূর্বে নিজের রসূল পাঠিয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। রসূলদের সতর্ক করে দেবার পরও যখন তারা বাঁকা পথে চলা থেকে বিরত হয়নি তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তোমরা এখন এ একই অবস্থায় পতিত হয়েছো। তোমরাও জালেম হয়ে গেছো। একজন রসূল তোমাদেরকেও সতর্ক করার জন্য এসেছেন। এখন তোমরা কুফরী ও অস্বীকারের নীতি অবলম্বন করে নিজেদের আয়েশ-আরাম ও সমৃদ্ধিকে রক্ষা করতে পারবে না বরং উল্টা বিপদের মুখে ঠেলে দেবে। যে ধ্বংসের আশংকা তোমরা করছো তা ঈমান আনার জন্য নয় বরং অস্বীকার করার কারণে তোমাদের ওপর আপতিত হবে।

أَفَمَنْ وَعَدْنَٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَٰهُ مَتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

৭ রুকূ'

আচ্ছা, যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং সে তা পেতে যাচ্ছে, সে ব্যক্তি কি কখনো এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যাকে আমি কেবলমাত্র দুনিয়ার জীবনের সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছি এবং তারপর কিয়ামতের দিনের শাস্তির জন্য তাকে হাজির করা হবে?[৮৪]

আর (তারা যেন ভুলে না যায়) সে দিনটি যখন তিনি তাদেরকে ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, "কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা আমার শরীক বলে মনে করতে?"[৮৫]

৮৪. এটা হচ্ছে তাদের আপত্তির চতুর্থ জবাব। এর জবাবটি বুঝতে হলে প্রথমে দু'টি কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে ঃ

এক ঃ দুনিয়ার বর্তমান জীবন। এর সময়কাল কারো জন্যই কতকগুলো বছরের বেশী হয় না। এটি নিছক একটি সফরের সাময়িক পর্যায় মাত্র। আসল জীবনটি হবে চিরস্থায়ী। সেটি সামনের দিকে আসছে। বর্তমান সাময়িক জীবনে মানুষ যতই সহায়-সম্পদ জমা করুক না কেন এবং কয়েক বছরের এ জীবনে যতই আয়েশ আরাম করুক, এ জীবন একদিন শেষ হয়ে যাবেই এবং এখানকার সমস্ত বিত্ত-বৈভব সবকিছুই এখানে রেখেই তাকে চলে যেতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত জীবনকালের আয়েশ আরামের বিনিময়ে যদি মানুষকে আগামীর অন্তহীন জীবনে চিরকালীন দুরবস্থা ও বিপদের মধ্যে কাটাতে হয়, তাহলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ ক্ষতির সওদা করতে পারে না। এর মোকাবিলায় একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এখানে কয়েক বছর বিপদ আপদের মধ্যে জীবন কাটিয়ে দেয়াকে প্রাধান্য দেবে। সে এর মাধ্যমে এমন সব কল্যাণ ও নেকী উপার্জন করতে চাইল, যা পরবর্তী অন্তহীন জীবনে তার চিরকালীন আয়েশ আরামের কারণ হবে।

দুই ঃ আল্লাহর দীন মানুষের কাছে দাবী করে না যে, সে এ দুনিয়ার জীবনোপকরণ থেকে লাভবান হতে পারবে না এবং এখানকার রূপ সৌন্দর্য অযথা পদদলিত করে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। তার দাবী শুধু এতটুকু যে, এ দুনিয়ার জীবনের ওপর তাকে আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং আখেরাত চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ভোগ-তৃপ্তি নিম্ন পর্যায়ের। পক্ষান্তরে আখেরাতের ভোগ-তৃপ্তি উচ্চ ও উন্নত পর্যায়ের। তাই মানুষকে দুনিয়ার এমন সম্পদ ও সৌন্দর্য করায়ত্ত করতে হবে যা আখেরাতের চিরন্তন জীবনে তাকে সফলকাম করবে অথবা কমপক্ষে সেখানকার চিরন্তন ক্ষতির সাগরে তাকে

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ۚ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾

এ উক্তি যাদের ওপর প্রযোজ্য হবে[৮৬] তারা বলবে "হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই এ লোকদেরকেই আমরা গোমরাহ করেছিলাম। এদেরকে ঠিক সেভাবেই গোমরাহ করেছিলাম যেভাবে আমরা নিজেরা গোমরাহ হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে দায় মুক্তির কথা প্রকাশ করছি।[৮৭] এরা তো আমাদের বন্দেগী করতো না।"[৮৮] তারপর তাদেরকে বলা হবে, এবার তোমরা যাদেরকে শরীক বানিয়েছিলে তাদেরকে ডাকো।[৮৯] এরা তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা এদের কোন জবাব দেবে না এবং এরা আযাব দেখে নেবে। হায়! এরা যদি হিদায়াত গ্রহণকারী হতো।

ভাসিয়ে দেবে না। কিন্তু যেখানে মোকাবিলার ব্যাপার এসে যায় অর্থাৎ দুনিয়ার সাফল্য ও আখেরাতের সাফল্য পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় সেখানে মানুষের কাছে সত্য দীনের দাবী এবং ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির দাবীও এটিই যে, মানুষ দুনিয়াকে আখেরাতের জন্য উৎসর্গ করে দিক এবং এ দুনিয়ার সাময়িক সম্পদ সৌন্দর্যের জন্য সে কখনো এমন পথ অবলম্বন না করুক যার ফলে তার পরকাল চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যায়।

এ দু'টি কথা সামনে রেখে দেখুন উপরের বাক্যগুলোতে আল্লাহ মক্কার কাফেরদেরকে কি বলছেন। তিনি একথা বলছেন না যে, তোমরা নিজেদের ব্যবসায় গুটিয়ে নাও, কারবার খতম করে দাও এবং আমার নবীকে মেনে নিয়ে ফকির দরবেশ হয়ে যাও। বরং তিনি বলছেন, দুনিয়ার যে ধন সম্পদের জন্য তোমরা পাগল পারা তা অতি সামান্য সম্পদ এবং দুনিয়ার জীবনে মাত্র সামান্য ক'দিনের জন্য তোমরা তা থেকে লাভবান হতে পারো। অন্য দিকে আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা এর তুলনায় গুণগত ও পরিমাণগত (Quality and Quantity) দিক দিয়েও ভালো এবং চিরন্তন স্থায়ীত্বের অধিকারী। তাই যদি তোমরা এ সাময়িক জীবনের সীমাবদ্ধ নিয়ামত দ্বারা লাভবান হবার উদ্দেশ্যে এমন নীতি অবলম্বন করো যার ফল আখেরাতে চিরন্তন ক্ষতির আকারে ভোগ করতে হয়, তাহলে এর চেয়ে বড় বোকামি আর কী হতে পারে? এক ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম করে নিজের রবের খিদমত করে এবং তারপর চিরকালের জন্য তাঁর পুরস্কার লাভ করে ধন্য হয়। আর এক ব্যক্তি গ্রেফতার হয়ে আল্লাহর আদালতে অপরাধী হিসেবে আনীত হয় এবং গ্রেফতারীর পূর্বে সে নিছক কয়েকদিন হারাম সম্পদের মজা লুটবার সুযোগ পায়। এ দু'জনের মধ্যে কে সফলকাম হলো? তোমরা নিজেরাই তুলনা করে দেখে নাও।

৮৫. এ ভাষণটিও চতুর্থ জবাবের সাথেই সংশ্লিষ্ট। উপরের আয়াতের শেষ অংশের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে, নিছক নিজেদের পার্থিব স্বার্থের খাতিরে শির্‌ক, মূর্তিপূজা ও নবুওয়াত অস্বীকারের যে গোমরাহীর ওপর তারা জোর দিচ্ছে, তার জন্য আখেরাতের চিরন্তন জীবনে তাদের কেমন অশুভ পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে। যে অনুভূতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হয়েছে তাহচ্ছে এই যে, মনে করো, দুনিয়ায় তোমাদের কোন বিপদের সম্মুখীন হতে না হলেও এবং এখানকার সংক্ষিপ্ত জীবনকালে তোমরা দুনিয়ার জীবনের সম্পদ ও সৌন্দর্য খুব বেশী উপভোগ করলেও যদি আখেরাতে এর পরিণাম খারাপ হওয়াই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে নিজেই ভেবে দেখো তোমরা যা কিছু করছো তা লাভজনক ব্যবসায় না পুরোপুরি ক্ষতির ব্যবসায়?

৮৬. এখানে জিন ও মানব জাতির শয়তানদের কথা বলা হয়েছে, যাদেরকে দুনিয়ায় আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়েছিল, যাদের কথার মোকাবিলায় আল্লাহ ও রসূলের কথা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং যাদের ওপর ভরসা করে সরল সঠিক পথ পরিত্যাগ করে জীবনের ভুল পথ অবলম্বন করা হয়েছিল। এ ধরনের লোকদেরকে কেউ ইলাহ ও রব বলুক বা না বলুক মোট কথা যখন তাদের আনুগত্য এমনভাবে করা হয়েছে যেমন আল্লাহর আনুগত্য হওয়া উচিত। তখন অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল কাহ্‌ফ ৫০ টীকা)

৮৭. আমরা জোর করে এদেরকে গোমরাহ করিনি। আমরা এদের দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি ছিনিয়ে নিইনি। এদের চিন্তা ও অনুধাবন শক্তিও কেড়ে নিইনি এবং এমন অবস্থারও সৃষ্টি করিনি যে, এরা সঠিক পথের দিকে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু আমরা হাত ধরে টেনে জোর করে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিলাম। বরং আমরা যেমন স্বেচ্ছায় ভুল পথ অবলম্বন করেছিলাম, তেমনি এদের সামনেও আমরা ভুল পথ পেশ করেছিলাম এবং এরা স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করেছিল। কাজেই আমরা এদের দায়িত্ব গ্রহণ করছি না। আমরা নিজেদের কাজের জন্য দায়ী এবং এরা এদের নিজেদের কাজের জন্য দায়ী।

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় প্রণিধানযোগ্য। সেটি হচ্ছে আল্লাহ যদিও প্রশ্ন করবেন যারা শরীক করতো তাদেরকে। কিন্তু তারা কিছু বলার আগেই জবাব দিতে আরম্ভ করবে তাদের সেই উপাসিতরা যাদেরকে শরীক করা হয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে, যখন সাধারণ মুশরিকদেরকে এ প্রশ্ন করা হবে তখন তাদের নেতৃবর্গ অনুভব করবে, এবার আমাদের সর্বনাশের পালা এসে গেছে এবং আমাদের সাবেক অনুসারীরা নিশ্চয়ই এবার বলতে শুরু করবে এরাই আমাদের পথভ্রষ্টতার জন্য মূলত দায়ী। তাই অনুসারীদের বলার আগেই তারা নিজেরাই এগিয়ে গিয়ে নিজেদের সাফাই পেশ করতে থাকবে।

৮৮. অর্থাৎ এরা আমাদের নয় বরং এদের নিজেদেরই প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে গিয়েছিল।

৮৯. অর্থাৎ তাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকো, দুনিয়ায় তোমরা তাদের প্রতি নির্ভর করে আমার কথা রদ করে দিয়েছিলে। এখন এখানে তাদেরকে আসতে, তোমাদের সাহায্য করতে বলো এবং তোমাদেরকে আযাব থেকে বাঁচাতে বলো।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾

আর তারা (যেন না ভুলে যায়) সেদিনের কথা যেদিন তিনি ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, "যে রসূল পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে?" সেদিন তাদের কোন জবাব থাকবে না, তারা নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি আজ তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে সে-ই সাফল্যলাভের আশা করতে পারে।

তোমার রব যা চান সৃষ্টি করেন এবং (তিনি নিজেই নিজের কাজের জন্য যাকে চান) নির্বাচিত করে নেন। এ নির্বাচন তাদের কাজ নয়।[৯০] আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যে শির্ক করে তার অনেক উর্ধে। তোমার রব জানেন যা কিছু তারা মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে।[৯১]

৯০. আসলে শির্ককে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে এ উক্তি করা হয়েছে। মুশরিকরা আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টিকে তাদের উপাস্যে পরিণত করেছে। নিজেদের পক্ষ থেকে তাদেরকে বিভিন্ন মর্যাদা, পদ ও গুণাবলী দান করেছে। এর প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলছেন, আমার সৃষ্ট মানুষ, ফেরেশ্‌তা, জিন ও অন্যান্য বান্দাদের মধ্য থেকে আমি নিজেই যাকে যেমন চেয়েছি গুণাবলী, যোগ্যতা ও শক্তি দান করেছি এবং যার মাধ্যমে যে কাজ নিতে চাই নিয়ে থাকি। কাজেই আমার বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজেদের ইচ্ছামতো বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, অন্নদাতা ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী ইত্যাদি মনে করার অধিকার মুশরিকরা কেমন করে ও কোথা থেকে লাভ করলো? কিভাবে তারা যাকে ইচ্ছা তাকে বৃষ্টি বর্ষণ, রুজি-রোজগার ও সন্তান দান এবং রোগ ও রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা অর্পণ করে? কেমন করে তারা যাকে ইচ্ছা তাকে আমার সার্বভৌম কর্তৃত্বাধীন এলাকার একটি অংশের শাসনকর্তা নিয়োগ করে? আমার ক্ষমতার মধ্য থেকে যা কিছু যাকে চায় তাকে তারা কেমন করে সোপর্দ করে। কেউ ফেরেশতা, জিন, নবী বা অলী যাই কিছু থাক আমার সৃষ্টির কারণেই আছে। যে গুণাবলীই যে কেউ লাভ করেছে তা আমারই দান। যাকে আমি যে কাজে লাগাতে চেয়েছি লাগিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে বিভিন্ন কাজের জন্য এভাবে নির্বাচিত করার এ অর্থ কেমন করে হয়ে গেলো যে, এ বান্দাদেরকে বন্দেগীর স্থান থেকে

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ۖ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۖ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

তিনিই এক আল্লাহ যিনি ছাড়া ইবাদাতের আর কোন হকদার নেই। তাঁরই জন্য প্রশংসা দুনিয়ায়ও, আখেরাতেও। শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে। হে নবী! তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো চিন্তা করেছো, আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপর চিরকালের জন্য রাত্রিকে অব্যাহত রাখেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ মাবুদ আছে তোমাদের আলো এনে দেবে? তোমরা কি শুনছো না? তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপর চিরকালের জন্য দিবস অব্যাহত রাখেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন্ মাবুদ আছে তোমাদের রাত্রি এনে দেবে, যাতে তোমরা তার মধ্যে বিশ্রাম করতে পারো? তোমরা কি ভেবে দেখছো না? এটা ছিল তাঁরই অনুগ্রহ, তিনি তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন রাত ও দিন, যাতে তোমরা (রাতে) শান্তি এবং (দিনে) নিজের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, হয়তো তোমরা শোকরগুজার হবে।

উঠিয়ে খোদায়ীর মর্যাদায় অভিসিক্ত করতে হবে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিতে হবে, তাদেরকে সাহায্য দান করার জন্য ডাকতে হবে, অভাব পূরণ করার জন্য তাদের কাছে আবেদন জানাতে হবে, তাদেরকে ভাগ্য ভাঙাগড়ার মালিক এবং আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতার অধিকারী আখ্যায়িত করতে হবে?

৯১. চলমান ভাষণের মধ্যে যে উদ্দেশ্যে একথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, কোন ব্যক্তি বা দল দুনিয়ার মানুষের সামনে এ দাবী করতে পারে যে, সে যে গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে

(তারা যেন স্মরণ রাখে) সেদিনের কথা যখন তিনি তাদেরকে ডাকবেন, তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, "কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে? আর আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী বের করে আনবো[৯২] তারপর বলবো।" আনো এবার তোমাদের প্রমাণগুলো।[৯৩] সেসময় তারা জানবে, সত্য রয়েছে আল্লাহর কাছে এবং তারা যা কিছু মিথ্যা বানিয়ে রেখেছিল তা সবই উধাও হয়ে যাবে।

বলে মনে করা হয়। তার ভ্রান্তিহীনতার ব্যাপারে অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণে সে নিশ্চিন্ত এবং তার বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আর এ গোমরাহীকে সে কোন অসৎ উদ্দেশ্যে নয় বরং পুরোপুরি সৎ উদ্দেশ্যে অবলম্বন করেছে এবং তার সামনে কখনো এমন কোন জিনিস আসেনি যার সাহায্যে তার ভুল তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু আল্লাহর সামনে তার এ দাবী চলতে পারে না। তিনি কেবল বাইরেরটা দেখেন না। তাঁর সামনে তো মানুষের মন ও মস্তিষ্কের এক একটি অংশ উন্মুক্ত হয়ে আছে। তিনি তার জ্ঞান, অনুভূতি, আবেগ, আকাংখা, সংকল্প, বিবেক তথা প্রত্যেকটি জিনিস সরাসরি জানেন। তিনি জানেন, কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ কোন্ সময় কোন্ কোন্ পন্থায় সতর্ক করা হয়েছে, কোন্ কোন্ পথে তার কাছে সত্য পৌঁছেছে এবং কোন্ কোন্ পথে বাতিলের বাতিল হওয়ার বিষয়টি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে মূল কারণগুলোর ভিত্তিতে সে হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের গোমরাহীকে প্রাধান্য দিয়েছিল সেগুলো কি ছিল তাও তিনি জানেন।

৯২. অর্থাৎ নবী, যিনি সংশ্লিষ্ট উম্মতকে সতর্ক করেছিলেন। অথবা নবীদের অনুসারীদের মধ্য থেকে এমন কোন হিদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি সংশ্লিষ্ট উম্মতের মধ্যে সত্য প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিংবা কোন প্রচার মাধ্যম যার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট উম্মতের কাছে সত্যের পয়গাম পৌঁছেছিল।

৯৩. অর্থাৎ নিজেদের সাফাইয়ের মধ্যে এমন কোন প্রমাণ পেশ করো যার ভিত্তিতে তোমাদের মাফ করে দেয়া যেতে পারে। অথবা তোমরা যে শিরক এবং যে আখেরাত ও নবুওয়াত অস্বীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলে তা সঠিক ছিল এবং তোমরা যুক্তি সংগত কারণে এ পথ অবলম্বন করেছিলে একথা প্রমাণ করো। কিংবা এ না হলেও কমপক্ষে একথাই প্রমাণ করো যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে এ ভুলের জন্য সতর্ক করে দেবার এবং তোমাদের কাছে সঠিক কথা পৌঁছাবার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

৮ রুকূ'

একথা সত্য,[৯৪] কারূণ ছিল মূসার সম্প্রদায়ের লোক, তারপর সে নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।[৯৫] আর আমি তাকে এতটা ধনরত্ন দিয়ে রেখেছিলাম যে, তাদের চাবিগুলো বলবান লোকদের একটি দল বড় কষ্টে বহন করতে পারতো।[৯৬] একবার যখন এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বললো, "অহংকার করো না, আল্লাহ অহংকারকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখেরাতের ঘর তৈরি করার কথা চিন্তা করো এবং দুনিয়া থেকেও নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না। অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

৯৪. সাতান্ন আয়াত থেকে মক্কার কাফেরদের যে আপত্তি সম্পর্কে লাগাতার ভাষণ চলছে এ ঘটনাটিও তারই জবাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের কারণে জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হবার ভয় প্রকাশ করেছিল তারা আসলে ছিল মক্কার বড় বড় শেঠ, মহাজন ও পুঁজিপতি। আন্তরজাতিক বাণিজ্য ও সূদী কারবার তাদেরকে সমকালীন কারূণে পরিণত করেছিল। তারাই মনে করছিল বেশী বেশী করে ধন সম্পদ আহরণ করাই হচ্ছে আসল সত্য। এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে গিয়ে যে জিনিস থেকেই কিছু ক্ষতি হবার আশংকা থাকে তা সরাসরি বাতিল করতে হবে। কোন অবস্থাতেই তা গ্রহণ করা যেতে পারে না। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ ধন-সম্পদের এ উঁচু স্তম্ভগুলোকে আকাংখার দৃষ্টিতে দেখতো এবং তাদের চূড়ান্ত কামনা হতো, যে উচ্চতায় এরা পৌঁছেছে হায়। যদি আমাদের সেখানে পৌঁছুবার সৌভাগ্য হতো। চলমান অর্থ গৃধনুতার পরিবেশে এ যুক্তি বড়ই শক্তিশালী মনে করা হচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাওহীদ, আখেরাত ও নৈতিক বিধিবন্ধনের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন তা মেনে নেয়া হলে কুরাইশদের উচ্চ মর্যাদার গগনচুম্বী প্রাসাদ ধূলায় লুটিয়ে পড়বে এবং এ ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্য তো দূরের কথা জীবন ধারণই কঠিন হয়ে পড়বে।

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَـٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَـٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ ﴿٨٠﴾

এতে সে বললো, "এসব কিছু তো আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তার ভিত্তিতে আমাকে দেয়া হয়েছে।[৯৭]—সে কি এ কথা জানতো না যে, আল্লাহ এর পূর্বে এমন বহু লোককে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা এর চেয়ে বেশী বাহু বল ও জনবলের অধিকারী ছিল?[৯৮] অপরাধীদেরকে তো তাদের গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় না।[৯৯]

একদিন সে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে। যারা দুনিয়ার জীবনের ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত ছিল তারা তাকে দেখে বললো, "আহা! কারূণকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমরাও পেতাম! সে তো বড়ই সৌভাগ্যবান।" কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলতে লাগলো, "তোমাদের ভাবগতিক দেখে আফসোস হয়। আল্লাহর সওয়াব তার জন্য ভালো যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আর এ সম্পদ সবরকারীরা ছাড়া আর কেউ লাভ করে না।[১০০]

৯৫. বাইবেল ও তালমূদে কারূনকে কোরহ (Korah) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে ছিল হযরত মূসা আলাইহিস সালামের চাচাত ভাই। বাইবেলের যাত্রাপুস্তকে (৬ অধ্যায় ১৮–২১ শ্লোক) যে বংশধারা বর্ণনা করা হয়েছে, তার দৃষ্টিতে বলা যায় হযরত মূসা ও কারূনের পিতা উভয়ে ছিল পরস্পর সহোদর ভাই। কুরআন মজীদের অন্য স্থানে বলা হয়েছে, এ ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের অন্তরভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ফেরাউনের সাথে হাত মিলিয়েছিল এবং তার নৈকট্য লাভ করে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতের মোকাবিলায় ফেরাউনের পরে বিরোধিতার ক্ষেত্রে যে দু'জন প্রধান দলপতি বেশী অগ্রসর ছিল তাদের একজন ছিল এ কারূন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَا وَسُلْطَـٰنٍ مُّبِينٍ ۝ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَقَـٰرُونَ فَقَالُوا۟ سَـٰحِرٌ كَذَّابٌ –

"আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ এবং সুস্পষ্ট যুক্তি সহকারে ফেরাউন, হামান ও কারূণের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা বলল, এ একজন যাদুকর ডাহা মিথ্যুক।"
(আল–মুমিন ঃ ২৩–২৪)

এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, কারূন নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে এমন শত্রু শক্তির ধামাধরায় পরিণত হয়েছিল, যে বনী ইসরাঈলকে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। আর এ জাতীয় বিশ্বসঘাতকতার বদৌলতে ফেরাউনের রাষ্ট্রীয় প্রশানে সে এমন গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় অভিসিক্ত হয়েছিল যে, হযরত মূসা ফেরাউন ছাড়া আর যে দু'জন বড় বড় সত্তার কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের দু'জনের একজন ছিল ফেরাউনের মন্ত্রী হামান এবং অন্যজন এ ইসরাঈলী শেঠ। বাকি রাষ্ট্রের অন্য সভাসদ ও কর্মকর্তারা ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যায়ের। কাজেই তদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। কারূনের এ মর্যাদাটিই সূরা আনকাবূতের ৩৯ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৯৬. বাইবেলে (গণনা পুস্তকের ১৬ অধ্যয়) তার যে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে এ ব্যক্তির ধন–দৌলতের কোন কথা বলা হয়নি। কিন্তু ইহুদী বর্ণনাসমূহ থেকে জানা যায়, এ ব্যক্তি অগাধ ধন–সম্পদের মালিক ছিল, এমন কি তার ধনাগারের চাবিগুলো বহন করার জন্য তিনশো খচ্চরের প্রয়োজন হতো। (জুয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ খণ্ড, ৫৫৬ পৃষ্ঠা) এ বর্ণনাটি যদিও অনেক বেশী অতিরঞ্জিত তবুও এ থেকে এতটুকু জানা যায় যে, ইসরাঈলী বর্ণনাবলীর দৃষ্টিতেও কারূন ছিল তৎকালের সবচেয়ে বড় ধনী ব্যক্তি।

৯৭. আসল শব্দগুলো হচ্ছে إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, আমি যা কিছু পেয়েছি নিজের যোগ্যতার বলে পেয়েছি। এটা কোন অনুগ্রহ নয়। অধিকার ছাড়াই নিছক দয়া করে কেউ আমাকে এটা দান করেনি। তাই আমাকে এখন এজন্য এভাবে কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই যে, যেসব অযোগ্য লোককে কিছুই দেয়া হয়নি তাদেরকে দয়া ও অনুগ্রহ হিসেবে আমি এর মধ্য থেকে কিছু দেবো অথবা আমার কাছ থেকে এ সম্পদ যাতে ছিনিয়ে নিয়ে না নেয়া হয় সেজন্য কিছু দান খয়রাত করে দেবো। এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, আমার মতে আল্লাহ এই যে সম্পদরাজি আমাকে দিয়েছেন এটি তিনি আমার গুণাবলী সম্পর্কে জেনেই দিয়েছেন। যদি তাঁর দৃষ্টিতে আমি একজন পছন্দনীয় মানুষ না হতাম, তাহলে তিনি এসব আমাকে কেন দিলেন? আমার প্রতি তাঁর নিয়ামত বর্ষিত হওয়াটাই প্রমাণ করে আমি তাঁর প্রিয় পাত্র এবং আমার নীতিপদ্ধতি তিনি পছন্দ করেন।

৯৮. অর্থাৎ এ ব্যক্তি যে নিজেকে বড় পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী ও চতুর বলে দাবী করে বেড়াচ্ছে এবং নিজের যোগ্যতার অহংকারে মাটিতে পা ফেলছে না, সে কি জানে না যে, তার চাইতেও বেশী অর্থ, মর্যাদা, প্রতিপত্তি,শক্তি ও শান শওকতের অধিকারী লোক ইতিপূর্বে দুনিয়ায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন? যোগ্যতা ও নৈপূণ্যই যদি পার্থিব উন্নতির রক্ষাকবচ হয়ে থাকে তাহলে যখন তারা ধ্বংস হয়েছিল তখন তাদের এ যোগ্যতাগুলো কোথায় গিয়েছিল? আর যদি কারো পার্থিব উন্নতি লাভ অনিবার্যভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তার কর্ম ও গুণাবলী পছন্দ করেন তাহলে তাদের সর্বনাশ হলো কেন?

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার গৃহকে ভূগর্ভে পুতে ফেললাম। তখন আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার মতো সাহায্যকারীদের কোন দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারলো না। যারা আগের দিন তার মতো মর্যাদালাভের আকাংখা পোষণ করছিল তারা বলতে লাগলো, "আফসোস, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সীমিত রিযিক দেন।[১০১] যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমাদেরও ভূগর্ভে পুতে ফেলতেন। আফসোস, আমাদের মনে ছিল না, কাফেররা সফলকাম হয় না।[১০২]

৯৯. অর্থাৎ অপরাধীরা তো এ দাবীই করে থাকে যে, তারা বড়ই ভালো লোক। তাদের কোন দোষ আছে একথা তারা কবেই বা স্বীকার করে। কিন্তু তাদের শাস্তি তাদের স্বীকারোক্তির ওপর নির্ভর করে না। তাদেরকে যখন পাকড়াও করা হয় একথা জিজ্ঞেস করে পাকড়াও করা হয় না যে, তোমরা কি কি অপরাধ করেছ!

১০০. অর্থাৎ এ চরিত্র, চিন্তা পদ্ধতি এবং আল্লাহর পুরস্কার দান কেবলমাত্র এমন লোকদের জন্য নির্ধারিত যাদের মধ্যে এতটা ধৈর্য ও দৃঢ়তা থাকে যার ফলে তারা হালাল পথে অর্থোপার্জন করার জন্য অবিচল সংকল্পবদ্ধ হয়। চাই তাতে তাদের ভাগ্যে শুধুমাত্র নুনভাতই জুটুক, কিংবা তারা কোটিপতি হয়ে যাবার সৌভাগ্য লাভ করুক। সারা দুনিয়ার সুখ ও সুবিধা অর্জিত হবার সুযোগ দেখা দিলেও তারা হারাম পথের দিকে একটুও ঝুঁকে পড়ে না। এ আয়াতে আল্লাহর পুরস্কার বলতে এমন মর্যাদা সম্পন্ন রিযিক বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে অর্জন করে। আর সবর অর্থ হচ্ছে, নিজের আবেগ-অনুভূতি ও কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। লোভ-লালসার মোকাবিলায় ঈমানদারী ও বিশ্বস্ততার ওপর অবিচল থাকা। সততা, ন্যায় পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার ফলে যে ক্ষতি হয় অথবা যে লাভ হাত ছাড়া হয়ে যায় তা বরদাশ্‌ত করে নেয়া। অবৈধভাবে তদবীর-তাগাদা করে যে লাভ হতে পারে তা প্রত্যাখ্যান করা। হালাল রোজগার তা যত সামান্যই হোক না কেন

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৯ রুকূ'

সে আখেরাতের[১০৩] গৃহ তো আমি তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেবো যারা পৃথিবীতে নিজেদের বড়াই চায় না[১০৪] এবং চায় না বিপর্যয় সৃষ্টি করতে।[১০৫] আর শুভ পরিণাম রয়েছে মুত্তাকীদের জন্যই।[১০৬] যে কেউ ভাল কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে তার চেয়ে ভাল ফল এবং যে কেউ খারাপ কাজ নিয়ে আসে তার জানা উচিৎ যে, অসৎ কর্মশীলরা যেমন কাজ করতো ঠিক তেমনটিই প্রতিদান পাবে।

তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। হারামখোরদের জাকজমক দেখে মনের মধ্যে ঈর্ষা ও কামনা বাসনার জালায় অস্থির হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপমাত্র না করা এবং ঠাণ্ডা মাথায় একথা অনুধাবন করা যে, ঈমানদারের জন্য এ চাকচিক্যময় আবর্জনার তুলনায় এমন নিরাভরণ পবিত্রতাই ভালো যা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাকে দান করেছেন। "সবরকারীরা ছাড়া আর কেউ এ সম্পদ লাভ করে না" উক্তিতে উল্লেখিত সম্পদ অর্থ আল্লাহর সওয়াবও হতে পারে এবং এমন পবিত্র-পরিচ্ছন্ন মানসিকতাও হতে পারে যার ভিত্তিতে মানুষ ঈমান ও সৎকর্ম সহকারে অনাহার ও অভুক্ত থাকাকে বেঈমানীর পথ অবলম্বন করে কোটিপতি হয়ে যাওয়ার চাইতে ভালো মনে করে।

১০১. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক প্রসারিত বা সংকুচিত করা যেটাই ঘটুক না কেন তা ঘটে তাঁর ইচ্ছাক্রমেই। এ ইচ্ছার মধ্যে তাঁর ভিন্নতর উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে। কাউকে বেশী রিযিক দেবার অর্থ নিশ্চিত ভাবে এ নয় যে, আল্লাহ তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট তাই তাকে পুরস্কার দিচ্ছেন। অনেক সময় কোন ব্যক্তি হয় আল্লাহর কাছে বড়ই ঘৃণিত ও অভিশপ্ত কিন্তু তিনি তাকে বিপুল পরিমাণ ধন-দৌলত দিয়ে যেতে থাকেন। এমনকি এ ধন শেষ পর্যন্ত তার ওপর আল্লাহর কঠিন আযাব নিয়ে আসে। পক্ষান্তরে যদি কারো রিযিক সংকুচিত হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে তার এ অর্থ হয় না যে, আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। অধিকাংশ সৎলোক আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় এ অভাব অনটন তাঁদের জন্য আল্লাহর রহমতে পরিণত হয়েছে। এ সত্যটি না বোঝার ফলে যারা আসলে আল্লাহর গযবের অধিকারী হয় তাদের সমৃদ্ধিকে মানুষ ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখে।

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

হে নবী! নিশ্চিত জেনো, যিনি এ কুরআন তোমার ওপর ন্যস্ত করেছেন[১০৭] তিনি তোমাকে একটি উত্তম পরিণতিতে পৌঁছিয়ে দেবেন।[১০৮] তাদেরকে বলে দাও, "আমার রব ভালো করেই জানেন কে হিদায়াত নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে।" তুমি মোটেই আশা করোনি যে, তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করা হবে। এতো নিছক তোমার রবের মেহেরবানী (তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে)[১০৯], কাজেই তুমি কাফেরদের সাহায্যকারী হয়ো না।[১১০]

১০২. অর্থাৎ আমাদের এ ভুল ধারণা ছিল যে, পার্থিব সমৃদ্ধি ও ধনাঢ্যতাই সফলতা। এ কারণে আমরা মনে করে বসেছিলাম কারূন বড়ই সাফল্য অর্জন করে চলছে। কিন্তু এখন বুঝলাম, আসল সাফল্য অন্য কোন জিনিসের নাম এবং তা কাফেরদের ভাগ্যে জোটে না।

কারূনের ঘটনার এ শিক্ষনীয় দিকটি কেবলমাত্র কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে। বাইবেল ও তালমূদে এর কোন উল্লেখ নেই। তবে এ দু'টি কিতাবে যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে তা থেকে জানা যায়, বনী ইসরাঈল যখন মিসর থেকে বের হয় তখন এ ব্যক্তিও নিজের দলবলসহ তাদের সাথে বের হয়; তারপর সে হযরত মূসা ও হারূনের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করে। আড়াইশ' লোক এ ষড়যন্ত্রে তার সাথে শরীক ছিল। শেষ পর্যন্ত তার ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হয় এবং সে নিজের গৃহ ও ধন–সম্পদসহ মাটির মধ্যে প্রোথিত হয়ে যায়।

১০৩. এখানে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, যা প্রকৃত সাফল্যের স্থান হিসেবে চিহ্নিত।

১০৪. অর্থাৎ যারা আল্লাহর যমীনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী নয়। যারা বিদ্রোহী, স্বৈরাচারী ও দাম্ভিক হয়ে নয় বরং বান্দা হয়ে থাকে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের বান্দা করে রাখার চেষ্টা করে না।

১০৫. 'ফাসাদ' বা বিপর্যয় হচ্ছে মানব জীবন ব্যবস্থার এমন একটি বিকৃতি যা সত্য বিচ্যুত হবার ফলে অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। আল্লাহর বন্দেগী এবং তাঁর আইন কানুনের আনুগত্যের সীমানা অতিক্রম করে মানুষ যা কিছুই করে সবই হয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই বিপর্যয়। এর একটি অংশ হচ্ছে এমন ধরনের বিপর্যয়, যা হারাম পথে ধন আহরণ এবং হারাম পথে তা ব্যয় করার ফলে সৃষ্টি হয়।

১০৬. অর্থাৎ তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তার নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকে।

১০৭. অর্থাৎ এই কুরআনকে আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছাবার, তাদেরকে এর শিক্ষা দান করার এবং এর পথ নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্ব সংস্কার করার দায়িত্ব তোমার প্রতি অর্পণ করেছেন।

১০৮. আসল শব্দ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ অর্থাৎ তোমাকে একটি মা'আদের দিকে পৌঁছিয়ে দেবেন। মা'আদ–এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এমন স্থান যেদিকে মানুষকে ফিরে যেতে হবে। এ শব্দটিকে অনির্দিষ্ট বাচক পদ হিসেবে ব্যবহার করার কারণে এর দ্বারা আপনা আপনি এ অর্থ বুঝানো হয় যে, এ স্থানটি বড়ই মহিমান্বিত ও মর্যাদা সম্পন্ন। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন জান্নাত। কিন্তু একে শুধুমাত্র জান্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। আল্লাহ শব্দটিকে যেমন ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করেছেন তেমনি ব্যাপক অর্থে একে ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। এর ফলে এ প্রতিশ্রুতি দুনিয়া ও আখরাত উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। আয়াতের পূর্ববর্তী আলোচনাও এ কথাই দাবী করে যে, একে কেবলমাত্র আখেরাতেই নয় বরং দুনিয়াতেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরাট শান শওকত এবং মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করার প্রতিশ্রুতি মনে করা হোক। মক্কার কাফেরদের যে উক্তি নিয়ে ৫৭ আয়াত থেকে এ পর্যন্ত লাগাতার আলোচনা চলছে তাতে তারা বলেছিল, হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তুমি নিজের সাথে আমাদেরকেও নিয়ে ডুবতে চাও। যদি আমরা তোমার সাথে সহযোগিতা করি এবং এ ধর্ম গ্রহণ করে নিই, তাহলে আরবের সরযমীনে আমাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। এর জবাবে আল্লাহ তাঁর নবীকে বললেন, হে নবী! যে আল্লাহ এ কুরআনের পতাকা বহন করার দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করেছেন তিনি তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন না। বরং তিনি তোমাকে এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চান যার কল্পনাও আজ এরা করতে পারে না। আর প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ মাত্র কয়েক বছর পর নবী করীমকে (সা) এ দুনিয়ায় এদেরই চোখের সামনে সমগ্র আরব দেশে এমন নিরংকুশ কর্তৃত্ব দান করলেন যে, তাঁকে বাধাদানকারী কোন শক্তিই সেখানে টিকতে পারলো না এবং তাঁর দীন ছাড়া অন্য কোন দীনের জন্য সেখানে কোন অবকাশই থাকলো না। আরবের ইতিহাসে এর আগে সমগ্র আরব উপদ্বীপে কোন এক ব্যক্তির একচ্ছত্র আধিপত্যের এ ধরনের কোন নজীর সৃষ্টি হয়নি, যার ফলে সারা দেশে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকেনি, তার হুকুমের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার ক্ষমতা কেউ রাখেনি এবং লোকেরা কেবল রাজনৈতিকভাবেই তার দলভুক্ত হয়নি বরং সমস্ত দীনকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সেই এক ব্যক্তি সবাইকে তার দীনের অনুসারীও করে নিয়েছে।

কোন কোন মুফাস্সির এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সূরা কাসাসের এ আয়াতটি মক্কা থেকে মদীনার দিকে হিজরাত করার সময় পথে নাযিল হয়েছিল। তাদের মতে এতে আল্লাহ তাঁর নবীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি আবার তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু প্রথমত এর শব্দাবলীর মধ্যে "মা'আদ" কে "মক্কা" অর্থে গ্রহণ করার কোন সুযোগই নেই। দ্বিতীয়ত বিষয়বস্তু ও আভ্যন্তরীণ সাক্ষ–প্রমাণের দিক দিয়ে বিচার করলে এ সূরাটি হচ্ছে হাবশায় হিজরাতের নিকটবর্তী সময়ের এবং একথা বুঝা যাচ্ছে না যে,

কয়েক বছর পরে মদীনায় হিজরাতের সময় পথে যদি এ আয়াতটি নাযিল হয়ে থাকে তাহলে কোন্ সম্পর্কের ভিত্তিতে এখানে এ ধারাবাহিক আলোচনার মধ্যে একে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। তৃতীয়ত এ প্রেক্ষাপটে মক্কার দিকে নবী করীমের (সা) ফিরে যাবার আলোচনা একেবারেই বেমানান ঠেকে। আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করা হলে এটা মক্কার কাফেরদের কথার জবাব হবে না বরং তাদের ওজরকে শক্তিশালী করা হবে। এর অর্থ হবে, অবশ্যই হে মক্কাবাসীরা! তোমরা ঠিকই বলছো, মুহাম্মাদ (সা) কে এ শহর থেকে বের করে দেয়া হবে কিন্তু তিনি স্থায়ীভাবে নির্বাসিত হবেন না বরং শেষ পর্যন্ত আমি তাকে আবার এখানে ফিরিয়ে আনবো। এ হাদীসটি যদিও বুখারী, নাসাঈ, ইবনে জারীর ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন কিন্তু আসলে এটি ইবনে আব্বাসের নিজস্ব অভিমত। এটি সরাসরি রসূল (সা) এর বক্তব্য সম্বলিত কোন মারফূ হাদীস নয় যে, একে মেনে নিতেই হবে।

১০৯. একথাটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হচ্ছে। মূসা আলাইহিস সালাম এ কথা মোটেই জানতেন না যে, তাঁকে নবী করা হচ্ছে এবং বিরাট দায়িত্ব সম্পাদনে নিযুক্ত করা হচ্ছে। তিনি কখনো কল্পনায়ও এ ইচ্ছা বা আশা পোষণ করা তো দূরের কথা কখনো এ বিষয়টি কামনাও করেননি। হঠাৎ পথ চলার সময় তাঁকে ডেকে নেয়া হয় এবং নবীর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তাঁর থেকে বিস্ময়কর কাজ নেয়া হয়, যার সাথে তার পূর্ববর্তী জীবনের কাজের কোন সাদৃশ্যই ছিল না। ঠিক একই ঘটনা ঘটে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও। মক্কার লোকেরা নিজেরাই জানতো, হেরা গিরিগুহা থেকে যেদিন তিনি নবুওয়াতের পয়গাম নিয়ে নেমে আসেন তার মাত্র একদিন আগে পর্যন্ত তাঁর জীবন কি ছিল, তিনি কি কাজ করতেন, কেমন কথাবার্তা বলতেন, তাঁর কথাবার্তার বিষয়বস্তু কি হতো, কোন্ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল এবং তাঁর তৎপরতা ছিল কোন্ ধরনের। তাঁর এ সমগ্র জীবন অবশ্যই সত্যতা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতায় পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে পরিপূর্ণ ভদ্রতা, শালীনতা, শান্তিপ্রিয়তা, প্রতিশ্রুতি পালন, অধিকার প্রদান ও জনসেবার ভাবধারা অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান ছিল। কিন্তু সেখানে এমন কোন জিনিস ছিল না যার ভিত্তিতে কেউ একথা কল্পনাও করতে পারে যে, এ সদাচারী লোকটি আগামীকাল নবুওয়াতের দাবী নিয়ে এগিয়ে আসবেন। তাঁর সাথে যারা নিকটতম সম্পর্ক রাখতো এবং তাঁর আত্মীয়–স্বজন, পাড়া–প্রতিবেশী ও বন্ধু–বান্ধবদের মধ্যে একজনও একথা বলতে পারেনি যে, তিনি পূর্ব থেকেই নবী হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হেরা গিরিগুহার সেই বৈপ্লবিক মুহূর্তের পরে অকস্মাত যেসব বিষয়বস্তু, সমস্যাবলী ও প্রসংগ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বিবৃতি ও ভাষণ দান শুরু হয়ে যায় ইতিপূর্বে কেউ তাঁর কন্ঠ থেকে কখনো তার একটি বর্ণও শোনেনি। কুরআনের আকারে অকস্মাত তাঁর মুখ থেকে যে বিশেষ ভাষা, শব্দ ও পরিভাষা লোকেরা শুনতে থাকে ইতিপূর্বে কখনো তারা তা শোনেনি। ইতিপূর্বে কখনো তিনি কোথাও বক্তৃতা ও ওয়াজ–নসিহত করতে দাঁড়াননি। কখনো দাওয়াত দিতে ও আন্দোলনের বাণী নিয়ে এগিয়ে আসেননি। বরং কখনো তাঁর কোন কর্মতৎপরতা থেকে এ ধারণাই জন্মাতে পারেনি যে, তিনি সামাজিক সমস্যা সমাধান অথবা ধর্মীয় সংশোধন কিংবা নৈতিক ও চারিত্রিক সংস্কার সাধনের জন্য কোন কাজ শুরু করার চিন্তা–ভাবনা করছেন। এ বৈপ্লবিক মুহূর্ত সমাগত হবার একদিন আগেও তাঁর জীবন ছিল

একজন ব্যবসায়ীর জীবন। সাদামাটা ও বৈধ পথে রুজী-রোজগার করা, নিজের সন্তান-পরিজনদের সাথে হাসিখুশির জীবন যাপন করা, অতিথি আপ্যায়ন করা, দুঃখী-দরিদ্র জনদের সাহায্য সেবা করা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা আর কখনো কখনো ইবাদাত করার জন্য একান্তে বসে যাওয়া– এই ছিল তাঁর স্বাভাবিক জীবন। এ ধরনের একজন লোকের হঠাৎ একদিন বিশ্ব কাঁপানো বাগ্মীতা নিয়ে ময়দানে নেমে আসা, একটি বিপ্লবাত্মক দাওয়াতের কাজ শুরু করে দেয়া, একটি অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করা এবং একটি স্বতন্ত্র জীবন দর্শন চিন্তাধারা ও নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিধান নিয়ে সামনে এগিয়ে আসা, এতবড় একটি পরিবর্তন, যা মানবিক মনস্তত্বের দৃষ্টিতে কোন প্রকার কৃত্রিমতা, প্রস্তুতি ও ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কখনোই আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কারণ এ ধরনের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতি অবশ্যই পর্যায়ক্রমিক ক্রমোন্নতির স্তর অতিক্রম করে এবং যাদের মধ্যে মানুষ রাত্রি-দিন জীবন-যাপন করে এ পর্যায় ও স্তর কখনো তাদের চোখের আড়ালে থাকতে পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন যদি এ পর্যায়গুলো অতিক্রম করে থাকতো তাহলে মক্কার হাজার হাজার লোক বলতো, আমরা না আগেই বলেছিলাম এ ব্যক্তি একদিন কোন বড় আকারের দাবী করে বসবে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, মক্কার কাফেররা তাঁর বিরুদ্ধে সব ধরনের অভিযোগ আনলেও এ অভিযোগটি তাদের একজনও উথাপন করেনি।

তারপর তিনি নিজেও নবুওয়াতের প্রত্যাশী ছিলেন না। অথবা তা কামনা করতেন না এবং সেজন্য অপেক্ষাও করছিলেন না। বরং সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অকস্মাত তিনি এ বিষয়টির মুখোমুখি হলেন। বিভিন্ন হাদীসে অহীর সূত্রপাতের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে যে ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। জিব্রীলের সাথে প্রথম সাক্ষাত এবং সূরা আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর তিনি হেরা গুহা থেকে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গৃহে পৌছেছিলেন। গৃহের লোকদের বলেছিলেন, "আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও।" কিছুক্ষণ পরে ভীতির অবস্থা কিছুটা দূর হয়ে গেলে নিজের জীবন সঙ্গিনীকে সব অবস্থা খুলে বললেন। এ প্রসঙ্গে তাঁকে বললেন, "আমি নিজের প্রাণের ভয় করছি।" স্ত্রী সংগে সংগেই জবাব দিলেন, "মোটেই না, আল্লাহ আপনাকে কখনো কষ্ট দেবেন না। আপনি আত্মীয়দের হক আদায় করেন। অসহায়কে সাহায্য করেন। অভাবী দরিদ্রকে সহায়তা দেন। অতিথি আপ্যায়ন করেন। প্রত্যেক ভালো কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন।" তারপর তিনি তাঁকে নিয়ে নিজের চাচাত ভাই ও আহলে কিতাবদের একজন অভিজ্ঞ আলেম ও সদাচারী ব্যক্তি ওয়ারাকাহ ইবনে নওফালের কাছে গেলেন। তাঁর কাছ থেকে পুরো ঘটনা শোনার পর ওয়ারাকাহ বললেন, "আপনার কাছে যিনি এসেছিলেন তিনি ছিলেন সেই আসমানী দূত বা নামুস (বিশেষ কাজে নিযুক্ত নির্দিষ্ট ফেরেশ্‌তা) যিনি মূসার (আ) কাছে এসেছিলেন। হায় ! যদি আমি যুবক হতাম এবং সে সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম যখন আপনার সম্প্রদায় আপনাকে বহিষ্কার করবে।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কি আমাকে বের করে দেবে ?" জবাব দিলেন, "হাঁ আজ পর্যন্ত এক ব্যক্তিও এমন অতিক্রান্ত হননি, যিনি এ ধরনের বাণী বহন করে [illegible]ছেন, এবং লোকেরা তাঁর দুশমনে পরিণত হয়নি।

এ সমগ্র ঘটনাটি এমন একটি অবস্থার ছবি তুলে ধরে, যা একজন সরল মানুষ একটি অপ্রত্যাশিত ও চরম অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলে তার জীবনে দেখা দিতে পারে। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম থেকেই নবী হবার চিন্তা করতেন, নিজের সম্পর্কে চিন্তা করতেন যে, তাঁর মতো মানুষের নবী হওয়া উচিত এবং কবে কোন্ ফেরেশতা তাঁর কাছে পয়গাম নিয়ে আসবে তারি প্রতীক্ষায় ধ্যান সাধনা করে নিজের মনের ওপর চাপ প্রয়োগ করতেন, তাহলে হেরা গুহার ঘটনা সংঘটিত হবার সাথে সাথেই তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন এবং বলিষ্ঠ মনোবল নিয়ে বিরাট দাবী সহকারে পাহাড় থেকে নামতেন, তারপর সোজা নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে পৌঁছে নিজের নবুওয়াতের ঘোষণা দিতেন। কিন্তু এখানে এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। তিনি যা কিছু দেখেন তাতে বিস্মিত ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে পৌঁছেন। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। মনটা একটু শান্ত হলে চুপিচুপি স্ত্রীকে বলেন, আজ গুহার নিসংগতায় এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটে গেছে। জানি না কি হবে। আমার প্রাণ নিরাপদ নয় মনে হচ্ছে। নবুওয়াত প্রার্থীর অবস্থা থেকে এ অবস্থা কত ভিন্নতর।

তারপর স্বামীর জীবন, তার অবস্থা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে স্ত্রীর চেয়ে বেশী আর কে জানতে পারে? যদি তিনি পূর্বাহ্নেই এ অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকতেন যে, তাঁর স্বামী হচ্ছেন নবুওয়াতের প্রার্থী, তিনি সর্বক্ষণ ফেরেশতার আগমনের প্রতীক্ষা করছেন, তাহলে তাঁর জবাব কখনো হযরত খাদীজার (রা) জবাবের অনুরূপ হতো না। বরং তিনি বলতেন ঃ হে স্বামী! ভয় পাও কেন? দীর্ঘদিন থেকে যে জিনিসের প্রত্যাশী ছিলে তা পেয়ে গেছো। চলো, এবার পীর গিরির দোকান পাঠ সাজাও। আমি মানত, নজরানা ইত্যাদি সামলানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু পনের বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি স্বামীর জীবনের যে চেহারা দেখেছিলেন তার ভিত্তিতে এ কথা বুঝতে তাঁর এক মুহূর্তও দেরী হয়নি যে, এমন সৎ, ত্যাগী ও নির্লোভ ব্যক্তির কাছে শয়তান আসতে পারে না, আল্লাহ তাঁকে কোন বড় পরীক্ষার সম্মুখীনও করতে পারেন না বরং তিনি যা কিছু দেখেছেন তা নির্জলা সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

ওয়ারাকাহ ইবনে নওফালের ব্যাপারেও একই কথা। তিনি কোন বাইরের লোক ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন নবী করীমের (সা) ভ্রাতৃসমাজের অন্তরভুক্ত এবং নিকটতম আত্মীয়তার প্রেক্ষিতে তাঁর শ্যালক। তারপর একজন ঈসায়ী আলেম হবার ফলে নবুওয়াত, কিতাব ও অহীকে কৃত্রিমতা ও বানোয়াট থেকে বাছাই করার ক্ষমতা রাখতেন। বয়সে অনেক বড় হবার কারণে নবীর (সা) শৈশব থেকে সে সময় পর্যন্তকার সমগ্র জীবন তাঁর সামনে ছিল। তিনিও তাঁর মুখ থেকে হেরা গুহার সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক শোনার পর সংগে সংগেই বলে ওঠেন, এ আগমনকারী নিশ্চিতভাবেই সেই একই ফেরেশতা হবেন যিনি হযরত মূসার (আ) কাছে অহী নিয়ে আসতেন। কারণ হযরত মূসার (আ) সাথে যা ঘটেছিল এখানেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ একজন অত্যন্ত পবিত্র পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী সহজ সরল মানুষ, মাথায় কোন প্রকার পূর্ব চিন্তা বা পরিকল্পনা নেই নবুওয়াতের চিন্তায় ডুবে থাকা তো দূরের কথা তা অর্জন করার কল্পনাও কোনদিন

মনে জাগেনি এবং অকস্মাত তিনি পূর্ণ সচেতন অবস্থায় প্রকাশ্যে এ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। এ জিনিসটি তাঁকে দুই আর দু'ইয়ে চারের মতো নির্দ্বিধায় নিশ্চিতভাবেই এ সিদ্ধান্তে পৌছিয়ে দেয় যে, এখানে কোন প্রবৃত্তির প্ররোচনা বা শয়তানী ছল চাতুরী নেই। বরং এ সত্যাশ্রয়ী মানুষটি নিজের কোন প্রকার ইচ্ছা-আকাংখা ছাড়াই যা কিছু দেখেছেন তা আসলে প্রকৃত সত্যদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের এমন একটি সুস্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে, একজন সত্যপ্রিয় মানুষের পক্ষে একে অস্বীকার করা কঠিন। তাই কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এ জিনিসটিকে নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। যেমন সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لَّوْشَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ –

"হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, যদি আল্লাহ এটা না চাইতেন, তাহলে আমি কখনো এ কুরআন তোমাদের শুনাতাম না বরং এর খবরও আমি তোমাদের দিতাম না। ইতিপূর্বে আমি তোমাদের মধ্যে আমার জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি, তোমরা কি এতটুকু কথাও বোঝো না?" (ইউনুস ঃ ১৬ আয়াত)

আর সূরা আশ্-শূরায় বলা হয়েছে,

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا –

"হে নবী! তুমি তো জানতেও না কিতাব কি এবং ঈমানই কি। কিন্তু আমি এ অহীকে একটি আলোয় পরিণত করে দিয়েছি। যার সাহায্যে আমি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চাই তাকে পথ দেখাই।" (আশ্-শূরা ঃ ৫২ আয়াত)।

[আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস ২১, আনকাবুত ৮৮-৯২ এবং শূরা ৮৪ টীকা।]

১১০. অর্থাৎ আল্লাহ যখন না চাইতেই তোমাদের এ নিয়ামত দান করেছেন তখন তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তোমাদের সমস্ত শক্তি ও শ্রম এর পতাকা বহন করার এবং এর প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যয় করবে এ কাজে ক্রটি ও গাফলতি করার মানে হবে তোমরা সত্যের পরিবর্তে সত্য অস্বীকারকারীদেরকে সাহায্য করেছো। এর অর্থ এ নয়, নাউযুবিল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ধরনের কোন ভুলের আশংকা ছিল। বরং এভাবে আল্লাহ কাফেরদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিজের নবীকে এ হিদায়াত দান করছেন যে, এদের শোরগোল ও বিরোধীতা সত্ত্বেও তুমি নিজের কাজ করে যাও এবং তোমার এ দাওয়াতের ফলে সত্যের দুশমনরা তাদের জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হবার যেসব আশংকা প্রকাশ করে তার পরোয়া করার কোন প্রয়োজন নেই।

আর এমনটি যেন কখনো না হয় যে, আল্লাহর আয়াত যখন তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয় তখন কাফেররা তোমাকে তা থেকে বিরত রাখে।[১১১] নিজের রবের দিকে দাওয়াত দাও এবং কখনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ো না এবং আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদদেরকে ডেকো না। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবলমাত্র তাঁর সত্তা ছাড়া। শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই[১১২] এবং তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

১১১. অর্থাৎ সেগুলোর প্রচার ও প্রসার থেকে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা থেকে।

১১২. এ অর্থও হতে পারে, শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই জন্য অর্থাৎ একমাত্র তিনিই তার অধিকার রাখেন।